পঞ্চম পুরুষ

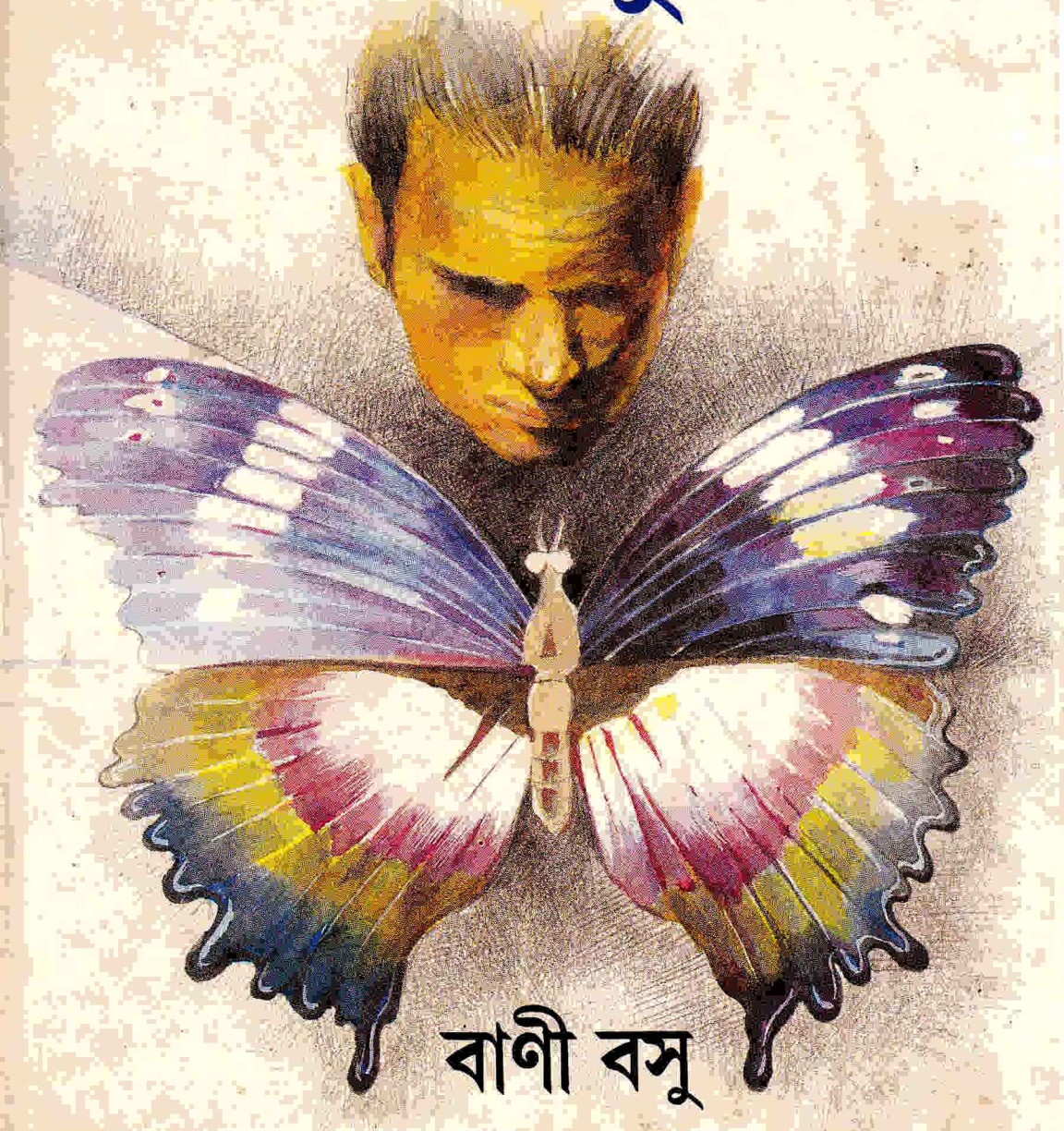

বাণী বসু

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘরভর্তি নীল আলোর মধ্যে আস্তে আস্তে আতুর হয়ে জেগে উঠছিল অরিত্র। মাথার দিকে জানলার পর্দা টানা। ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো বোল্ডারে বোল্ডারে বাধা-পাওয়া জলস্রোত, হুড় হুড় করে ঢুকে নীল রঙের রাত-আলোটাকে ফিকে করে দিয়ে গেছে। এক পৃথিবী আকাশ নীল। গভীর রাতের ঘর তার অনতিআসবাব পরিসর নিয়ে বাইরের পরিমণ্ডলের সঙ্গে নিঃশব্দ স্রোতে মিশে গেছে। ঘরকে আর ঘর বলে চেনা যাচ্ছে না, তার ছ দেয়াল বুঝি ছ দিক থেকে খুলে পড়ে গেছে। শুদ্ধু মাথার কাছে জানলার গায়ে সামান্য সাদা বিকিনি। পুরো পশ্চিমের দেয়ালে ডানা ছড়ানো ঈগল। আরো হা হা জানলা। হু হু শূন্যতা এবং বিপুল এক পরিসরের বোধ। ঘর নয় পৃথিবী, পৃথিবী নয়, আকাশ নীল রং যখন তখন আকাশ। স্বয়ং আকাশই। ঘুমে জাগরণে একাকার, স্বপ্নে-বাস্তবে। গভীর হাওয়ার রাত ছিল বুঝি কাল। সুষুপ্তি আর নিদ্রার সন্ধিতে তাই এসেছিল নিরবয়ব স্বপ্ন। রাতের হাওয়া শরীরের অরিত্রর থেকে তার দেশকালাতিক্রমী মনের অরিত্রকে আলাদা করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নিদ্রা আর তন্দ্রার মধ্যলগ্নে একটা চকিত রূপ তার সন্ধ্যাভাষা নিয়ে নির্জ্ঞান থেকে জ্ঞানে বিদ্যুতের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। কোনও কোনও স্বপ্ন দেখে বোঝা যায় তারা কোন ইচ্ছে, ভয়, ক্রোধ লোভের তলানি। দশ-পঁচিশের কাঁইবিচি, চৈতন্যভূমিতে ছড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। এ স্বপ্নটা কিন্তু তা নয়। কে যেন কি বলতে এসেছিল। ঘুমের কান নেই। তাই দৃশ্যপ্রতীকে যা বলার তা বলে গেল।

এখন তন্দ্রা আর জাগরণের সন্ধিপুজো হচ্ছে। শুয়ে শুয়ে সেই জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে অরিত্র বুঝতে পারছে সে চার পাঁচ হাতের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। অস্তাচলে ছড়ানো তার পা, পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত মুঠি ছড়িয়ে তার অনুসন্ধান ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। তার স্মৃতি এবং সত্তা অতীত ভবিষ্যতের গণ্ডি ছাড়িয়ে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, বেধে বহু বহু যোজন বিস্তৃত।

এই লেখিকার অন্যান্য বই

অন্তর্ঘাত

জন্মভূমি মাতৃভূমি

স্পেস-সমুদ্রে ভাসমান তার দিকচিহ্নহীন মানস অস্তিত্ব। জাগ্রত অবস্থাটাই তাহলে আসলে সত্যিকার ঘুমন্ত অবস্থা! ছোট্ট একটা কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ চলাফেরা তখন। যা ঘুম, চেতনার পক্ষে তাই আসল জাগরণ। উদার বিপুল বিস্ফারণে সেখানে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললে তবেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘুম ভেঙে অরিত্র প্রথমে তার হাত পা খুঁজে পেল না। শুধু মস্তিষ্কের কাছটুকুতে 'আমি অরিত্র' এই বোধটুকু আলগা বোঁটায় ঝুলছে। অন্য সময় হলে ভয় পাবার কথা। বিশেষ করে যে মানুষ সাঙ্ঘাতিক স্কুটার-অ্যাকসিডেন্টে সত্যি-সত্যিই তার হাত পা হারাতে বসেছিল। কিন্তু অরিত্র ভয় পেল না। সে যে এখন শিবাজীনগরের রাস্তায় হাত পা দুমড়ে পড়ে নেই বা সাসুন হসপিট্যালে তার এইমাত্র অপারেশন-উত্তর জ্ঞান ফিরছে না—একথা সে ভালোই বুঝতে পারছে। এই ভয়হীন অবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে পারলেই বুঝি গহন ঘোরে যা এক ভৌতিক **কিউনিফর্ম** লিপিতে চমকে উঠেই মিলিয়ে গেল সেই চকিত স্বপ্ন-চিত্রকে পুরোপুরি স্বরূপে চিনতে পারা যাবে। উদ্ধার করা যাবে। **নান্যঃ** পন্থা বিদ্যতে। সুতরাং অরিত্র আবার চোখ বুজল। যদি আরেকবার ফিরে যাওয়া যায় সেই নিদ্রায় যা নাকি আসলে জাগরণ! আর একবার। কোথাও বহুদূরে দুর্বার স্বরে ভোরের কোনও পাখি ডাকছে। অরিত্র সেই মধুর রোম্যান্টিকতার ওপর ভর করে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু নীল আকাশের পৃথিবী খুব দ্রুত রং পাল্টে পাঁশুটে ভোরের আলখাল্লা পরে নিল। হাত, পা, বুক, পিঠ, উদর, কণ্ঠ এসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ যে যার রাজ্যপাটে ফিরে এলেন। জলের তলা থেকে ভেসে ওঠার মতো টলমল করতে করতে স্থির হল ঘরের একপ্রান্তে একটা লম্বা দেয়াল-আয়না। পাশে মাঝারি টেবিল, তার ওপরে ছোট বড় নানা মাপের ওষুধের শিশি ও উল্টো দিকের দেয়ালে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো লাস্ট সাপার, বেরিয়াল অফ ক্রাইস্ট আর পিয়েতা—তিনটি খ্রীষ্ট সম্পর্কিত ছবি—কেন শোবার ঘরে এই পাপ-মৃত্যু-বিশ্বাসঘাতের সাবলিমিটি কে জানে; এবং টেবিলের সামনের চেয়ারে অরিত্রর দিকে পাশ ফিরে কপালে হাত দিয়ে বসা ফিরোজা রঙের সিল্কের রাত্রিবাস পরা বিনিদ্র নীলম। মাথার ওপরে কুচো বাসি কোঁকড়া চুলে ধোঁয়াটে একটা বলয় তৈরি হয়েছে। এটা নীলমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অরিত্র বলে নীলম'স অরিওল। কেশপ্রসাধনের অব্যবহিত পরেই নীলমের মাথা এই আকার ধারণ করে। কারণ আর কিছুই না। গোটা মাথায় কিছু কিছু বালখিল্য চুল যারা জন্ম থেকেই কোন দিনও বাড়বে না প্রতিজ্ঞা করেছে। অথচ যাদের

কারুর কারুর এঁচড়ে পেকে যেতে বাধেনি। দ্বিতীয় কারণ, নীলমের প্রচণ্ড মাথা নাড়ার অভ্যাস।

পেছনের মাঠের গাছের জটলা থেকে ভোরের পাখিদের কাকলি ক্রমে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চোখটা সিকি খুলে নীলমকে গভীরভাবে দেখতে দেখতে অরিত্র বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল ও কতক্ষণ, ঠিক কতক্ষণ ওখানে বসে আছে। ঢুকতে দেখেনি; চোখের কোল বসা। তাহলে কি সারা রাত ও ওখানে···ওইভাবে? কেন? অরিত্র এখন তো অনেক ভালো আছে! রাত-পাহারা দেবার প্রশ্নই নেই। নিজে নিজেই বাথরুমে যায়। বাঁ পাটা সামান্য একটু টেনে চলতে হচ্ছে এখনও পর্যন্ত। ডান হাতের অনামিকা ও তর্জনীর দুটো পর্ব কাটা গেছে। অর্থাৎ বিধাতাপুরুষ বাকি জীবনটা কাউকে শাসানোর অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন। আংটি পরতে হলে হাত বদলাতে হবে। কিন্তু অরিত্র সম্পূর্ণ সুস্থ। বরং দীর্ঘ বিশ্রাম এবং শুশ্রূষায় একরকম নব যৌবন ফিরে পেয়েছে। উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ নেই। তবুও নীলম এখন ওখানে ওভাবে কেন? কপালে হাত রেখেছে যেন একেবারে বসে পড়েছে। চিন্তাবিষ্ট ভাব। অরিত্রর মনে হল জিজ্ঞেস করে—'নীলম, তুমিও কি আমার স্বপ্নটাই দেখেছো?' একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখা কি—রূপকথা ছাড়া সম্ভব? জিজ্ঞেস করলে শুধু শুধুই চূড়ান্ত ঘাবড়ে যাবে নীলম। রোগশয্যায় অরিত্র যথেষ্ট প্রলাপ বকেছে। কিছু না বলে তাই অরিত্র শুধু পাশ ফিরল। বাঁ কাতে ছিল। অর্থাৎ টেবিল এবং নীলমের দিকে। লাস্ট সাপার, পিয়েতা ইত্যাদির দিকে কাত হল। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নোত্থিতের মতো উঠে দাঁড়াল নীলম। কাছে আসতে আসতে বলল—'উঠলে? উঠবে? চা আনবো?'

কথাগুলো এই-ই উচ্চারিত হল অথচ অরিত্র যেন শুনলো নীলম বলছে—'শুনলে? শুনবে? শীগগিরই শোনো একটা কথা।' মুখের ওপর উদ্বেগের ছাপ ওর এতই স্পষ্ট। অরিত্র সেই না-করা প্রশ্নগুলোরই জবাব দিল, বলল—'বলো শুনছি।' নীলম চমকে উঠল একবার। তারপর বলল—'কাল রাত্রে শুনেছিলে নাকি?'

—'কি শুনবো?'

—'মহানামজী আমাদের এই রাস্তা দিয়ে গেলেন। মহানামজী এসেছেন।'

অরিত্র এবার উঠে বসে গায়ের চাদরটা ঝেড়ে ফেলে দিল, বলল—'কি বলছো নীলম? ঠিক করে বলো!'

নীলমের গলা কাঁপছে ঈষৎ—'রাত দুটো নাগাদ গাড়ির হর্ন গেটের ওধারে

শুনতে পাওনি, না ? রাত ডিউটির নতুন দারোয়ান শম্ভাজী আমাদের ফ্ল্যাটের বেল বাজাল এসে, বলল—কারা এসেছে তোমার তলাশ করছে। আমি বললুম—আমিই যাচ্ছি, গেটের তালা কভী খুলবে না। গাড়ি থেকে ও নেমে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে চিনি চিনি করছিল মন, শুধু ফর্মটা, পুরোপুরি বুঝতে পারছিলাম না অন্ধকারে। গেটের কাছে পৌঁছতে মহানামজী রাস্তা কাঁপিয়ে বলল—কি নীলম ? অরিকে পাঠাতে ভয় পেলে নাকি ? আমি তোমার অ্যাকসিডেন্টের কথা কিছু বলিনি, শুধু বললুম গেট খুলতে বলি, ভেতরে আসুন। এত রাত্তিরে ? কি ব্যাপার ? সহ্যাদ্রি এক্সপ্রেস মিস করেছেন না কি ?' মহানামজী বললেন— মিস তো অনেক কিছুই করলুম। মিস করারই কপাল। তো ভয় নেই। সুখে নিদ্রা যাও সব। আমি যাচ্ছি পিপরির দিকে। ওখানেই আস্তানা মিলেছে।'

—'কার বাড়ি গেল ?' অরিত্র জিজ্ঞেস করল—'পিপরির দিকে ! বাঙালি হলে চিনতে পারার কথা।'

—'কি জানি ! সাদা ফিয়াট ওখানে কার কার আছে ? অন্ধকারে আর কিছু বুঝতে পারিনি। এমন নাটকীয়ভাবে আসলো আর গেলো !'

ভুরু কুঁচকে অরিত্র ভাবল—'ওটাই তো ওর চাল। তবে ওই চালে আর বাজি মাত হওয়া শক্ত।' মুখে বলল—'চা আনো।'

নীলম ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবামাত্র অরিত্রর মস্তিষ্কের মধ্যে বিজলি সম্পাত হল। হালকা নীলের মধ্যে গাঢ় নীল একটা ঘরমতো, গহ্বর। দুটো কালো পাখি ডানা মেলে তার মধ্যে দিয়ে উড়ে আসছে। ঠিক সমান দূরত্বে, সমান ছন্দে ডানা মেলে আসছে পাখি দুটো যেন পরস্পরের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা। কিছুদূর এসে আবার পেছন দিকে হটতে লাগল, আস্তে আস্তে। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বপ্নটা ছিল এইরকম। এখন ভোরবেলাকার প্রথম আলোর চরণধ্বনির রণনময় ঘরে, বিস্রস্ত বিছানার ওপর মহানামের আবির্ভাবের কূট সংবাদ শ্রবণে নিয়ে দপ করে বুঝতে পারল অরিত্র—এ পাখি পাখি নয়। আসলে চোখ। উড়ন্ত পাখির চোখ মেলে কেউ আসছিল, এসেছিল। আবার ফিরে গেছে। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। একি কাকতালীয় ! না জীবনরহস্যের আদি-অন্ত-মধ্যে বরাবর একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। সশরীরে মহানাম এসে উপস্থিত আজ আঠার বছর পরে। এবং সেই একই দণ্ডকালের মধ্যে স্বপ্ন-শরীরে আরেকজন ! উড়ন্ত বিহঙ্গের চোখ মেলে, আধেক ঘুমে, নয়ন চুমে।

অরিত্র যেন এখনও ঘোরে। ক্লান্ত আক্ষেপের সুরে বলল—'আমি ঘুমিয়ে

পড়েছিলুম।'

এবা বলল—'ঘুমের আর অপরাধ কি ? অত রাত অবধি কবিতায় আর বিয়ারে, বিয়ারে আর কবিতায় কাটালে অসময়ে ঘুমই নিয়তি।'

অরি বলল—'নিয়তিই। তুমি যখন চলে গেলে আমি নিশ্চয়ই সর্বৈব আচ্ছন্ন ছিলুম। আমার এক অলুক্ষুণে মোহনিদ্রার মধ্যে তুমি চুপিচুপি চলে গেছো। নইলে যেতে পারতে না। আর ওইভাবে গেছো বলেই আজও ঘুমঘোরেই তুমি ফিরে ফিরে আসো। এমন কিউবিস্ট ছবির মতো টুকরো টুকরো হয়ে। কখনও উড়ন্ত চুলের ভয়ঙ্কর আঁধি, কখনও যুক্যালিপটাস-দণ্ডের মতো আকাশস্পর্শী দেহকাণ্ড, কখনও পাখি, মেঘ, জল। এবা, প্রত্যেকবার আমি কেন বিভ্রান্ত হই ! কে কি কেন কবে—হাজার প্রশ্নের ঝড় ওঠে। সেই মহাকালবৈশাখীর ঘূর্ণিতে তোমার দুর্লভ পদচিহ্ন শুকনো পাতার মতো উড়ে চলে যায়। উড়ে হারিয়ে যাওয়ার পরে, অনেক পরে আমার অন্তরাত্মা বুঝতে পারে তুমি এসেছিলে, তবু আসো নি।

নীলম চা এনেছে। দু জনের। পশ্চিমের জানলা দিয়ে ভোররাতের ঠাণ্ডা ঢুকছে। অরিত্র গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিল। হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল—'পুপু কোথায় ?'

—'ওঠেনি এখনও। আমিও ইচ্ছে করেই ডাকিনি।'

—'কেন ? তিন চার দিন সকালে একসঙ্গে চা খাওয়া হয়নি। আজও হল না।'

নীলমের চোখে অভিমান ঘনিয়ে উঠেছে। বলল—'যা বললুম একটু আগে তার পরও কি তুমি মনে করো পুপুর আড়ালে আমাদের একটু কথা বলে নেওয়ার দরকার নেই ? মহানাম তো যে কোনও সময়েই এসে পড়তে পারেন !'

অরি বলল—'তুমি কি জানো না, নীল, কথা বলে কোনও লাভ নেই। মহানামের আঘাত কোন দিক দিয়ে আসবে তা তুমি আমি কল্পনাও করতে পারব না। কাজেই, কোনও প্রস্তুতি না রাখাই ভালো।'

—'পুপুকে কি বলবো ?'

—'পুপু যথেষ্ট বড় হয়েছে, ওকে সিচ্যুয়েশন থেকে সরাসরি ইমপ্রেশন নেবার সুযোগ দাও। ও যদি কোনও প্রশ্ন করে তখনই তার উত্তর দেবার কথা ভাবা যাবে।' তারপর একটু হালকা গলায় বলল—'অত ভাবছ কেন ? ভাববার কি আছে এতো ?'

নীলম অপ্রসন্ন গলায় খালি বলল—'তোমার আর কি !' বলে দুম করে চায়ের

ট্রে তুলে নিয়ে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে অরিত্র মনে মনে বলল—'নিজের সমস্যার সমাধান তোমাকে নিজেকেই করতে হবে,নীলম। আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তোমার দায়িত্বও তোমায় স্বীকার করে নিতে হবে। পাশে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু তোমার বিবেকের সমস্যা সম্পূর্ণই তোমার।'

পুনের মার্চ-ভোর রীতিমত পাহাড়ি ঠাণ্ডার আমেজে মাখামাখি থাকে। খড়কিবাজার প্রিয়লকরনগর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর চলন পথে পিঠ পেতে রেখেছে। স্থানীয় লোকের কাছে এই ঠাণ্ডা খুব আরামের। পূর্বভারতের লোকেদের কাছে কখনও রোমহর্ষক এই শিরশিরোনি। কখনও কখনও ভারি মধুর আরামদায়ক আদরের মতো। বৃষ্টিটা মাঝে মাঝেই আসে, এক ঝাপটায় তাপমাত্রা নামিয়ে দেয় আরও। নইলে, বেলা যত বাড়ে আবর্জনাহীন আকাশের রোদ সন্তাপে ততই কাংসোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই রোদের মধ্যে স্কুটার চালিয়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, পিপরি শহরতলি থেকে প্রিয়লকরনগর, প্রিয়লকরনগর থেকে শিবাজিনগর স্টেশন, য়ুনিভার্সিটি, ডেকান কলেজ, চতুঃশৃঙ্গী মন্দির, ক্যানটনমেন্ট এলাকা ছাড়িয়ে পুনে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অঞ্চল নানান কাজে যাতায়াত করতে করতে ঘাম চকচকে না হলেও তাতে লাল হয়ে ওঠে চামড়া। ভ্রূক্ষেপ করবার দরকার পড়ে না। এই গরমে কাহিল করে না তেমন। চওড়া রাস্তা ভর্তি খালি স্কুটযান। পুপুর স্কুটারের রাগী গরগরে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অরি বাথরুম থেকে। সে পড়ে থাকার জন্য যাবতীয় সংসারের কাজ, মায়ের ফরমাশ খাটা একমাত্র পুপুকেই করতে হচ্ছে। নীলম রোগী এবং সংসারের অভ্যন্তর নিয়ে এতই ব্যাতিকগ্রস্ত যে বাইরে যাবার সময় পায় না। আজকে বোধহয় অর্ধ-সপ্তাহের বাজার আনতে হবে পুপুকে। তাই এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ফিরে স্নান-টান সেরে তারপর কলেজ। নীলম যথেষ্ট সুগৃহিণী হলেও আজকাল একটু ভুলো মনের হয়েছে। গোঁয়ারও বেশ। কোনও জিনিস আনতে বলতে ভুলে গেলে পরের দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না, আবার পুপুকে পাঠায়। মেয়েটা নির্বিকার। ফরমাশগুলো যান্ত্রিকভাবে খেটে যায়। দুবার, কোন কোন সময় তিনবার যেতেও ওর আপত্তি নেই। স্কুটার চড়ে বোধহয় ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ পায়। গত বছরই ওকে একটা স্কুটার কিনে দিয়েছে অরিত্র। তার আগে সাইকেলে চলত। সাইকেলে এতো দূরত্ব পারাপারি করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মেয়েদের এতো সাইকেল-চালনা বোধহয় খুব স্বাস্থ্যসম্মতও না। স্কুটারটাকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে পেয়ে পুপু একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। আনন্দ প্রকাশ করতেও যেন ভুলে গিয়েছিল।

একটু মৃদু ধমকই দিয়েছিল বাবাকে।

—'এটা আমার ? একা আমার ? হঠাৎ ! গাড়িই তো রয়েছে বাবা একটা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো এক একসময়।'

—'বাড়াবাড়ি না রে। আমি বেরিয়ে গেলে তো তুই আর ব্যবহার করতে পারিস না। বাইসিকলে তোর অসুবিধে হচ্ছে আমি ঠিকই বুঝতে পারিরে মামন।'

তখন হঠাৎ ছুটে এসে পুপু বাবার কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল। গা শিরশির করে অরিত্রর পুপু তাকে এভাবে আদর করলে। বড় হয়ে গেছে অনেক। পাওয়ার কথা না। অথচ নিজের অধিকারেই পাচ্ছে এই ভাবটা টিকিয়ে রাখতে প্রচণ্ড একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—এ-কথা নীলম বোঝে না। বা বুঝলেও খুব সম্ভব জানতে দেয় না। অবশ্য পুপু স্বভাবে খুব ধীর, আত্মস্থ। ওর আচরণে এরকম মাত্রাছাড়া ছেলেমানুষি প্রকাশ পায় কমই।

তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মাথা মুছতে মুছতে বাইরে বেরোল অরিত্র। গায়ের জল ভালো করে না মুছেই পাঞ্জাবি চাপিয়েছে। ভিজে-ওঠা জায়গাগুলো ঠাণ্ডায় দপদপ করছে। উঁকি মেরে দেখল ওর শোবার ঘর শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। পুব দিকে ঘরের দেয়াল ফাঁক হয়ে একটা ছোট্ট অ্যানটিরুম মতো আছে, অরি বলে গর্ভগৃহ। এই অণুঘরের দেয়ালে একটা ঈগলপাখি ডিম্বাকৃতি মেহগনীর র‍্যাকটাকে ধরে আছে। এরই ওপর নীলমের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর কিছু বাছাই করা প্রতিনিধি। শ্রী এবং হ্রী-এর ভক্ত সে, সুতরাং লক্ষ্মীদেবী, অল্পে সন্তুষ্ট হন সুনাম আছে, সুতরাং শিব-লিঙ্গ, দুর্গতিনাশিনী বলে দুর্গার ছবি একটি এবং মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেবতা, গণপতি। পূজারিণী এখনও চুল আঁচড়ায়নি, চওড়া ফর্সা মুখ সদ্যস্নানের ফলে ঘষা-মাজা, লালচে, চোখ নিবিড় ভাবে বুজোনো। শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে সভ্য ভব্য বিনম্র। সামান্যই আয়োজন। আরতি নয়, মন্ত্র নয়, কয়েকটা এলাচদানা রুপোর থালায়, এবং এক ফোঁটা রুপোর গ্লাসে গণেশ মন্দিরের পেছনের হাজা-মজা মূলামুথা নদীর খাল থেকে সংগৃহীত জল। কিছু ফুল গণেশবাবাজি এবং লক্ষ্মীমায়ীর পায়ের কাছে জড়ো করা। পুজো করছে নীলম। অন্য দিনের চেয়েও আজকের ভক্তি বোধহয় একটু বেশি। মনে হচ্ছে।

এখন ওকে বিরক্ত করা বৃথা। হাজার ডাকলেও সাড়া দেবে না। অথচ স্নানের পর অরিত্র আর একদম দাঁড়াতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে চা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাতরাশ। নইলে পেটের মধ্যে একগাদা কেঁচো কিলবিল করতে থাকে। নীলম

এটা জানে। যে কদিন সে শয্যাশায়ী ছিল, নিখুঁত নিয়মে গা মুছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের থালা এনে হাজির করত। নীলমের পূজারিণী মূর্তির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অরি। লম্বাটে এক ধরনের বেলুন থাকে খোপ খোপ করা। ছোটবেলায় ওরা খুব ভালোবাসত। এখনকার বাচ্চারা ভালোবাসে কি না কে জানে। সেইরকম বেলুনের মতো নীলমের চেহারাটা ছিল এককালে। গোলালো, মসৃণ, টানটান। বেলুনঅলা যদি কোথায় থামতে হবে না জেনে তাকে আরও ফুলিয়ে যায় যেরকম সব জিনিসটারই একটা অপরিমিত স্ফীতত্ব আসে, এখন নীলমের চেহারাটা সেইরকম। নাকের সূক্ষ্মতা, চিবুকের ধার, চোখের কোণের সেই অপূর্ব টান, ঠোঁটের মোচড় সব যেন কি রকম ধেবড়ে গেছে।

ওর খুব দোষ নেই। জিনিসটা হয়েছে ওর হিসটেরেকটমির পরে। এরকমটা যে হতে পারে সে বিষয়ে ডাক্তার আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বহুদিন খুব স্পর্শকাতর বিষয় ছিল বলে অরির পক্ষে কিছু বলা মুশকিল ছিল। তবু কখনও কখনও ইঙ্গিত দিতে ভোলেনি। নীলম তো বোকা নয়। বুঝেও না বুঝলে কে কি করতে পারে! ডাক্তারের দেওয়া ওষুধগুলোও তো খেতে সব সময়ে গা করত না। বাধ্য হয়ে ইনজেকশনের শরণাপন্ন হতে হত। —'সব যখন যেতে চায়, তখন সবই যাক। কিছু ধরে রাখবার চেষ্টা করে লাভ কি?' উদাস চোখে তাকিয়ে বলত। তারপর হঠাৎ মাঝরাত্তিরে উঠে আসত—'অরি, অরি, আমার বড্ড ভয় করছে। বুকের ভেতর কেমন সব হিম হয়ে যাচ্ছে।' অরিত্র বলত—'তোমাকে কতবার বলেছি ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাও।' অকালসন্ধ্যা এসে গেল জীবনে। মানসিক ধাক্কায় যেন বিবশ হয়ে গেছে নীলম।

ডাক্তার বুঝদার লোক। বলেছিলেন—'এ অবস্থা চলতে দিলে নাইন্টি পার্সেন্ট কেসেই ইউটেরাইন ক্যানসার হয়। বলুন কি করবেন?'

—'শী ইজ ওনলি থার্টি।'

—'সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি।'

—'আফটার-এফেক্ট্স কি? এ অপারেশনের?'

—'শরীর খুব ভালো হয়ে যাবে। কর্মক্ষমতা বাড়বে। অসুখবিসুখ করবে না চট করে। শী মে বিকাম অ্যান অ্যামাজন।' ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ সিগারেট মুখ থেকে নামালেন না। —'কিন্তু!'

—'কি?' অধৈর্য হয়ে অরিত্র প্রশ্ন করল।

—'শী উড নো লঙ্গার বি ওয়াইফ।'

—'অর্থাৎ?'

—'ইনস্টেড, ইউ মে গেট আ মাদার।'

—'হোয়াট ডু ইউ মীন ডক্টর?'

—'আপনার স্ত্রীর মধ্যবয়সটা খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে মিঃ চৌধুরী। চেহারায়, প্রকৃতিতে। গৃহিণী, মা—এগুলোই হবে ওঁর ঠিক ভূমিকা। রমণীর ভূমিকাটা উনি হয়ত তেমন করে আর পালন করতে পারবেন না। শী উড লুজ ইনটারেস্ট ইন দ্যাট কাইন্ড অফ লাইফ। মানে এক অর্থে আপনাদের দুজনেরই যৌবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এই অপারেশনটার সঙ্গে সঙ্গে।'

—'কিন্তু আমি তো অসুস্থ নই! আমি যে পূর্ণ যুবক'— অরিত্র উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অরিত্র চৌধুরীর অন্তস্তল পর্যন্ত পেশাদার এক্স্‌পার্টের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। বললেন—'সেইজন্য। সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি। ডু য়ু ওয়ান্ট হার লাইফ, অর হার ইয়ুথ অ্যাট দিস মোমেন্ট। য়ু কান্ট কীপ বোথ।'

অরিত্রর দাম্পত্য-সম্পর্কের সারসত্যকে কেউ যেন কাঠগড়ায় তুলেছে। গূঢ় সন্দেহের চোখ দেখছে তাকে—তার বুকের সমস্ত ধুকপুকুনি, আত্মার হা হা চিৎকার, উল্লম্ফ ক্রোধ, ভয়। দম-আটকানো গলায় অরিত্র বলল—'অফ কোর্স আই ওয়ান্ট হার—হার লাইফ। দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট কনসিডারেশন', একটু থেমে বলল—'অ্যান্ড অলসো দি লাস্ট।'

ডাক্তারের চেম্বার যেন শ্বাস রুদ্ধ করেছিল। কে কোথায় নিশ্বাস ফেলল। ডাক্তারের গলা মৃদু, মমতাময়—'কিন্তু জীবনই বলুন, যৌবনই বলুন, সবটাই আপনাদের যৌথ, কমিউনিটি প্রপার্টি—কি বলেন? মিঃ চৌধুরী, আপনি মিসেসের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নিন। উনি কি চান। আমি বলেছি নাইন্টি পার্সেন্ট কেসে বিপদ। তারপরেও টেন পার্সেন্ট থাকে। সেই দশের মধ্যেও পড়তে পারেন ভাগ্যে থাকলে। উনি কি চান সেটাও খুব ইমপরট্যান্ট। আপনি যান, বুঝিয়ে বলুন।'

শুনে নীলম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলে উঠল—'জী নহী। অপারেশন করাবার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আমাকে রিস্কটা নিতে হবে। অরি, আমাকে মাপ করো।'

—'কিন্তু নীলম, এক দিন না এক দিন তুমি স্বাভাবিকভাবেই এই জীবনে প্রবেশ করবে। চেঞ্জ অফ লাইফ শুধু। সে-ও কি জীবন নয়? হয়ত অন্য

অনেক আনন্দের দুয়ার খুলে যাবে। শুধু শুধু ভয় পাচ্ছো কেন ? অপারেশন না করালে ক্যানসার, বুঝেছো ? এবং দুঃসহ যন্ত্রণা, এবং সব শেষ।'

যন্ত্রণাকাতর গলায়, সংশয়ভরা চোখে, বদ্ধ গলায় নীলম বলেছিল—'ভয় আমি নিজের জন্য থোড়ি পাই অরি। ভয় পাচ্ছি তোমার জন্য। তোমাকে। আমি তাহলে আর তোমার কোন কাজে লাগব !'

অরিত্রর মুখ খড়ির মতো শাদা হয়ে গেছে। কি বলছে নীলম ? সে ঠিক শুনছে তো ? সে কি এই নিষ্ঠুর বিচারের যোগ্য ? এই রায় কি তার পাওনা ছিল ? নীলম আমাকে তবে প্রমাণ করতে দাও তোমাদের বিচার, তোমাদের রায় সর্বৈব ভুল। তোমার যৌবন তোমার অনন্য মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলেই আমার কাম্য ছিল। বিহ্বল, ব্যাকুল অরির বুকে মাথা রেখে কাঁদছে নীলম। বুঝেছে তার যন্ত্রণা—'আমি অন্যায় বলেছি, আমায় মাপ করো অরি। ভোগতৃষ্ণা তো আমারও।' কত কাল, কত কত কাল পরে নীলম এসেছিল নিজে নিজে। প্রিয় নারী যখন দীর্ঘ খরার পর এমন বর্ষাধারায় আসে তখন সে বর্ষার কী অসাধারণ উন্মাদনা ! নীল আকাশের ঘরে সে কি অদ্ভুত মধুযামিনী সেদিন কেটেছিল ! যৌবন বিসর্জন দেবার ঠিক আগে।

কত কাল হয়ে গেল অরিত্র সে রাত ভোলেনি। নীলম বোধহয় ভুলে গেছে। ভুলে যেতেই সে চায়। এখন নিমীলিত চোখ, গলায় আঁচল, মাথার চারপাশে না আঁচড়ানো কোঁকড়া চুলের জ্যোতির্বলয়। নীলম পুজো করছে, পুজো করছে। অরিত্র ওকে বিরক্ত করো না। সারাটা দিন ধরে ও তোমার ঘর গোছাবে, ফুল সাজাবে, রাশি রাশি বই দেখে চীনে, মোগলাই, য়ুরোপীয় রাঁধবে। পুপুর লেখাপড়া, টেনিস, রোয়িং, কিছু দেখতে হয় না অরিত্রকে। ব্যাঙ্ক, বাজার, পোস্ট অফিস, কলকাতার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ। কিছু না, কিছু না। শুধু ঘরটাই যা আলাদা হয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

এমনিতে পিকু-এষার এমন নিস্তরঙ্গ জীবন যে পিকুই মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। সকাল নটায় মিনি ধরে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে একজন ডালহৌসি, আরেকজন উত্তর কলকাতা। শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। লম্বা যান-জট ঠেলে ঠেলে, এক ঘণ্টার পথ দু ঘণ্টায়, আড়াই ঘণ্টায়। সকালে চা, সন্ধেয় কফি। কফির পট সামনে রেখে দুজনে গল্প। পত্রিকা পড়া। তারপর টেবিল-চেয়ার, হাতে কলম, টেবিলে খাতা, র‍্যাকে বই। কখনও টাইপ-রাইটার।

মস্তিষ্ক-ঠাসা চিন্তা। খাতার পাহাড়, লাল-নীল ডট কলম। পিকু বলে—'তুই পারিস কি করে ? চল ফিল্ম দেখে আসি।'

—'কি ফিল্ম ?'

—'তা কি জানি ? যা পাওয়া যায়। দে কাগজটা। দেখি কি কি হচ্ছে।'

—'দূর ! ফিল্ম দেখার জন্যেই ফিল্ম দেখা ? সে বড় বিরক্তিকর ! পিকু, তুই প্লীজ অন্য বন্ধু-বান্ধব সংগ্রহ করে ঘুরে আয়।'

পিকু বলে—'কি জ্বালা ! অন্য বন্ধু-বান্ধব কি আর আমার কালেকশনে নেই ? তোকে একলা ফেলে যেতে চাইছি না এটাকে পাত্তা দিচ্ছিস না কেন ? এষা, তোর মনে হয় না প্রত্যেকটা দিন কেন এমন একই রঙের ? একইরকম নিচু শিথিল বেসুরে বাঁধা ! কেনই বা জীবন এমন নির্বিশেষ হবে ?'

এষা হাসতে থাকে—'তুই কি জীবনকে রোমাঞ্চকর উপন্যাস ঠাউরে জন্ম নিয়েছিলি নাকি ? তাহলে তোর আশাভঙ্গ কেউ আটকাতে পারবে না পিকু। না ভেবে-চিন্তে সিনেমা দেখতে গেলে অবস্থা আরও সঙ্গিন দাঁড়াবে।'

—'তাহলে কি করা যায় ?'

—'কিছু করার নেই। শুধু প্রতীক্ষা করার আছে। তা-ও ব্যস্ত হয়ে নয়।'

পিকু বলে—'ধুত্তেরি। তবে আমি গাছে জল দিতে চললুম। হলুদ জবার কুঁড়ি এসেছে। ফুটল কিনা দেখি গে।'

এষা মনে মনে বলে—'এই তো ঠিক ধরেছিস। সাধারণ তবু অসাধারণ। জবা কিন্তু হলুদ-জবা—মুহূর্তগুলোর ফোটা দেখতে দেখতে গরিমার জন্য লালিত প্রতীক্ষাকে ভুলে থাকা। যদি সে এলো তো এলো, না এলেও ক্ষতি নেই।'

এইরকম চলতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে ফেলতে। পিকু সিনেমা দেখতে যায়, বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক, বোনঝির জন্মদিনের নিমন্ত্রণে একদিন গিয়ে তিনদিন কাটিয়ে বেশ তাজা হয়ে ফিরে আসে। নতুন করে ভালোবাসে আবার সেন্ট্রাল পার্কের ঘরদুয়ার, দাওয়া, বাগান, গল্পগাছা, নিষ্প্রদীপের রাত্তিরে ঘরে তালা দিয়ে, ছাদে মাদুর পেতে জোনাকি আর তারা, তারা আর জোনাকি, মিঠে ফুলের গন্ধ, গুনগুন গান, ঘুম। এষা তুই কি রে ? এক্সকার্শনটাতেও তো যেতে পারতিস ! সেদিন একটা নেমন্তন্নের চিঠি এলো, গেলি না তো ! মুড নেই রে। আমার এমনিই বেশ ভালো লাগে, সত্যি বলছি। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝ সকালে তার মস্তিষ্কের মধ্যে কুমোরের চাক বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে। একটা

পাখি ডানা ঝাপটায় বুকের মধ্যে, অধৈর্য ঠোঁট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে লসিকাগুলো। রসক্ষরণ হতে থাকে শরীরের খাঁচায়, স্রোত মুক্তি পেতে চায়। তখন এষা কোথাও না যেতে পারলে মরে যায়। সে বেশ বুঝতে পারে এরই মধ্যে তার পুনর্জন্ম এবং পুনর্পুনর্জন্ম হয়ে গেছে। শুধু কাপুরুষেরাই বারবার মরে না। গভীর আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতায় যারা বাঁচে তারাও মরে যায়, আবার জন্মায়, একই জন্মের ভেতরে। এষা সেসব সময়ে বুঝতে পারে এইদিনগুলোর মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তার বায়ুভূত নিরালম্ব প্রেতদশা।

গীতাঞ্জলিতে আসতে সবাই বারণ করেছিল। ঘণ্টার হিসেবে কম হলেও, দু দুটো পুরো দিনের বেলা। নতুন গরম পড়ছে। বাংলা পার হলেই লু বইবে। কিন্তু বম্বে মেলে তিলধারণের স্থান নেই। ভি-আই-পি কোঠায় চেষ্টা করেও বিফল হতে হল। ফেয়ারলি প্লেস থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসপ্লানেড। উত্তেজনায় এষা সীটে হেলান দিয়ে বসতে পারছে না। আপাদমস্তক অধৈর্য প্রত্যাশায় ভরা উৎকণ্ঠ দুপুরে গীতাঞ্জলির টিকিট হাতে পেয়ে মাথায় কুমোরের চাক ঘাম্‌ল। স্পেস পার হলেই বুঝি কালকেও পার হওয়া যাবে, যে কালকে পার হতে না পেরে মানুষ চিরদিন এমন আকণ্ঠ দুঃখী হয়ে রয়েছে। যাওয়ার এই তাগিদ এ ভেতরের কোনো গূঢ় মৌল প্রয়োজনের তাগিদ। এ রকম হলে একটা ছবি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে বাজতে থাকে মনের মধ্যে। ছবিটাই তাকে বলে দেয় কোথায় যেতে হবে। এভাবেই সে একটি য়ুক্যালিপটাস বীথি এবং রাস্তার এপার ওপার জোড়া যুগল শিরীষকে পূর্ণিমা রাত্রের স্বপ্নে দেখে রিখিয়া এবং বহুদূর পর্যন্ত খোলা রোদ্দুরে খান খান লালমাটির চেহারা দেখে ডালটনগঞ্জ, তারপর কাচের জানলা থেকে অবাধ অপার নীলকণ্ঠ হিমালয়ান রেঞ্জ বিনোনো দেখে রাণীখেত ঘুরে এসেছে। দিবাস্বপ্নের দৃশ্যে তো রাতের স্বপ্নের মতো ছায়া থাকে না! কখনও কখনও এসব ছবি বাস্তব রোদের চোখ-ধাঁধানো ভ্যান গগ, বাস্তব সর্ষে খেতের হলুদ ফুলঝুরি, বাস্তবনদীর বাঁকে বাঁকে টাল-সামলানো যতীন সেনগুপ্ত দুষ্ট রূপ নিয়ে প্রচণ্ড ব্যথার মোচড় সমেত উপস্থিত হয়। এষা ছবিটাকে বুক থেকে কোলে নামিয়ে রাখে, আবার বুকে জড়িয়ে ধরে, তারপর টানটান হয়ে ট্রেনের তীব্র হুইসলে ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ শুনতে থাকে। সুদূরের জ্বর গায়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকে—কি করি বলো, এই মুহূর্তে আমার ছুটি নেই, বাড়ি করতে আমি সব টাকা ফুরিয়ে ফেলেছি, অথচ নিঠুরদরদী এক শৈলসানু তার গাভরা সোনালি গোধূম, পিঠে বেতের ঝোড়া নিয়ে লেপা পোঁছা

মিঠে মুখের ভুটিয়া চা-তুলুনি এসব আমায় প্রবল বেগে টানছে। টানছে শৈশবে মায়ের টানের মতো, বসন্ত রাতের হাওয়ার মতো, প্রাণবঁধুর ডাকের মতো। আমাকে যেতেই হবে। নইলে পিকু নতুন গোলাপি পেয়ালায় নতুন রকমের সুগন্ধ-সোনালি চায়ের রোশনাই করবে আমি খেয়াল করব না। বাগানে হাঁটব অনাগ্রহে, ফুলেরা হয়ত সুপ্রভাত জানাবে, আমি আনমনা—শুনব না। ব্যথা পেয়ে নুয়ে পড়বে ডিসেম্বরের ডালিয়া, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, লিনটেলের ওপর তোলা লতানে যুঁইয়ের মৃদু মধুর সুরপাত আমি গায়ে না মেখে নিষ্ঠুর উদাসীনতার খই ছড়াতে ছড়াতে চলে যাবো আমার শ্মশানে, ভেতরে, আরো ভেতরে। ওদের অভিমানের কোন মূল্য দেবো না। আমার অভিমানের মূল্যই যেন কেউ কোথাও দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্নান করতে কেটে যাবে, পিকু ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাবে। যন্ত্রের মতো ওয়ার্ডরোব থেকে পিকুর সাজানো হ্যাঙারে জামাকাপড় নামিয়ে নেবো। মনে পড়বে না আমি যাচ্ছি না আসছি। পিকু বলবে—'এ কি তুই খেলি না?' যেন খাওয়া না-খাওয়াতে আর কিছু এসে যায়। ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ার দিনগুলি তো সেই কবেই উৎসবরজনীর পর-প্রত্যূষে খিড়কি দুয়ারে এঁটো পাত ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। এখন শুধু খিদে জানান দিলে খেয়ে নেওয়া। যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়ে। রুটি-মাখন, আলুভাতে-ভাত, কাঁচা চীনেবাদাম-গুড় ছোলা যা হোক।

এবারের ছবিটা ছিল এই খাদ্য-সম্পর্কিত। ইউনেসকোর অজন্তা অ্যালবামটা দেখতে দেখতে দু চোখ জুড়ে ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি পিঁড়ি পাতলেন। একলা ঘরে বিষাদরূপিণী এক কৃষ্ণাকে দেখতে পেল এষা। ঘরে ছায়া শুধু ছায়া। সখীর হাতে মহার্ঘ খাদ্য-সম্ভার, চোখে অনুনয়। কি এক ব্যাখ্যাতীত বিষাদে স্তব্ধ, স্থাণু হয়ে রয়েছে কন্যা! ছবিটা বারবার তিনবার ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। ভোরবেলা জানলা দিয়ে প্রজাপতি ঢুকে দক্ষিণের পর্দার ওপর থরথর করে কাঁপছিল, গান না-জানা কিম্বা গান-ভোলা পাখি বাইরের গাছের ডালে বসে ঘুমভাঙা গলায় ডাকছিল—টিকটিক, টুকটুক, টিকটিক, টুকটুক। আগের দিনের না-বাঁধা বাসি চুল কাঁধময় পিঠময়, হাঁটুর ওপর হাত জড়ানো,—পিকু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে এষা বলল—'আমি অজন্তা যাবো পিকু, অজন্তা দেখে আসি একবার।'

পিকু বলল—'এক্ষুণি নাকি? তো যা।'

দেয়ালে চোখ। মৃদু হেসে এষা বলল—'সেভাবে আমি গেছিতো। মনসা

মথুরাম্। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেভাবে স্বশরীরে স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন, তেমনি ভাবে যেতে চাই।'

—'পথে তোর সঙ্গীরা একের পর এক হত হতে থাকবে।'

—'হোক, পাছে হোস তাই তোকে নিচ্ছি না।'

—'সকুকুর যাবি ?'

বারান্দা থেকে মুখির ডাক ভেসে আসছিল কৌ কৌ কৌ। সেটা শুনেই বোধহয় পিকুর মাথায় কুকুরের কথাটা আরো এলো।

এষা বলল—'মুখিয়াটা নিতান্তই তোর। খুব ভালো করেই জানিস সেটা। তোকে উপহার দিয়েছি। তুই ওর বিষয়ে বড্ড এলোমেলো বলে মাঝে-মধ্যে ওকে চান-টানগুলো করিয়ে দিস। তার মানে এই নয় যে তোর মুখি আমার পেছু নেবে।'

'কুকুর ছাড়া স্বর্গে যাওয়া যায় না জানিস না সেটা!'

'সে তো পথের কুকুর! পেছন পেছন আসে বেশ দূরত্ব রেখে, গায়ে লেজ বুলোয় না, যেখানে সেখানে আইস-ক্রিম চাটার মতো চাটে না, ঘ্যান ঘ্যান তো করেই না কক্ষণো।'

'তাছাড়াও নরক-দর্শনের হাঙ্গামাটা আছে।'

'দ্যাখ পিকু, সারাজীবন ধরে যারা নানা ভাবে নরকদর্শন করেছে তাদের স্বর্গে যাবার জন্যে আরেকবার নরক দেখতে আপত্তি থাকার কথা নয়।'

'দুর্যোধনদের সপার্ষদ সিংহাসনে বসে থাকতে দেখবি কিন্তু!'

'এবার তুই সত্যিই ভাবালি। যাক গে ওসব। আমি যাচ্ছিই। বারো বছর বয়সে মাসি-মেসোর সঙ্গে গিয়েছি। খাঁ-খাঁ মাঠ দিয়ে কুলির মাথায় মোট, আমরা তিনজন ফর্দাপুরের ডাকবাংলোয় রাত কাটাতে চলেছি। মেসো বলছেন—"কত দফায় দফায় আবিষ্কার হল অজন্তা, তখন এখানে বাঘ-টাগ চরত বোধহয়। আর আমরা এক দিনেই সে জিনিস দেখে ফেলব।" এখনও আমার মনে আছে কি ভাবে বেঁকে গেছে বাগোড়া নদীর খাতটা! দ্যাখ বৎসরান্তে প্রসারপিনের কাছে সিরিসের ডাকের মতো অজন্তার ডাক আমার কাছে এসে পৌঁছেছে এই হেডিসে।'

'ইস্স্। আমাদের এই "কুটিচক" বাড়িখানাকে তুই শেষ অব্দি হেডিস বললি ?'

'তুই যেন জানিস না বাড়িটাকে আমি হেডিস বলতে পারি না। ভেতরটা যখন এরকম জগদ্দল পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে তখন আমায় সুখের স্বর্গে

রাখলেও সেটাকে হেডিসই বলব। এই বিশ্রী মুডের পরাক্রান্ত হাত এড়িয়ে মুক্তির জন্য কত শিখর আরোহণ করতে পারি, অজন্তা তো উচ্চতার দিক দিয়ে কোন ছার। কিন্তু আমাকে স্থানান্তরে গেলেই চলবে না, মনে হচ্ছে অন্য মন, অন্য মেজাজে যেতে হবে।'

পিকু বলল—'দেখিস আবার।'

বুকিং অফিস থেকে বেরিয়ে এষা সোজা চলে গেল এসপ্লানেড পোস্ট অফিস। তার করল একটা। 'রীচিং কল্যাণ বাই গীতাঞ্জলি, সেভেনটিন্থ মার্চ।' পশ্চিম উপকূল একেবারেই অচেনা। বোম্বাই ছাড়া। চেনা-শোনা কেউ নেই। লক্ষ্ণৌতে একা গিয়ে কি অশান্তিই হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ শহরে যে অত মস্তানি জানা ছিল না। হিপি মেয়ে পাশেই ঘুরছে গায়ে শততালি পোশাক, কাঁধে রুকস্যাক, হাতে ক্যামেরা, তাকে কেউ বিরক্ত করছে না। কিন্তু শাড়ি-পরা ভারতীয় মেয়েদের একলা বেড়াবার ইচ্ছে হতে নেই। শিবাজির মাওলি সেনার বংশধররা এখন কি করে সময় কাটায় কে জানে। কল্যাণে যদি কাউকে না পাওয়া যায় ? কানেকটিং ট্রেনে পুনে চলে যেতে হবে। পৌঁছতে কত রাত হবে কে জানে! রিটায়ারিং রুম কি আর নেই! রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে খুঁজে বার করতে হবে ট্যুরিস্ট অফিস। ঔরঙ্গাবাদ হয়ে অজন্তা।

অরিত্র চৌধুরীকে কেন টেলিগ্রাম করল জানে না এষা। অরিত্র চৌধুরী পৃথিবীর সেই শেষতম ব্যক্তিদের অন্যতম হওয়া উচিত যাকে এষা টেলিগ্রাম করতে পারে। অথচ কথাটা মনে হল টেলিগ্রামটা করে দেওয়ার পর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল এষা। তাকে দিয়ে কে এটা করিয়ে নিল সে জানে না। গোটা জীবনটাই তো যা যা সহজভাবে করতে ইচ্ছে করে সে সব ইচ্ছের মুখে পাথর চাপা দেবার অভ্যাস গড়ে তোলার নিখুঁত প্রোগ্রেস রিপোর্ট। মাঝে মাঝে সেইসব গর্ভে-বিনষ্ট ইচ্ছারা এইভাবে শোধ নেয়। এষা বাইরে বেরিয়ে বাস-ডিপোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল মাঝে মাঝে এমনি হেরে যাওয়া স্বাস্থ্যকর। ছোট ছোট হার। বড় বড় জিত।

সেই দ্বিধাগ্রস্ত টেলিগ্রাম নতুন উড়তে-শেখা পাখির ছানার মতো দফায় দফায় গন্তব্যে পৌঁছল। এসেছিল অফিসের ঠিকানায়। অরিত্র এখনও অফিসে যোগ দেয়নি। তাই বিকেলবেলায় ঝড়ো স্কুটারে তার পি এ মণ্ডল এসে দিয়ে গেল। তখন টুকরো রোদের যৎসামান্য লনে বসে অরিত্র নীলমের সঙ্গে বৈকালী চা খাচ্ছিল। পেস্ট্রি করেছে আজ নীলম। চকোলেট-ক্রিম। একবাক্স নিয়ে গেছে পুপু। গোয়াতে এক্সকার্শনে গেল বন্ধুদের সঙ্গে। ট্রেনে খাবে। টেলিগ্রামটা

টেবিলের ওপর রেখে পায়ে পা ঠুকে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করল মণ্ডল, বলল—'একটুও বসতে পারছি না ভাবী। পেস্ট্রি রিজার্ভড রইল ফর সাম আদার টাইম। আশা করি ভুলবেন না।'

নীলম হেসে বলল—'তোমাকে কি আরও টেলিগ্রাম বিলি করতে হবে? তোমার বস বসে গিয়ে কি তোমার ডিমোশন হল নাকি?'

মণ্ডল বলল—'সুইট আর দা ইউসেস অফ ডিমোশন, যদি প্রত্যেকের বাড়িতে ঠিক বিকেলের টিফিনের সময় গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। কিন্তু তা নয় ভাবী। বাড়িতে আজ শ্বশুরবাড়ির গেস্ট আসার কথা, দেরি হলে হাড় কখানা আস্ত থাকবে না।'

—'শুধু শুধু বউয়ের বদনাম করছ? শীগগির পালাও।'

পেছন ফিরে এক লাফে স্কুটার চড়ল মণ্ডল। মুহূর্তে ধুলোর ঝড় দূরে মিলিয়ে গেল। এ বাড়িতে ওর আদর খুব। শুধু ওরই বা কেন? নীলম ভাবী বিরাট একটি লক্ষ্মণ-দলের মধ্যমণি। অরিত্রর চেয়েও নীলমের প্রভাব সেখানে কার্যকরী বেশি। নীলমের একটা মস্ত গুণ সে জাত-বিচার করে না। পি এ এবং চীফ এঞ্জিনিয়ার তার কাছে এক খাতির পায়, মানুষ হিসেবে যদি তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। কোনও শিল্পাঞ্চলেই এই মনোভাব সুলভ নয়। অবশ্য পুনের শিল্পাঞ্চলগুলো এবং তাদের কর্মীরা আরও অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। ঠিক একটা—টাটানগর কি আই আই টি কলোনি গড়ে ওঠার এখানে সুযোগ পায়নি। বৃহৎ মেট্রোপলিসের কিছু কিছু গুণ তাই তার আয়ত্ত হয়েছে। না হলে নীলমের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিকতা মার খেতো কি না বলা শক্ত।

প্রিয়লকরনগর তৈরি হচ্ছে আনকোরা নতুন। চারদিকে সাদা ধুলো। এ ধুলোয় ধুলোয় ধূসর হবার ধুলো। মলিন হয় না কিছু। দুদিকে লম্বা লম্বা গাছ একটু এগিয়ে গেলেই। গুল্মও আছে প্রচুর বিল্ডিং ব্লকগুলোকে ঘিরে ঘিরে। এখন উঁচু বেড়া দেওয়া। মণ্ডল চোখের বাইরে চলে গেল, গাছের মধ্যে বিন্দু হয়ে। নীলম বলল—'দ্যাখো দ্যাখো ও বাড়ির খবর সব ভালো তো? ও কি? কি হল?' অরিত্র পাহাড়ি বিছের মতো টেলিগ্রামটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে।—'এযা আসছে, সতেরই মার্চ। গীতাঞ্জলি।'

নীলমের মুখ অরিত্রর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাংশু হচ্ছে। কোনও কথা বলতে পারছে না। একটু পরে আধ-খাওয়া চায়ের কাপ ফেলে উঠে চলে গেল। অরি নিজের কাপটা নিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার প্রতিক্রিয়া কেন এমন হল? নীলমের যাই হোক। এ টেলিগ্রাম কি একেবারেই অপ্রত্যাশিত? অফিসের সবুজ

গোলাপি অ্যাক্রিলিক পেন্ট করা, হালকা সবুজ টালিছাওয়া মেঝের ওপর, রিভলভিং চেয়ারে বসে দিনের পর দিন যে চিঠি পাঠিয়েছে তার মর্মার্থ হল: এযা, তুমি এসো। তুমি একবার এসে দেখে যাও। অপ্রেমে বা প্রেমে নয়, নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব থাকে। সেই নীরবে বিকশিত হওয়া বৃক্ষ তার পত্রং, পুষ্পম, তার মাথায় সবুজ আশ্রয়ের ঘেরাটোপ, বিশ্বাস করো। এসো এযা। ভস্ম-অপমানশয্যা তোমাকে মানায় না। তবে কেন এযা টেলিগ্রাম করবে না! তবে কি অরিত্র মিথ্যাবাদী! চিরটাকাল এযার কাছে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার নিয়তি! অথচ আর আর সম্পর্কগুলো দম দেওয়া ওয়াল-ক্লকের মতো ঠিক ঠাক, ঠিক ঠাক চলছে তো! শুদ্ধু একজনের সঙ্গে তার মিথ্যার সম্পর্ক? যা বলে তা বলতে চায় না! এযা এলে কি অরি তবে তাকে বলবে?—'তুমি কেন এলে এযা?' এযা বলবে—'সে কি তুমি যে আসতে বলেছিলে?'

অরি কি তখন কবুল করবে?—'আই ডিড্‌নট্ মীন ইট।'

নাকি এযার সঙ্গে সম্পর্ক যার সে এই অরিত্রর ভেতরে এক অন্য আধো-চেনা অরিত্র। সে নিজেই তাকে সব সময়ে বুঝে উঠতে পারে না। শুকনো মুখে অরিত্র উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ পা টেনে টেনে ভেতরে গেল। নীলম বসবার ঘরের ডিভানের ওপর বসে, তার মাথার কাছে আনজুনার নারকোল গাছ আর উচ্ছল সমুদ্র। ভগ্ন কোণাচে তটরেখা। দেয়াল ভর্তি পোস্টারে কিছু হিপিও ভাঙা ভাঙা রেখায় দেখা যায়। আনজুনা বেলাভূমির রোমান্টিক হর্ষের তলায় নীলমের বিষাদ একদম রক্তমাংসের, বাস্তব। সাবয়ব।

অরিত্র বলল—'কি হল?'

নীলম উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ পরও অরিত্রকে একইরকম শুকনো করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল—'কবে আসতে লিখলে? অপারেশনের পর জ্ঞান-হওয়া মাত্রই? মণ্ডলকেই ডিকটেট করলে, না কি? তোমার বশংবদ পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট?'

আকাশ থেকে পড়ল অরিত্র—'আমি কেন লিখব?'

'মৃত্যুর কথা মনে হলে প্রিয়জনের কথা মনে হতেই পারে।'

অরিত্র গম্ভীর হয়ে বলল—'নীলম, আমি এযাকে আসতে লিখিনি। ক্যাজুয়্যালি লিখেছি কখনও কখনও, অবশ্য। কিন্তু এখন এই কদিনের মধ্যে তা-ও না। চিঠি দিই মাঝে মধ্যে। সেগুলো তুমি ইচ্ছে করলেই পড়তে পারো। ও কেন আসতে চাইছে আমি জানি না। তোমার যদি খুব খারাপ লাগে, তাহলে বরং আমাদের অক্ষমতা জানিয়ে আমি পাল্টা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।'

'থাক।' নীলম সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে, উঠে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

ইচ্ছে করলেই মহানাম ফিল্ম ইন্সটিট্যুটে থাকতে পারতেন। গেস্ট হিসেবে। সেইরকমই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চন্দ্রশেখর বলল—'আপনার অনেক প্রোগ্রাম ডক্টর রয়। ওখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে। আমার ব্যাচেলরের বাড়ি বলে কি ভয় পাচ্ছেন? কি রকম রাঁধতে পারি দেখুনই না। আপনি কদিন থাকলে আমার একাকীত্বটাও সাময়িকভাবে ঘোচে।'

কলকাতায় গেলে চন্দ্রশেখর মহানামেরই আতিথ্য গ্রহণ করে। একটি লাইব্রেরি, দুটি পড়ুয়া। মাঝে যজ্ঞেশ্বরের সেবা। এখানে অবশ্য যজ্ঞেশ্বর জাতীয় কেউ নেই। তাতে চন্দ্রশেখরের অসুবিধে নেই। বহু বছর বিদেশে কাটিয়েছে। রান্না নিজে করাই বরাবরের অভ্যাস। রোজ সকালে মহানামকে মস্ত বড় দুটো স্যান্ডউইচ, সস, কলা, এবং পেল্লাই গেলাসে শুধু দুধে কফি তৈরি করে দেয়। দুপুরের খাওয়া প্রথম কদিন ম্যাকসমূলর ভবনে। সেখানকার লেকচার-কোর্স শেষ হল মঙ্গলবার—মাঝে বুধবার বাদ দিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে ফিল্ম ইন্সটিট্যুটের সেমিনার।

এই ধরনের ঠাসা প্রোগ্রাম ভালো লাগে মহানামের। মাঝখানে বুধবারের হাইফেনটা না থাকলেও তাঁর কিছু মনে হত না। অসম্ভব শক্তি, শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক। কোনটারই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হবার সুযোগ জীবনে হল না। পুরো জীবনটা যেন খেলতে খেলতে কেটে গেল। ধুলোমাটি নিয়ে খেলা। স্বভাবের মধ্যে নিশ্চয় এক প্লেবয় রয়ে গেছে, এই সবের জন্যে সে-ই দায়ী। বেশ ওজনদার কিছু পাওয়ার হিসেব কষতে গেলে এই ফাঁক এবং ফাঁকি ধরা পড়ে। নয়ত মহানাম বেশ আছেন। সেইজন্যেই চিন্তা করবার অবকাশ যত কম জোটে ততই তাঁর উপভোগ বেড়ে যায়। বৃহস্পতিবার চন্দ্রশেখর য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে তাঁকে কুলফি খাওয়াতে নিয়ে গেল। এই জিনিসটা মহানামের খুব প্রিয়। খেতে খেতে বললেন—'দ্যাখো শেখর, খাওয়ার ব্যাপারে আমার এই অতিরিক্ত বিলাসটা লক্ষ করলে আমার আজকাল মনে হয় আমি তোমাদের সেই ওর‍্যাল সাকিং স্টেজে থেকে গেছি। ওর‍্যাল সাকিং, ওর‍্যাল বাইটিং সব আছে না উদ্ভট উদ্ভট!'

চন্দ্রশেখর হেসে বলল—'তাহলে আপনার এত স্বাধীন হবার কথা নয়। আপনি তো খুবই ইনডিপেন্ডেন্ট।'

'কোথায়? কলকাতায় যজ্ঞেশ্বরের ওপর সেন্ট পার্সেন্ট নির্ভর করি। এখানে দ্যাখো, কত সহজে তোমার নিমন্ত্রণটা নিয়ে নিলুম। অন্যত্র থাকলে নিজের দায় নিজেকে খানিকটা তো বইতেই হত।'

'এখানেও তো বইছেন। রুমাল গেঞ্জি কাচছেন। ব্রেকফাস্টের বাসন ধুচ্ছেন, বিকেলে আমাকে চা করে খাওয়াচ্ছেন।'

'কিন্তু দ্যাখো, আমার এই ইজি-গোয়িং স্বভাবটা। কোনও কিছুকেই জীবনে গুরুত্ব দিলুম না। ওই হচ্ছে, হবে, যা হল হল। এটা কিন্তু পরিণত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ নয়।'

চন্দ্রশেখর বলল—'আগে তো আপনি নিজেকে নিয়ে এতো মাথা ঘামাতেন না, কি হল?'

'চল্লিশোত্তর ডিপ্রেশন বোধহয়। অনেক দিন ধরে চলছে।' মহানাম আর একটা পেস্তা-কুলফি নিলেন। পুরো খোয়াক্ষীরের স্বাদ, পেস্তায় সবুজ হয়ে রয়েছে। দেখতেও খুব সুন্দর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাপানি কাপের মতো দেখে প্লেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন মহানাম—'খাবার জিনিস দেখতেও খুব সুন্দর হওয়া চাই, শেখর, বুঝলে? এই কুলফিটা দেখো সাজ-সজ্জা করা নর্তকীর মতো রূপসী।'

'স্টেজে নামতে না নামতেই খেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে, বেচারার এই যা!' চন্দ্রশেখর বলল।

'পুরো জীবনটা আমার এইরকম তাৎক্ষণিক উপভোগে কেটে গেল শেখর।'

'আপনাকে আজকে কিছুই-তো হল-না বিলাসে পেয়েছে, সামহাউ।'

'দ্যাট রিমাইন্ডস মি, শেখর—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, গান, লোকশিল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক ট্যুর, মায় কৃষিব্যাঙ্ক পর্যন্ত করে বলে থাকতে পারেন—হায়, কিছুই তো হল না। তাহলে আমাদের মতো লোকে কি বলবে, হে!'

'অন্যদিক থেকে দেখুন। কিছুই তো হল না এ ফীলিং যাঁদের আসে তাঁদের পার্ফেকশন-এর নেশা আরও তীব্র বলেই আসে। তাই নয়?'

'বাজে বকছ। তোমার এ ফীলিং হয়?'

'একেবারেই নয়! সারাদিনের শেষে রোজ নিজে নিজের পিঠ চাপড়াই ওহ্ কত কাজ করা হল। পৃথিবীতে একটা দাগ রেখে যাচ্ছি।'

চন্দ্রশেখর শব্দ করে হাসতে লাগল। 'নিজে রান্না করে খাই বলে পর্যন্ত পৃথিবী এবং সমাজের কাছেও অতিরিক্ত কৃতিত্বের প্রশংসা দাবী করি।'

'তা কিন্তু তুমি করতেই পারো শেখর। তুমি একটা এ-ক্লাশ শেফ্।'

'স্যান্ডউইচ খেয়েই রান্না বুঝে গেলেন?'

'আরে আমাদের ওখানে বলে চা আর পান যারা ভালো তৈরি করতে পারে তারা অবধারিত ভাবে সুরাঁধুনি। তুমি যখন স্যান্ডউইচটাকেই পানের মতো ব্যবহার করো, তখন...'

'কি বললেন স্যান্ডউইচটাকে পানের মতো ব্যবহার করি?'

'তাছাড়া কি? যখনই তোমার মুখোমুখি হই একটা করে স্যান্ডউইচ ধরিয়ে দাও, নিজেও চবৎ চবৎ করে চিবোচ্ছ, আমাকেও চিবোতে দিচ্ছো। ফলে, রাত্তিরে এত কম খিদে থাকছে যে তুমি কি মহাবস্তু রাঁধছ চাখবার সুযোগই পাচ্ছি না।'

চন্দ্রশেখর হো-হো করে হাসতে লাগল

'আগে বলবেন তো, ইস! আসলে বাইরে থেকে থেকে স্যান্ডউইচ, হট ডগ আর হামবার্গার-এ এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে...। কি আশ্চর্য, বলবেন তো আপনার অসুবিধে হচ্ছে!'

'অসুবিধে হলে তো বলব!' মহানাম মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললেন—'শুদ্ধ খাদ্যের মাধ্যমে ছাত্রজীবনে অর্থাৎ প্রথম যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছো আমাকে, এর পরেও অসুবিধে? শেখর, জীবনের প্রত্যেক স্মৃতির একটা আনুষঙ্গিক গন্ধ থাকে লক্ষ্য করেছো? তোমার হ্যাম স্যান্ডউইচের সঙ্গে কি একটা সস দাও, উর্সটার সস্ বোধহয়, আমি যত না খাই ওই গন্ধটার মধ্যে ডুবে থাকি, আর আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করে লাল ইঁটের সাতশো আটশ বছরের পুরনো সব বাড়ি,—ফায়ার প্লেস, চিমনি, সাদা কেশর প্রোফেসর, স্মার্ট ডন, গোলাপ ফুলে ভরা বাগানে ইংরিজি ঘাসের গন্ধ। সঙ্কীর্ণ সব ঐতিহ্য ভরা অলি গলি। ট্রিনিটি কলেজ, ক্রাইস্ট চার্চ, মডলিন, পেমব্রোক, কুইন্স্।'

'জীবনের সুস্বাদু সময় কি তবে শুধু অতীতেই? এটা আমি মানতে পারছি না কিন্তু।'

'শুধু অতীতেই? না তা বলব না। তবে গুজরাতিরা যেমনি মিষ্টি দিয়ে শুরু করে ভোজ, জীবনটাও আমরা সেই রকম মধুরেণ আরম্ভ করি। তেতো, কটু, কষায়, ঝোল, গরগরে এসব স্বাদগুলো পরে আসে। ধরো রসোগোল্লা দিয়ে আরম্ভ করে মাঝখানে বিরিয়ানি, শেষে নিম-বেগুন দিয়ে ভোজ সমাপ্ত করার মতো।'

'নিম-বেগুন জিনিসটা কি?'

'খাইয়েছি তোমাকে, ভুলে মেরে দিয়েছো, নিমপাতা, মার্গোসা লীভস্ হে, তাই কুড়কুড়ে করে ভেজে ছোট ছোট করে কাটা বেগুনের ভাজার সঙ্গে মেলানো।'

'ওঃ, সে তো সাঙ্ঘাতিক তেতো।'

'আরে বাবা, খেতে জানো না তাই, কফি, চীজ এসবেরও একটা পানজেন্ট স্বাদ আছে, অনেকেই প্রথমটা পছন্দ করে না। পরে রীতিমতো ভক্ত হয়ে যায়। আমাদের বেঙ্গলি নিম-বেগুনও তাই। তাছাড়া এর গুণ অনেক। খুব ভালো অ্যাপিটাইজার।'

'তা, সেই অ্যাপিটাইজার দিয়ে ভোজ শেষ করবেন কেন?'

'কেন আবার কি? খাদ্যের ভোজ তো অ্যাপিটাইজার দিয়েই আরম্ভ হয়। জীবনের বেলায়, তেতোটা শেষের দিকে পড়ে, ভালো লাগে, খাসা লাগে। বৃদ্ধদের লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। মুখে বলছেন, তেতো-তেতো সব তেতো হয়ে গেল। তারপরেই ও কি দিদিভাই, কি খাচ্ছো—ফুচ্‌কা—দেখি দেখি আমাকেও একটা দুটো দাও তো, টেস্ট করে দেখি।'

'মানে ঠোঁট আর জিভে জীবনের স্বাদ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। ওর‍্যাল সাকিং স্টেজ!'

'ওর‍্যাল সাকিং স্টেজ। ইয়েস। বউমা তখন মা, মেয়ে আরেক মা, তারা আর কারুর দিকে মন দিলেই ঠোঁট ফুলতে থাকে।'

'আপনার এসব জানা হল কি করে? বাড়িতে তো সেই কোনকাল থেকে যজ্ঞেশ্বর আর আপনি।'

'তুমি কি মনে করো পরোক্ষ অভিজ্ঞতার স্টক আমার কম? কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না শেখর।'

দুজনের বাড়ি ফিরতে প্রচুর রাত হল। অটো-ট্যাক্সি নিয়ে পুনে-ক্যাম্প প্রায় চষে ফেললেন মহানাম। বাঁধ-গার্ডেনে ঝকঝকে আলো, শেখর বলছিল নেমে দেখে আসতে। মহানাম বললেন, 'এখন কোনও গার্ডেন কোনও বাগ নয়। আমি শুধু শহরটাকে অনুভব করবার চেষ্টা করছি শেখর। তবে মোটমাট কয়েক' শ' বছরের ইতিহাস সত্ত্বেও তোমার পুনের ব্যক্তিত্ব যেন কেমন দানা বাঁধেনি, চরিত্র ফোটেনি। পেশোয়াদের পুনে, আর মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুনে মিশ খায়নি। চওড়া চওড়া রাস্তা, শপিং কমপ্লেক্স, বাড়ি, কলেজ, য়ুনিভার্সিটি এবং পার্ক হলেই যে প্রাণবন্ত শহর হয় না, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় তোমার এই পুনে।

'যারা এখানে বসবাস করে তারা কিন্তু অন্যত্র গেলে খুব ক্র্যাম্‌প্‌ড, বোধ করে। এত স্পেস!'

'ঠিক বলেছো। স্পেস। শুধুই স্পেস। নিরালম্ব। হতে পারে এটা আমার কলকাতাইয়া সংস্কার। কিন্তু বম্বে দিল্লি মাদ্রাজের মতো শহর ছেড়ে দিলেও, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, চণ্ডীগড় সবারই যেন আরও স্পষ্ট চরিত্র আছে। আমাদের বিখ্যাত রোম্যান্টিক লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন এখানে। জানো নাকি?'

উঁহু!' চন্দ্রশেখর বলল।

চন্দ্রশেখরের বাড়ি একতলা। সামনে সুন্দর খানিকটা নিজস্ব লন আছে। তাছাড়াও অন্যান্য ফ্ল্যাটের সঙ্গে ভাগের বাগান। দুটো শোবার ঘর,তার একটাকে পড়ার ঘর তৈরি করেছে চন্দ্রশেখর। মহানাম এই ঘরটাই পছন্দ করেছেন। বইয়ের গন্ধে ঘুম ভালো হয়। রাত এগারটা বেজে গেলে লনের মাঝখানে স্তব্ধ মহানামের গায়ে একটা চাদর দিয়ে দেয় চন্দ্রশেখর। প্রথমে কথা, তারপরে আরও কথা, তারপরে আস্তে আস্তে দুজনে চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর মহানাম বললেন—'তোমার পুনেতে অতীতকে যাদুঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে, বর্তমানও যেন নেই-নেই, খালি ভবিষ্যৎ। কিন্তু একটা জিনিস আছে বড় সুন্দর।'

'কি?'

'নীল রাত। নীলচে ভোর। এই শব্দবন্ধগুলো দিয়ে কবিরা ঠিক কি বোঝাতে চান, চন্দ্রশেখর, তোমার পিপরি আমায় বুঝিয়ে দিল।'

'খুলে বলুন।'

'দ্যাখো, তোমাদের এই স্যাটেলাইট টাউনে সব নতুন নতুন বাড়ি। পরিকল্পিত শহরতলি। প্রচুর পরিসর। কোথাও চোখ আটকায় না। যেদিকেই তাকাও অখণ্ড নীল আকাশ। রাত্তিরে এই সব আশপাশের দৃশ্যও ডুবে যার অন্ধকারে, শুধু চারপাশ ঘেরা নীলের তাঁবুর মধ্যে বসে আছি মনে হয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নীলরাত। ভোরবেলাও ঠিক এই জিনিসটাই হয় একটু অন্যভাবে। একটু একটু কুয়াশা এখনও থাকছে না,থাকলেও আকাশ দশ দিক দিয়ে এমন ভাবে নেমে এসেছে, ঘিরে ধরেছে যে তার তুলনায় বাড়ি-ঘরের গাছ-পালার উন্নতিরেখা নগণ্য।'

চন্দ্রশেখর বলল—'তাহলে যখন কবিরা বেগুনী চাঁদ, মেরুন আলো এ সব বলেন সেগুলোকেও সত্য বলে ধরে নিতে হবে?'

'সত্য মানে? একেবারে বাস্তব, কংক্রিট, সাবয়ব। শান্তিনিকেতনে দোল

পূর্ণিমায় চাঁদ উঠল, একেবারে সাদা ঝকঝকে। আমরা লাল চাঁদ দেখতেই অভ্যস্ত। পূর্ণিমার নতুন চাঁদ সাদা হবে ভাবতেই পারি না। আসলে অ্যাটমসফিয়ারে ধুলো যত কম থাকে. চাঁদও স্বভাবতই তত পরিষ্কার দেখায়। ভায়োলেট চাঁদও ওই ধূলিকণারই খেলা, মেরুন আলোও। কখন কোন অ্যাঙ্গল-এ সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে তার ওপর সবটা নির্ভর করছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ব্যঞ্জনার খাতিরে বা কল্পনার দৃষ্টি নিয়ে কবিরা কিছু বলেন না। আমি শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাইছি কবির অভিজ্ঞতার অনেকটাই বাস্তব।'

তাহলে যখন কবি বলছেন 'হোয়েন দা ইভনিং ইজ্ স্প্রেড আউট এগেনস্ট দা স্কাই/লাইক আ পেশেন্ট ইথারাইজড আপন আ টেবল্'—সেটাও একটা কংক্রিট ব্যাপার?'

'সেকি? এটা তো পুরো একটা উপমা। উপমা দিয়ে দৃশ্যপটের সাধারণ মেজাজ এবং দর্শকের মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

চন্দ্রশেখর লজ্জিত হয়ে বলল—'আসলে,ডক্টর রায়,আপনি এতো সুন্দর আবৃত্তি করেন, কবিতা সম্পর্কে একটা আগ্রহ জন্মে যায়। আমরা যে কোনও শিল্পকীর্তিকেই ইদ-এর সাবলিমেশন, কিম্বা নির্জ্ঞান স্তরের কোনরকম বিস্ফোরণ, কিম্বা কোনও একটা ডিফেন্স মেকানিজম বলে দেখতে অভ্যস্ত তো! কবিতার সৌন্দর্য নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করবার ট্রেনিং আমাদের নেই। আপনি যখন পড়েন, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। কোনদিন মনস্তত্ত্ব পড়েছিলাম বলেই আর মনে পড়ে না।'

'শুধু মনস্তত্ত্ব নয়, চন্দ্রশেখর, কিছুই পড়েছ বলে মনে হবার কথা নয়। নান্দনিক অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভবের সারাংশটুকুকে কাজে লাগায় শুধু। সে সময়ে আমরা শুধুই অনুভূতি শুধু উপলব্ধিসার সত্তা থাকি। পরে আবার ফিরে আসি শিক্ষিত, পরিশীলিত, মার্জিত সামাজিক সত্তায় যার মধ্যে স্মৃতি একটা মস্তবড় নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। আসলে শিল্পের রসাস্বাদনের সময়ে ঠিক কি ঘটে সেটা তোমাদেরই বলবার কথা। আমি অনধিকার চর্চাই করছি।'

'তা নয়। রসাস্বাদক হিসেবে আপনি অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ দিকটা দেখতে পাচ্ছেন। তত্ত্বজ্ঞ হিসেবে আবার তার কার্য কারণ বিশ্লেষণ করছেন। আপনার তো কোনটাই অনধিকার চর্চা নয়।'

মহানাম হঠাৎ বললেন—'আচ্ছা চন্দ্রশেখর, তুমি অরিত্র চৌধুরীকে চেনো?

আগে ওল্ড পুনেতে থাকত। ইদানীং বোধহয়...'

চন্দ্রশেখর বলল—'জে পি জে ইন্ডাস্ট্রীজ-এর চীফ পাবলিক রিলেশনস ম্যান অরিত্র চৌধুরী? ওকে কে না চেনে? বিশেষ করে আপনাদের বাঙালি কমিউনিটির তো মাথা। পুজো-টুজো, জলসা, কবি-সম্মেলন। এসব বিষয়ে খুব উৎসাহ। ওঁর স্ত্রী-ও তাই। আরে ওদের জন্যেই আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলো থরোলি দেখা জানা হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে আগে বলেননি তো?'

'না, তা বলিনি। তবে কতকগুলো পুরনো স্কোর...তুমি বলছিলে না মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক সংহতি দৃঢ় করতে আমার সব থরোলি দেখা উচিত, তা সেই থরোলি দেখতে হলে আমার পয়লা আইটেমই হওয়া উচিত অরিত্র চৌধুরী।'

'কেন বলুন তো! বাংলা কালচার মহারাষ্ট্রে প্রচার করে বলে? আপনি সেটা জানতেন?'

'না না' মহানাম হেসে উঠলেন—'হী হ্যাজ আ ভেরি ইনটারেস্টিং হিসট্রি।'

'ব্যাপার কি বলুন তো? ইজ হী সর্ট অফ অ্যান এগজিবিট?'

'এগজিবিট তো বটেই। পোয়েট টার্নড এগজিকিউটিভ, বোহেমিয়ান টার্নড হাউজহোল্ডার, রেবেল টেমড বাই সিলভার!'

চন্দ্রশেখর আশ্চর্য হয়ে বলল—'রহস্য রহস্য গন্ধ পাচ্ছি। পুরনো বন্ধু না কি আপনার? একটু জুনিয়র বলে যেন মনে হয়।'

'একটা বয়সের পর সিনিয়র-জুনিয়র, গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র সব এক হয়ে যায় শেখর; তুমি এখনও সে বয়সটাতে পৌঁছওনি মনে হচ্ছে!'

শেখর বলল—'কি জানি আমাদের ভারতীয় মন তো, কেমন একটা সম্ভ্রমহানির ভয় সব সময়ে ভেতরে কাজ করে। কর্নেলে যখন প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা হয় সেই থেকে যে অগ্রজ-অগ্রজ একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে!'

'তুমি কিন্তু এটা আমাকে আদৌ কমপ্লিমেন্ট দিলে না শেখর। কোনদিনই আমি নিজেকে কারুর থেকে ছোট অথবা বড় ভাববার পক্ষপাতী নই। তাহলে কমিউনিকেট করতে অসুবিধে হয়। তাছাড়া সময়কে অত সমীহ করতে নেই, তাহলে পেয়ে বসে। আই প্রেফার টু বি ইটারন্যালি থার্টি নাইন। চল্লিশে পৌঁছলে আবার শ'য়ের মতে স্কাউন্ড্রেল হবার ভয় থেকে যাচ্ছে।'

হাসছে চন্দ্রশেখর। মহানাম বললেন—'তোমার বন্ধু ওর বাড়িটা চেনে। আসবার দিন একবার ঢুঁ মেরে এসেছি। উজিয়ে গিয়ে। তোমার বন্ধুটিকে ফোন

করে দেখো না যদি ওকে পাওয়া যায়।

চন্দ্রশেখর বলল—'ওর দরকার কি! আমার গাড়ি সার্ভিসে গিয়েছিল, কালই এসে যাচ্ছে। খড় কি ওয়েস্টে প্রিয়লকরনগর। আমিই আপনাকে নিয়ে যেতে পারব।

'উহুঃ' মহানাম বললেন।

'কেন? আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

'তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে—' মহানাম রহস্যময় হেসে বললেন—'আমি তোমাকে নিচ্ছি না। একাই যাবো।'

আনমনে পাইপে তামাক ভরছেন মহানাম। তিনি এখন ডাফ লেনের বাড়ির সাদা-কালো মার্বলের মেঝের অলঙ্কৃত দাওয়ায় ডক্টর সাধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আসা য়ুনিভার্সিটির রিসার্চ-স্কলার একটি তরুণের সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেটি আজ তৃতীয়বার এলো। আজ সঙ্গে একটি মেয়ে। মহানামের ডাইনে বিশালাকায় পেতলের টবে অ্যারিকা পাম। বাঁ দিকে পাথরের বালক মূর্তি কন্দুক হাতে লীলারত। এই দৃশ্য, এই সাক্ষাৎ, এবং এর পরবর্তী কথোপকথন অনেক অনেকবার পুনরাবৃত্ত হবে। ছেলেটি অত্যন্ত চঞ্চল, বুদ্ধিমান, নাছোড়বান্দা। মেয়েটি যে ঠিক কি রকম তা মহানাম ভালো করে বুঝতে পারছেন না।

॥ ৪ ॥

নীলম এমনিতেই ওঠে বেশ ভোরে। একজন বাই এবং একটি জমাদার সম্বল। এদের কাজ-কর্ম দেখবার জন্যে দু হাত কোমরে লাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা তো আছেই। তারও পর যা বাকি থাকে তার পরিমাণও নেহাত কম নয়। অরি এবং পুপু বলে বাতিক। বাথরুম পরিষ্কার থেকে রান্নাঘর গোছানো পর্যন্ত নীলম একরকম স্বহস্তেই করে। এমনিতেই এখানে ধুলো ময়লা কালি নেই, তার ওপরে নীলমের বাতিক বা পরিচ্ছন্ন স্বভাব যার জন্যই হোক প্রত্যেকটি কোণ নিপুণভাবে ঝাড়া ধোয়া মোছা। যখন রান্না করছে, তখনও নীলমের হাতের কাছে দু তিন রকম ঝাড়ন। টালির ওপর একটু রান্নার তেল-মশলার দাগ পড়তে পারে না। বাসনের বাইরে বা কিনারেও না। নিজের হাতে তো নয়ই। অরি বলে বিজ্ঞাপনের রান্না। আজ নীলম স্নান এবং পুজোও সেরে নিয়েছে। অরির শোবার ঘরের সংলগ্ন ঠাকুর-তাক থেকে খুব ভোর থেকেই ফুল এবং ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে ধূপের গন্ধ ঘুমন্ত মানুষটির তন্দ্রায় প্রবেশ করছে। সাধারণত ভোরের

প্রথম চা নীলম রাত্রিবাস পরেই খায়। আজই স্নান-টান সেরে একটা পদ্মগন্ধের আবহ নিয়ে অরির বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছে। দিনটা বিশেষ দিন। অরিত্র আজকে তিন মাস ছুটির পর অফিস যাচ্ছে। যদিও আর কদিন পরই আবার বেশ খানিকটা ছুটি মঞ্জুর করেছেন ডাক্তার।

চোখ মেলেই নীলমকে এতো স্নিগ্ধ দেখে অরির মন অসম্ভব ভালো লাগায় ছেয়ে যাচ্ছে। এই ভালো-লাগার সঙ্গে খুব সম্ভব শিশুকাল এবং মাতৃস্মৃতির খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সারাজীবন ধরেই মানুষ কী পুরুষ, কী নারী, ফিরে ফিরে মাকে পেতে চায়। স্বীকার করে না কারুর কাছে। নিজের কাছেও। কিন্তু এই সব ছোটখাটো মুহূর্তের অকারণ ভালো লাগাগুলোই মায়ের সঙ্গে চিরন্তন নাড়ির যোগের নির্ভুল চিহ্ন।

অরি বলল—'আজ এমন লাজবন্তী লাজবন্তী সেজে প্রাতশ্চা দিতে এসেছো। ব্যাপারখানা কি বলো তো?'

'সে কি! আজকের দিনটা অন্যান্য দিনের থেকে যে আলাদা সে কথা কি তুমি ভুলে গেছো?' নীলম ভুরু কুঁচকে বলল।

অরি প্রাণপণে স্মৃতির ঘর হাতড়াচ্ছে। ঠিক যেন চোখ বেঁধে তাকে কানামাছি করে ছেড়ে দিয়ে গেছে কেউ। বিয়ের দিন? না তো! সে তো অক্টোবর! পুপুর জন্ম? জুনের কাঠফাটা গরমে। অরির নিজের জন্মদিন ডিসেম্বর, প্রতিবছর ওই দিনটা নীলমের জলুসওলা পার্টির উপলক্ষ। নীলমের জন্মদিন নাকি! যদ্দূর মনে পড়ছে সেটা ফেব্রুয়ারি-টারি হবে। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অরিত্র রহস্যময় মুখ করে বলল 'ভুলে গেছি! ইস বললেই হল? আজ তব জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের যাত্রাপথে...'

নীলম বলল—'ইসস্ তুমি এই ভাবছ? আমার জন্মদিনটা ভুলে গেছো, আবার ভাব দেখাচ্ছ, সব মনে আছে। ছি ছি।'

'আহা, অত ছিছিক্কারে দরকার কি? বলোই না বাবা আজ কী বিশেষ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে!'

'আজ তুমি অফিস জয়েন করতে যাচ্ছো। এটাও ভুলে গেছো?'

খুব হতাশ গলায় অরিত্র বলল—'ওঃ টাকা কামাই করতে যাচ্ছি বলে! পঙ্গু টঙ্গু হয়ে তোমার গলগ্রহ না হয়ে, আবার জোয়াল কাঁধে নিয়েছি বলে এতো পুজো-টুজো। তাই-ই ঘরণীর দেহে এতো সুগন্ধ আজ!'

পাউডারের রেণু বাতাসে উড়িয়ে নীলম বসল স্পর্শ বাঁচিয়ে, চেয়ার টেনে। গম্ভীর হয়ে বলল— 'কামাই করতে যাচ্ছো বলে নয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে

ফিরে আসছো বলে। আমার সিকিওরিটির জন্য টাকা-কামাইয়ের আর কি দরকার আছে? বাড়িটা আমার নামে। ইচ্ছে করলেও বার করে দিতে পারবে না। ডকুমেন্টস কোথায় আছে তাই-ই জানো না। তোমার টাকাকড়িরও বেশির ভাগ আমার নামে। আমারই বরং ইচ্ছে হলে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারি। বেচাল থেকে সাবধান।'

শুনতে শুনতে অরিত্রর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছিল। বলল—'বলো কি, এতগুলো ভুল একসঙ্গে করে বসে আছি! সর্বনাশ! তোমাকে এবার থেকে খুব সমঝে চলতে হবে মনে হচ্ছে!'

নীলম চায়ে চুমুক দিয়ে ঠোঁট উলটে বলল—'সমঝে তুমি আমাকে থোড়ি চলবে। যাই হোক সে তোমার ব্যাপার। বিক্রমকে একটা তার করে দিলুম।'

একটা যেন ইলেকট্রিক শক খেল অরিত্র।

—হঠাৎ।'

—'আসতে লিখে দিলুম। বিশে মার্চ নাগাদ।'

বিমূঢ় অরিত্র বেশ কিছুক্ষণ পর বলল—'অফেন্সে খেলছো?'

—'শুধু ডিফেন্সে আর হচ্ছে কই? তাছাড়া ওভাবে নেবার দরকারই বা কি? এষা নিশ্চয়ই তোমার-আমার মুখ দেখতে আসছে না। ঘোরবার জন্যেই আসছে। তোমার এই অবস্থাতে ওকে ঘোরাবে কে? সাথী যোগাড় করে দিলুম। ধন্যবাদ দাও আমায়।'

অরিত্র বলল—'একটা কথা তোমাকে,নীলম,বলে রাখি। এষা এলে, অর্থাৎ সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত আসে, তাকে আমি বিক্রমের সঙ্গে একা ছেড়ে দেবো না কখনও। তাছাড়া আমি যথেষ্ট ফিট হয়ে গেছি। আর এতো অবিশ্বাস, এতো ভয় থাকলে এখনও সময় আছে, আমি এষাকে বারণ করে জরুরী তার করে দিচ্ছি।'

—কিন্তু বিক্রম তো সস্ত্রীক আসছে। তোমার ভয়টা কোথায়? বিক্রমের সঙ্গে একা ছাড়ার তো প্রশ্ন উঠছে না!

—'সস্ত্রীক বা অস্ত্রীক যে কোনও অবস্থাতেই বিক্রম বীভৎস। নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিক্রমের কাছে কোনও বাধাই কিছু নয়। ব্যাপারটা তুমি ভালো করেই জানো। আচ্ছা নীলম, এষা তো শুধু আমারই বন্ধু না, তোমারও। ওর সাথী হিসেবে বিক্রমের কথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে?'

নীলম গম্ভীর হয়ে বলল—'কি জানি, আমি যেমন প্রাপ্তবয়স্কা, এষাকেও তো তেমন প্রাপ্তবয়স্কা বলেই মনে হয়। তোমার চেতনায় এষা যদি এখনও অসহায়া, অবলা, অপাপবিদ্ধা কিশোরী থেকে থাকে তাহলেও তো বাস্তব সত্য বদলাবে

না।'

অরিত্র বলল—'নীলম, আমি তোমাকেও কোনদিন বিক্রমের সঙ্গে একলা ছেড়ে দিই নি। তুমিও প্রাপ্তবয়স্কাই ছিলে।'

'প্রাপ্তবয়স্কা এবং আঠাশ উনত্রিশ বছরের যুবতী। তুমি বিক্রমকে ভয় পেতে, না আমাকে, তা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হয়নি।

অরিত্র বলল—'আমারও তো অনেক কিছু পরিষ্কার জানা নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

—'জানবার প্রয়োজন বোধ করনি বলেই জানো না, অরি। বিবাহিত স্ত্রী, তা সে যতই উদ্দাম প্রেম করে বিবাহিত হোক, ওয়ান্স ম্যারেড শী ইজ ম্যারেড ফর এভার, পড়া বই, জানা গল্প, জেতা দেশ, কোনও পুরুষই আর তাকে বেশি জানাজানির চেষ্টা করে না। করে কি? তবে পাহারাটা আঁটসাঁট রাখবার প্রয়োজন সব সময়েই বোধ করে। এখন সে প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে বলেই বোধহয় যা খুশি করা যেতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস।'

—'কাকে পাহারা দেওয়া। কাকে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বলছো নীলম?' অরিত্রর গলায় ক্ষোভের সঙ্গে বিরক্তি মিশেছে। তার প্রথম কাপ চা জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গেছে। নরম সুরে অরিত্র বলল—'তুমি যা ভাবছো, বা ভেবে থাকো, সবই ভুল, তোমার মনের বিকার। যা খুশি করার ইচ্ছে থাকলে এতোদিন করতে পারতুম না!'

—'করেছ কি না তাই বা আমি কি করে জানব?' নীলমের গলা চড়ে যাচ্ছে, পুপুর স্কুটারের শব্দ ছাপিয়ে। অরিত্র একটা সিগারেট ধরালো। সামান্য পরেই টেলিগ্রাম হাতে ঘরে ঢুকলো পুপু। টেলিগ্রামটা সেই দিন থেকে লিভিংরুমে মিউজিক সিসটেমটার তলায় পড়ে আছে। আজ বোধহয় উড়ে পড়েছে পুপুর হাতে।

—'মাম, বাবা এযা খান কে? আমাদের বাড়ি আসছেন?'

নীলম একটু হেসে বলল— 'তোমার বাবার গার্ল ফ্রেন্ড।'

অরি উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল—'তোমার মারও।'

—'হাউ ইন্টারেস্টিং!' পুপু শুধুমাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করে নিজের ঘরে চলে গেল। খুব সম্ভব মা বাবার স্বীকারোক্তি থেকে যতটুকু বোঝা গেল, গেল। বাকিটুকু নিজের বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নেবে।

একটু পরেই পুপু ওর বাড়ির ঢোলা জামা পরে বেরিয়ে এলো। মুখে জল চকচক করছে, হাতে তোয়ালে। হাত মুছছে। খুব সরল হাসি হেসে

বলল—'আমার ঘরে ফোল্ডিং খাটটা পেতে নিলেই তো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমাদের অত ভাববার দরকার কি!'

পুপু কতটা বড় হয়েছে অরির জানা নেই। ওর বোধহয় ধারণা ওর বাবা যতই বন্ধুবৎসল হোক না কেন, নিজের নির্জনতার অধিকার কয়েকদিনের জন্য হলেও ছেড়ে দিতে তার অসুবিধে এবং কষ্ট হয়। তাই নিজের সে অধিকার ও অনায়াসেই ছেড়ে দিল। উৎসর্গ করে দিল বলা চলে। তাদের এই হাজার স্কোয়্যার ফুটের অধিকাংশটাই লম্বা লিভিং রুম কেড়ে নিয়েছে। বাকি অংশ থেকে বেরিয়েছে দুটো বাথরুম। বেশ প্রসরযুক্ত রান্নাঘর। ব্যালকনি, সামনের পোর্টিকো। ঘর দুটো বড় নয় খুব। ছোট ঘরটা অরিত্রর দখলে। বড় ঘরটা পুপু বলে মার, মা বলে পুপুর। পুপুর বড় খাটেই নীলম শোয়। যখন অরির এখন তখন অবস্থা, সেই সময়টাতেই খালি নীলম অরিত্রর ঘরে ছিল কটা দিন। তারপর থেকে বেচারার টানাটানি চলছে খালি। মাঝরাতে বার দুয়েক করে দেখে আসে। স্থির থাকতে পারে না নীলম। এক এক দিন পুপুও দেখে আসে।

নীলম উঠল। এইবারে পুপুকে খেতে দেবে। এইসময়ে পুপু সারাদিনের সবচেয়ে ভারি খাবারটা খেয়ে নেয়। আগের দিন রাত্রে একটু শুকনো মাংস কিংবা সবজি করা থাকে। এখন গরম গরম পরোটা করে দেবে। মেথি-পরোটা কিংবা আলু-পরোটা। ভালো করে খেয়ে নেবে পুপু আচার এবং স্যালাড সহযোগে। কলেজ বেরোবার সময়ে খালি দুধ। দুপুরে একটা দুটো ফল দিয়ে লাঞ্চ সারে। ক্বচিৎ কখনও টিফিন নেয়। এখন আস্তে আস্তে ওর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। টি-স্কেল সেট স্কোয়্যার, বড় বড় সাদা কাগজ ছড়িয়ে ও ডায়াগ্রাম নিয়ে মগ্ন থাকবে। এই সব ড্রাফট সবই ওর কলেজের কাজ নয়। প্রচণ্ড নেশা ওর। দেশ-বিদেশ থেকে বই আনায়, নতুন বাড়ি, নতুন হাউজিং কমপ্লেক্স, নতুন শহর বানাবে ও। কতকগুলো সময়ে ঘরটা ওকে সম্পূর্ণই ছেড়ে দিতে হয়।

পুপু খেয়ে দেয়ে ঘরে ঢুকে গেলে অরিত্র স্নান সেরে বেরোবে। সকালের দিকে একসঙ্গে সময় কিছুতেই হয় না। বাবা-মেয়ে বেরিয়ে গেলে নীলম কোমর বাঁধবে। কেউ কোনও ঘরে পড়াশোনা করেছিল, কেউ স্নান করেছে, কেউ কোথাও বসেছিল, শুয়েছিল, হেঁটেছিল, তার কোনও চিহ্ন রাখবে না। একেবারে সিনেমার সেট বানিয়ে ফেলবে। বাই শোবার ঘর ঝাড়া-পোঁছা করছে, রান্নাঘর থেকে নীলমের হঠাৎ বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠবে,—'বাই বাই, খাটের সাইডগুলো মুছেছো? জানলার পাটগুলো! ওকি সার্সিতে একটা দক্ষিণ আমেরিকার মতো দাগ কেন? মোছো মোছো! আর একটু লোশন দাও, হ্যাঁ

এইবার হয়েছে।'

এখনও অনেক সময়। তবু অরিত্র স্নান করে ফেলেছে বলে খেতে বসলো। নীলম নিজের প্লেটটাও নিয়ে এসেছে। কফির পট এনে রাখল। সব গুছিয়ে বসতে বসতে মৃদু গলায় বলল— 'একটা কথা। পুপু যে ব্যবস্থা বলল সেটাও ওর মতো করে বলেছে। বলেছে বলেই যে ওর কথাটা আমাদের মানতে হবে তার কোনও মানে নেই। এষা যদি আসে, যদি কেন আসবেই, আমি তোমার ঘরেই থাকবো। খাটটা একটু ছোট, তা হোক।'

অরি আনমনে খাচ্ছিল, বলল—'তুমি তো এষা না এলেও আমার ঘরে থাকতে পারো। থাকো না কেন, তুমিই জানো।'

নীলম বলল—'মিষ্টিটা আনতে ভুলে গেছি। খাও, আসছি।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেল জবাব না দিয়ে, অর্থাৎ জবাব এড়িয়ে। এখন ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বার করবে। তাকে গরম জলে বসিয়ে ঠাণ্ডা ছাড়াবে। ততক্ষণ অরি হয়ত খাবে ঠিকই, কিন্তু নীলমের খাবার প্লেটের ওপর শুকোতে থাকবে। এইরকমই ওর অভ্যেস।

অরিত্রর মনে হল—নীলম কি তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে চায়? ওদের এই বাড়ির মস্ত ত্রুটি হল, গেস্ট রুম নেই। অথচ ভিন্ন প্রদেশে যাদের আত্মীয়স্বজন তাদের গেস্ট রুমটা একান্ত জরুরী। অতিথি এলেই বাড়ির সমস্ত চলতি ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে যায়। সেটা অরিত্রর একদম পছন্দ না। নিজের কাজের জিনিস খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়। নিজস্ব জায়গাটাতে না শুতে-বসতে পেলে সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি লেগে থাকে মনে। কিন্তু কেউ এলে এরকমই হয়। এতেই ওরা তিনজন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এবারেও কয়েকটা দিন নিজের ঘরটা এষাকে দিয়ে সে অনায়াসেই লিভিং রুমে শুতে পারতো। সোফা-কাম-বেডের ওপর। স্টিরিওটা যে টেবিলে রয়েছে তার ওপর এবং ড্রয়ারগুলোতে নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যেত না। কিন্তু নীলম যদি এই ব্যবস্থা করে, এষা তাহলে একলা ঘর পাবে না, এটা যে কোনও অতিথিকেই পারলে দেওয়া উচিত। খুব ঘনিষ্ঠ, নিত্য আসা-যাওয়ার লোক হলে আলাদা কথা। কিন্তু এষা যে একেবারেই নতুন। এই অরিত্র, এই নীলম, তাদের যুগ্ম সংসার এবং বিশেষত পুপুকে সে চেনে না। তাকে পুপুর ঘরে থাকতে দেওয়াটা···। কে জানে এষার নিজের অভ্যাস কি রকম! অথচ এ ব্যবস্থার ওলটপালট মানেই ভুল বোঝাবুঝি সাংসারিক অশান্তি, এতো অশান্তি অরিত্রর সংসারে বিক্রমরা পুনে ছাড়বার পর কখনও হয়নি। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে

মেনে নেওয়াই ভালো।

যেভাবেই হোক, যেভাবেই থাকতে হোক, এষা আসুক। এষা থাকুক। কাছাকাছি। এষাকে ছুঁয়ে সেই হাওয়া সারা বাড়ি ঘুরলেও একবার না একবার তো তাকে এসে ছুঁয়ে যাবেই। এষার উপস্থিতির সুরভি লাগবে অরির গৃহস্থালিতে। এতদিনে বুঝি অরির বিবাহে সত্যিকারের স্বীকৃতির সীলমোহর পড়বে। এষা দেখবে, এষা ছোঁবে, এষা থাকবে বলে।

হঠাৎ অরিত্র নিজের মধ্যেই একটা ধাক্কা খেল। এষার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এষার স্বীকৃতিকেই এমন চরম এবং পরম ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি? আগেকার সম্পর্ক তো নেই-ই। সম্পর্ক আসলে খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। যখন যেখানে থেকেছে, বছরে দু একবার করে এষার পুরনো ঠিকানায় নিজের ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিয়ে গেছে অরিত্র। পুজোর পর এবং নববর্ষে তো বটেই। মাঝেও কখনও কখনও আরেকটা দিয়েছে। একটারও জবাব পায়নি। একটারও না। প্রত্যেকবার চিঠি ফেলে দেহলিদত্তপুষ্প হয়ে থেকেছে। একটার পর একটা দিন চলে গেছে অর্থহীনতার কবলে। তারপর কাজে-কর্মে-গার্হস্থ্যে-চিকিৎসায়-প্রাত্যহিকতায় ভুল। কিছু যে পাওয়ার কথা ছিল, পাওয়া হয়নি সেটা ভুলে যাওয়া। কিন্তু বিস্মৃতির মর্ম থেকে রক্তের ঢেউয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে দোল লাগে। বসন্তের আকাশময় কার নীল শাড়ি ছড়িয়ে থাকে। প্রিয়লকরনগরের বীথিকাপথে গাছের শরীর থেকে কোনও মানবীর মৃদু দেহগন্ধ ভেসে এসে হঠাৎ কিরকম একটা কষ্ট দেয়। সারা জুলাই সহ্যাদ্রি মুখ ভার করে থাকে। মৌসুমী বায়ুর ধাক্কায় কি রকম একটা চকচকে আধো-অন্ধকার, ধূমল অথচ ভেতর থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে, পেছনে বুঝি বা সূর্য আছে। এষার গাত্রত্বকের সেই ভাস্বর পেলবতা মেদুর বর্ষায়, ভুলে থাকা সেও যে ভোলা নয় পুরোপুরি।

কিন্তু আঠার বছর পর। আঠার বছর পর এষা কেমন আছে, কেমন হয়েছে। আর দু বছর হলেই সেই বিখ্যাত কুড়ি বছর পর হয়ে যেত। শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে। কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায়, পাই যদি হঠাৎ তোমারে।

কিন্তু এতদিন পর, আঠার বছরে গড়ে আঠার দুগুণে ছত্রিশখানা চিঠি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার পর সে অরিত্রকে স্মরণই বা করল কেন! একটা সময় ছিল যখন এষা খুব বিপদে পড়লে অরিত্রর কাছে আসত। বিপদগুলো এষার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অরির কাছে হাসির। এখনও ভাবলে হাসি পায়।

এষা তার ডায়েরি ট্রামে ফেলে এসেছে। সে ডায়েরির মধ্যে তার যা কিছু

গোপন ব্যাপার। হঠাৎ বাড়িতে ফোন—এবার বউদি ডেকে দিয়েছেন। এষা ফোন ধরেছে। 'হ্যাললো, মিস টেগোরকে ডেকে দিন না একটু।'

'মিস টেগোর? মিস টেগোর বলে এখানে কেউ থাকে না।'

'থাকেন না? কেন ভ্যানতারা করছেন মাইরি।'

'জীবনে সুলগ্ন সব সৈউতির কুঁড়ি থেকে ফুল
আশা আর আশাভঙ্গে, আনন্দ যন্ত্রণায় চুল-
চেরা মাত্র অবকাশ, ভোরের সুগন্ধ সেই ব্যথাকে আমূল
তুলিনি তো! যদি ফোটে আনন্দ বকুল!

এইসব ফুল-চুল-মূল ইকড়ি মিকড়ি রবিঠাকুরের বংশ ছাড়া কে লিখবে দিদি!'

এষা ছুটে এসেছে।

'অরিদা অরিদা, অসভ্য ছেলেগুলো রোজ একবার দুবার করে ফোন করছে। বউদি নামিয়ে রেখে দিচ্ছে তা-ও। ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে বাড়িতে। নানারকম গলা করতে পারে আবার। ওই ডায়েরির মধ্যে শুধু কবিতা নয়, রাশি, রাশি কোটেশন আছে, সেসবের ওরা কদর্থ করবে, অনেক ঠিকানা, ফোন নম্বর প্রত্যেককে বিরক্ত করবে।'

অরিত্র গম্ভীর হয়ে শুনছে, ছবি আঁকছে।

'কিছু করো অরিদা, কিছু তো বলো!'

' কি বলবো? ল্যাদাড়ুস মেয়েদের এমনিই হওয়া উচিত। মিলের পালটা সাধতে ডায়েরিটা যে যুক্তিযুক্ত নয় একেবারেই সে কথা অনেকবার বলেছি।'

এষা রাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। মিল সাধার কথা বললে ও সাঙ্ঘাতিক রেগে যায়। ওর সব কবিতা নাকি আকাশ থেকে পড়ে। এষা পাশ ফিরল, এবার চলে যাচ্ছে কি অদ্ভুত ছবি তৈরি করে। বৈষ্ণবপদাবলী থেকে উঠে এলো নাকি? বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে যেমতি যোগিনী পারা। ঈষৎ লালচে চুল মুখের আধখানা ঢেকে আছে। আঁখি পল্লব দেখা যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পাপড়ি। নাকের ডগা চকচক করছে। স্ফুরিতাধর।

অরি বলল—'এষা,শোনো, শোনো। এবার ফোন করলে ওদের ভিক্টোরিয়ার ইস্ট গেটে মানে ক্যাথিড্র্যাল রোডের দিকের গেটের কাছে ডেকো।'

'কি বাজে কথা বলছো? আমি চললুম। বিপদে নিজের ওপর নির্ভর করাই ভালো।'

'খারাপ কিছু বলছি না। তুমি বলবে—ডায়েরিটা আমার ভীষণ দরকার।

প্লী-জ ফেরৎ দিন। ঠিক যেমনি করছি এমনি করে ন্যাকমি ঢেলে দেবে বিশেষ বিশেষ শব্দের ওপরে। তারপর ওরা অবধারিতভাবে ওটা দিয়ে দিতে চাইবে তোমার সঙ্গে দেখা করে।'

'সে তো করছেই। আমি বলছি বাড়িতে আসতে। এলে ভালো করে খাইয়ে দেব বলছি। তা-ও আসছে না।'

'বাড়িতে আসবে না। যে জায়গায় বললাম সেখানে ডাকো, আসবে। সুড়সুড় করে আসবে। তারপর নির্ধারিত সময়ে যাবে ডায়েরিটা খুব নিরুদ্বেগে হেসে হেসে নেবে। আবারও মীট করবার নেমন্তন্ন করবে···

'বা। তারপর?'

'তারপর আমার ওপর ভরসা রাখবে। বেশ কোমর বেঁধে যেও।'

'মানে?'

'মানে, চুল টুল খোলা রেখো না। আঁচলটা কোমরে গুঁজে নেবে। টেনে দৌড় মারবার জন্যে প্রস্তুতি থাকতে হবে।'

এষা গেছে কথামতো। সবুজ শাড়িতে লাল পাড়। লাল আঁচলটা কোমরে গুঁজেছে। টিয়া রং গাছ, ঘাস, টিয়া রং এষার শাড়ি। দূর থেকে দেখছে অরিত্র আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। দূর থেকে। তিনটে মস্তান হাত পা নেড়ে একমুখ দাঁত বার করে কি বলছে এষাকে। এষার সামনে পড়ে ছেলেগুলো একটু থতমত খেয়ে গেছে। ঠিক যে ধরনের মেয়েলি ব্যক্তিত্বের সামনে এদের প্রতিভা পুরোপুরি বিকশিত হয়, এষা বোধহয় সে রকম নয়। ডায়েরিটা দিল একজন, পেছন থেকে একটু একটু করে এগিয়েছে অরিত্ররা।

'আবার কবে আসছেন? আমাদের তিনজনকে তিনটে আলাদা ডেট দিতে হবে কিন্তু।'

অরিত্রর ক্লাব এবার হকি-স্টিক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এষা বিদ্যুতের মতো সরে গেছে অকুস্থল থেকে। মেয়েদের জন্য পৃথিবীতে কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, মহাকাব্যের বাইরে কি আর সে সব লেখা আছে? রাত সাড়ে আটটায় অরিত্রদের এজমালি বাড়ির কুঠুরি ঘরে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে এষা। অরি যেন ঘুমিয়ে। চিবুকে কপালে স্টিকিং প্লাস্টার। অরির মা বলছেন —'অমন হকি খেলবার দরকার কি বলো তো! গুচ্ছের কাঁটা ছেঁড়া নিয়ে ছেলে ঘরে এলেন।' অরি চোখ বুজে মনে মনে হাসছে। হকি-স্টিকের যা দাপট, শত্রু পেটাতে গিয়ে কয়েকটা সেম-সাইড হয়ে গেল। তাকে ঘুমন্ত মনে করে এষা চলে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতার রূপটা আবার কোন পদাবলীর দেখা হল না যে অভিনয় করতে

গিয়ে ! এষা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ, দূরতম, রাত্রির নক্ষত্রের কাছে। সেই তুমি কেমন করে এতো কাছে আসতে পারো ? সেটাই অরিত্র চৌধুরীর মাথায় ঢুকছে না। পার্থিব জগতে সে কি প্রকাশিত হতে পারে ? হঠাৎ দপ করে অরিত্রর মনে হল—না পারে না। পারে না বলেই এই অদ্ভুত অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। আঠারটা বছর জীবনের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে চলে গেছে। এষা আর পদাবলীর এষা নেই। যেমন নীলমও আর নেই র‍্যাফেলের। এই সোজা কথাটা এতদিন কেন মনে আসেনি ! বাইরের এষার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের এষারও বদল হয়ে গেছে। আঠার বছর আগেকার সেই রক্তমাংস মেদমজ্জাময় উচ্ছল-উদ্ভিন্ন কাতর-আতুর-বিরহী-আবিষ্ট যে নীলম সে-ও তো আজ শীতল পাথরের চাপ। গতিহীন হিমবাহ। এষার পক্ষেও কি আর সেই দীর্ঘপক্ষ্ম, নিবিড়, নিতল, সজল, স্থিতিস্থাপক শ্যামবিদ্যুৎ থাকা সম্ভব হয়েছে ? এই আঠার বছর এষা কিভাবে কাটিয়েছে, তার কিছুই তো তার জানা নেই ! কোনও উপায় ছিল না জানবার। এষার বাড়িতে সে চিরকাল অনভিপ্রেত। সেখানে খোঁজ নিতে যাবার কোনও অর্থই নেই। তবু লিখে গেছে, যেন হর কি পৌড়িতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যারতির লগ্নে গঙ্গার জলে একটা করে দীপ ভাসিয়ে যাওয়া। স্রোতে ভাসতে ভাসতে দীপ চলে যায়— কস্মৈ দেবায় ? কস্মৈ দেবায় ! যার উদ্দেশে নিবেদিত হবিঃ সে কি পায় ! সেই আধাপরিচিত দেবতা যাকে ধূপধুনোর মধ্য দিয়ে আবছা দেখা গেছে সেই অপার্থিব কি সত্যি ? তার অলৌকিক মঞ্চ থেকে মানুষের দৃষ্টির সামনে সে কি নেমে আসবে ? আসা সম্ভব ? নাকি তার আগেই কোনও দুর্ঘটনা ! অরির হতে পারে, এষার হতে পারে। ভেতরটা প্রচণ্ডভাবে শিউরে উঠল। এষার যদি কিছু হয় ! অরি কি তার মৃত্যু চাইছে ? পাছে তার স্বপ্নভঙ্গ হয় ! না, না। সত্যকে দুচোখ দিয়ে দেখবার সাহস অরিত্রর আছে। এষা আর সে এষা নেই। অন্য এষা আসছে। অন্য নীলম, অন্য এষা, অন্য অরিত্র। জ্যামিতি বদলে গেছে। পুরনো ইতিহাসের পাতা ইরেজার দিয়ে মুছে মুছে মুছে অন্য ইতিহাস লেখা হবে। সেই ভালো। এই-ই ভালো। মৃদু হর্ন দিয়েছে পাটিল। টাইয়ের ফাঁসটা ঠিকঠাক বসিয়ে নিয়ে অরিত্র জুতোয় পা গলালো। নীলম ছোট প্যাকেটে করে ঠাকুরের ফুল এনে ওর মাথায় রাখলো, তারপর প্যান্টের পাশ-পকেটে গুঁজে দিল। দরজা খুলে গেছে। অনেক দিন পর আবার পুরনো রুটিন, কাজ, বহু লোকের সঙ্গে ডানহিল ঠোঁটে ঝুলিয়ে কথা, টেলিফোন, জিমখানায় লাঞ্চ, বিজ্ঞাপনের লে-আউট দেখা, ভিসুয়াল দেখতে বসে বিনয় দেশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ। কী অর্থহীন কাজে, সময়-অপচয়ে মানুষ মেতে থাকতে পারে। কী

অর্থহীন উপকরণ চাহিদা আমদানির দুর্ভেদ্য দুষ্টবৃত্তে সভ্যতার নাড়ি পাকে চক্রে জড়িয়ে গেছে।

॥ ৫ ॥

প্রথম দিনের সেমিনার শেষে মহানাম দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রশেখরের বাড়িতে তাঁর ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট ব্যালকনিতে। ফট ফট করছে বিকেল। এখনও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলো থাকবে। শেখর আজ যায়নি। ওর কাজ ছিল। ছাত্রদের নিয়ে বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদের কিছু একটা সার্ভে করছে। লো-ইনকাম-গ্রুপ। খুব সম্ভব ওল্ড পুনের দিকে কোনও স্কুলে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে ফিরে ছাত্রদের নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করবে, না বাড়ি ফিরে করবে বলে যায় নি। মহানাম এক পট কফি তৈরি করে খেয়েছেন। একটু ক্লান্ত লাগছিল, কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে গেছেন। শেখর ফিরে এলে একটু হাঁটতে বেরোবেন। বাড়িটা ফেলে বেরোতে পারছেন না। যদিও তাঁর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে রেখেছে শেখর। সারা দিন বাড়িটা একদম একা ছিল। এখন আবার ফেলে বেরোনো ঠিক হবে না বোধহয়। এই বিল্ডিং ব্লকগুলোর পেছন দিকগুলো ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা যায় না এই ব্যালকনিতে দাঁড়ালে। ফাঁক ফাঁক দিয়ে রাস্তার একটুকরো। রাস্তার ওপারে মাঠ আছে। ঘন বীথিকার ফলে মাঠের চেহারা উধাও। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মহানাম ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন। একটু অস্থির লাগছে। প্রিয়লকরনগরটা যাওয়া হচ্ছে না। প্রথম দিন মাঝরাত্রে ভূতের মতো গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

এই চেয়ারের পেছনটা ইচ্ছে মতো হেলানো যায়। একটু বেশি হেলিয়ে নিয়ে বসলেন মহানাম। মাথার পেছনে দুহাত। মহানামের ডাফ লেনের বাড়ি মার্বল প্যালেসের নামান্তর। সাদা-কালো ফুল কাটা মেঝেতে সামান্য একটু ছ্যাতলা পড়েছে। পুরনো দিনের মেহগনী চেয়ারে বিশদ কারুকার্য, একটুও হেলান দিয়ে বসবার উপায় নেই সে চেয়ারে। সামনে মার্বল-টপের টেবিল। মহানাম বলছেন—'ব্যাপারটা কি জানো অরিত্র। আই হ্যাভ ট্রায়েড টু মেনি থিংস ইন ওয়ান লাইফ। ডাক্তারি পড়তে পড়তে সাহিত্য, সাহিত্য শেষ করতে না করতে জড়িয়ে গেলুম সিম্বলিক লজিক আর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকসে, এখন আবার হোমিওপ্যাথির নেশা। মেটিরিয়া মেডিকা ছাড়া কিচ্ছু মাথায় নেই। একেবারে ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড। তোমাকে এখন বোদলেয়ার পড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং আই অ্যাম আফরেড অফ এষা।'

'সে কি ? কেন ?' এষা প্রায় উঠে পড়েছে চেয়ার থেকে। মহানাম হাসছেন—'কবিতার ছাত্রীরা অনেক সময়ে এমন শক্ত শক্ত প্রশ্ন করে যে আমার মতো পল্লবগ্রাহী মাস্টারমশাইরা সেসবের উত্তর যোগাতে পারে না।'

অরিত্রর চোখ এখনও জিজ্ঞাসু। বুদ্ধিমান ছেলে। ব্যাখ্যাটা তার বিশ্বাস হয়নি। মহানামের মনের কোনও গোপন কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অরিত্রর চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে আছে। কবিতার ছাত্ররা কি কূটপ্রশ্ন করতে পারে না।'

যজ্ঞেশ্বর লুচি, আলুর দম আর ইলিশমাছ ভাজা নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটারই রঙ সাদা। লুচি, আলুর দম ধবধবে সাদা। ইলিশমাছ ভাজার দরুন একটু সোনালি রং ধরেছে।

'আমি আবার কিঞ্চিৎ ভোজন বিলাসীও?' ছুরি-কাঁটা দিয়ে একটা লুচিকে চারখানা করতে করতে মহানাম বলছেন—'এদিক দিয়ে আমি একেবারে প্রিমিটিভ।'

সবিস্ময়ে এষা বলছে—'আপনি কি ইলিশমাছও ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাবেন ?'

'ছুরি-কাঁটা নয়, শুধু কাঁটা দিয়ে'। মহানাম মাছভাজাটাকে কাঁটায় গেঁথে মুখে চালান করে দিয়েছেন—'ওকি ? তোমরা নিচ্ছো না ?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে অরিত্র। এষা বলছে—'আমি চা-ও খাই না। ইলিশ মাছও খাই না মহানামদা।'

'এখনও দুগ্ধপোষ্য আছো না কি ?'

'শুধু দুগ্ধপোষ্য নয়। লুচি আলুর দম পোষ্যও আছি···। কিন্তু এতো সকালবেলায় এরকম হেভি ব্রেকফাস্ট করা আমার অভ্যাস নেই। অস্বস্তি হয়।'

'যজ্ঞেশ্বর !' মহানাম ডাকছেন—'যজ্ঞেশ্বর !' ধুতি শার্ট, কাঁধে ঝাড়ন, ঝাঁটা গোঁফ, পাকা চুল যজ্ঞেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছে।

'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম কদাচ করবি না। তোর বেগমবাহার লুচি আর মোগলাই আলুর দম নিয়ে যা শীগগিরই। এরা মনে করে খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে পড়াশোনার একটা ডাইরেক্ট শত্রুতা আছে। তা সে যে যা মনে করে করুক, আমি তোর রন্ধন-শিল্পের অবমাননা হতে দিচ্ছি না।'

যজ্ঞেশ্বর লুচির ট্রে তুলে নিচ্ছে আর এষা বলছে—'বেগম বাহার লুচি ? মোগলাই আলুর দম ? কি ব্যাপার এগুলো মহানামদা !'

'খেলে বুঝতে পারতে?' দ্বিতীয় লুচিটা ছুরি-কাঁটা দিয়ে সযত্নে পাট করতে করতে মহানাম বলছেন—'রুমালি রুটি হতে পারে। আর বেগমবাহার লুচি হতে

পারে না ? আবিষ্কর্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মাল। প্রায় ট্রান্সপেরেন্ট। আলুর দমটা টেস্ট করলেই বুঝতে পা পিছলে আলুর দম এ নয়।'

ফেরবার সময়ে সেদিন ওরা কি আলোচনা করতে করতে ফিরছিল ? মহানামের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। খুব সম্ভব অরিত্র বলেছিল —'আসলে লোকটা কিছু জানে না। ফরাসী নাকি মাতৃভাষার মতো জানে। হুঁঃ !'

'অদ্ভুত লোক কিন্তু।'

'অদ্ভুত না কিম্ভুত ! বেগমবাহার লুচি। যত্তসব !'

'ইস খেয়ে দেখলে হত। ভুল করলুম।'

'কিছু ভুল করোনি। কিপটে আসলে। রামকঞ্জুষ। কম চালাক নাকি ! ট্রেটা একবার চোখের সামনে দুলিয়ে দিয়ে গেল। ওইরকমই করে। সারাদিনে ওই একবারই কতকগুলো আইটেম রান্না করে যজ্ঞেশ্বর, ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার অবধি ওই একই জিনিস চালায়। ওই এক যজ্ঞেশ্বর রাঁধুনি কাম চাকর-কাম-জমাদার-কাম বাজার সরকার···'

এ ধরনের কথোপকথনটা নেহাত আন্দাজই নয়। সদ্য অক্সফোর্ড প্রত্যাগত মহানাম সম্পর্কে তখন এ ধরনের গল্পই চলছিল। এগুলো ভালোই উপভোগ করতেন মহানাম। তিনি নাকি দাড়ি রেখেছেন চিবুকের পোড়া দাগ গোপন করার জন্য। অ্যাসিডের পোড়া দাগ। সে দাগ নাকি সুইসাইড করতে গিয়ে হয়েছিল। পেছন থেকে কোনও সাহেব সহপাঠী হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বোতলটা সরিয়ে না নিলে আজ মহানাম হরিনাম হয়ে যেতেন। এবং সুইসাইড নাকি কোন নীলনয়না আইরিন ম্যাককাচ্চনের জন্য। কানে আসত কথাগুলো, মহানাম প্রতিবাদ করতেন না। এইভাবেই এক একটা মানুষকে ঘিরে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। য়ুনিভার্সিটি চত্বরে একটা দীর্ঘস্থায়ী গল্পের জন্ম দিচ্ছে তাঁর দাড়ি, যজ্ঞেশ্বর, মার্বল প্যালেস এবং বিচিত্র কথাবার্তা—বেশ মজা লাগে।

সব কিংবদন্তীরই পেছনে একটা সত্য বীজ থাকে। আইরিন নয়, আইরিস, আসবার সময়ে উপহার দিয়েছিল একটা তিনকোণা গ্র্যানাইট পাথর। সেটা নাকি ও সালসবেরিতে স্টোন হেঞ্জের আশেপাশে কুড়িয়ে পেয়েছিল। একেবারে পালিশ করা, একটা ফোলা তিনকোণা পাথর। এতজনে এতরকম উপহার দিল, আইরিস দিল পাথর। সহাস্য মুখে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল—'ডু য়ু সীরিয়াসলি মীন য়ু ফেল টু রেকগনাইজ ইট।'

'সীরিয়াসলি !'

'ইট ইজ মাই হার্ট দ্যাট আই অ্যাম গিভিং আনটু য়ু।'

'অ্যান্ড ইট ইজ মেড অফ স্টোন !'

'ওহ নো। ইট ইজ অ্যাজ লাস্টিং অ্যান্ড অ্যাজ হেভি।'

স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করতে গিয়ে মহানাম চুপ।

'শোনো আইরিস, আই লুক আপন য়ু অ্যাজ মাই সিসটার অ্যান্ড ফ্রেন্ড।'

'ডু য়ু পীপল ইন ইন্ডিয়া কিস ইয়োর সিসটার্স দি ওয়ে ইড ডিড অন ক্রিসমাস ঈভ ?'

'আই বেগ ইয়োর পার্ডন। ওয়ান নেভার নোজ হোয়াট ওয়ান ক্যান ডু আনডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ স্ট্রং লিকর। ওয়ান ডাজনট্ ইভন রিমেমবার।'

'ইউ নীড নট্ বেগ মাই পার্ডন, নাম। উই আর ইউজড্ টু বীয়িং জিন্টেড সিন্স দি গড্ডাম্ড ওয়র। মেন হ্যাভ থাউজন্ড্স্ টু চুজ ফ্রম।

গ্র্যানাইট ভারি, তপ্ত একখানা আস্ত হৃদয় উপহার দিয়ে চলে গেল আইরিস। অ্যাসিডের দাগ থুতনিতে যদি হতেই হয় তো আইরিসেরই হবার কথা। মহানামের নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা গল্পটা উল্টো শুনেছে। আসলে মেমসায়েব প্রত্যাখ্যান করা এখনও পর্যন্ত এরা ভাবতে পারে না। আর 'বিলেত' গিয়ে মেমসায়েব বিবি নিয়ে সায়েব হয়ে প্রত্যাবর্তন এই অতি-পরিচিত গল্পটা মহানামের খুব খারাপ লাগত। কিন্তু অ্যানি বেসান্ট, মার্গারেট নোবেল, মড গনের দেশের লোক হয়ে আইরিস কি করে অত সহজে বলল—'উই আর ইউজড্ টু বীয়িং জিন্টেড !' আসলে এ এক ধরনের মেয়েলি মর্ষকাম। কোনও ভিত্তি নেই এসব ধারণার। মহানাম বরাবর মেয়েদের সব ব্যাপারে সমকক্ষ ভেবে এসেছেন। যে মহীয়সী মহিলার কাছে আবাল্য মানুষ হয়েছেন, তাঁর সঙ্গ পেলে কেউ কোনদিন মেয়েদের ছোট মনে করবার ভুল করবে না। যে বোনের কথা তুলে আইরিসকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন মহানাম, সেই বোন কি জিনিস তা-ই তিনি জানেন না। অল্পবয়সে তাই পারিবারিক সম্পর্কগুলো নিয়ে মনের গোপন কোণে ভাবাবেগের আধিক্য থেকে থাকবে। মা বাবা ভাইবোনের স্বাদ কি জানেন না। কিন্তু ধাত্রী কাকে বলে, বন্ধু কাকে বলে তা ষোলো আনার জায়গায় আঠার আনা জানা হয়ে গেছে।

মহানামের কপাল চওড়া। বিদ্যাসাগরী না হলেও এবং কেশহীন না হলেও বেশ প্রশস্ত। নাকে আর্যতা স্পষ্ট। চিবুকটা সেই তুলনায় যেন ছোট। প্রতিবার দাড়ি কামাবার সময়ে আয়নাটা তাঁকে বকত— ছবির পটটাকে দুভাগে ভাগ করে নাও। ওপর দিকে অত রঙ চাপালে, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরই মহানাম দাড়ি রাখলেন। বেশ কালো কুচকুচে, ঢেউ খেলানো দাড়ি, প্রত্যেক

দিনই তাকে কেটে ছেঁটে মুখের সঙ্গে সমঞ্জস করে নিতেন ট্রিনিটি কলেজে থাকতেই। দাড়ি নিয়ে যখন ফিরলেন পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা চিনতে পারে না। শুধু চেহারা নয়, পুরো ব্যক্তিত্বই নাকি পাল্টে গেছে মুখ ঘেরা দাড়ির গোছার জন্য।

সম্বরণ বলত—'কি যে একটা অক্সো-ইরানিয়ান পার্সন্যালিটি করেছিস ! মনে হচ্ছে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে। দাড়িটা ফ্যাল।'

মহানাম বলতেন—'তোদের কেন আমি বোঝাতে পারছি না, দাড়িটা ফেললেও যা আছি তাই থাকব। ব্যক্তিত্বটারই বদল হয়েছে। তবে আমূল নয় ; ওটা তোদের বোঝার ভুল। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছে, পরে ঠিক হয়ে যাবে।' সন্দীপ বলল—'যাই বল একটা মিস্ট্রি আছে এর মধ্যে, আমি সেন্ট পার্সেন্ট শিওর। নয়ত সামান্য একটা দাড়ি কাটতে তোর এত আপত্তি হবে কেন ? গোঁফ হলেও বা কথা ছিল। গোঁফের আমি গোঁফের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।'

—'দাড়িও তাই। তোকে যদি তোর ঝুরো-গোঁফ দিয়ে চেনা যায় আমাকেও তবে এই চাপ-দাড়িতেই চেন তোরা।'

দাড়ি দিয়েই সম্ভবত মহানামি রহস্যের শুরু। সন্দীপের মিস্ট্রি কথাটাকে অবলম্বন করে সব মহলে প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। মহানাম কখনই বলেননি—'থুতনিটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না ওটা ঢাকতে দাড়ি রেখেছি।' হাসিটা যেন অনেক-কথা-বলার-ছিল গোছের। মহানামের স্বভাবই হল— অনেক কথায় মশগুল থাকা, যার মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত কথাটি খুঁজে নেওয়া মুশকিল। কিংবা অনেক হাসি, যার সবটাই শুধু আনন্দ বা শুধু প্রমোদের হাসি নয়। সুতরাং রহস্য।

জীবনের মূলে রহস্য তো সত্যিই ছিল। মা-বাপের ঠিক নেই যখন তখন লোকে ইচ্ছে করলেই বেজন্মা বলে গাল দিতে পারে। আঠার বছর বয়স হলে কস্তুরী মাসী বলেছিলেন—'আর বলিস না। লোকে যে কি করে আর কতদূর করতে পারে তার সত্যিই কোনও হিসেব হয় না। তুই নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হলি, তার পরদিন রাতেই তোর মা পালিয়ে গেল। ঠিকানা পরীক্ষা করে দেখি সব ভুয়ো। কিছুদিন হাসপাতালে বড় করে নিজের কাছে নিয়ে এলুম। দত্তক নিইনি, নিজের নাম দিইনি। নাম থাকলে তুই মহানাম হবি কি করে ? আর শুধুমাত্র এই কারণেই আমি তোকে মা বলতে শেখাইনি। আমাকে মা ডাকবি তারপর একদিন সেই নাটকীয় অভিমানের মুহূর্ত আসবে যেদিন জানতে পারবি আমি তোর মা নই। তারপরই বদহজম সেন্টিমেন্টের তাড়নায় একগাদা মেলোড্রামা। মহানাম,

তোর মা বাবা মৃত, সেটাই সত্য। তুই যেন আবার কর্ণ-টর্ণ হয়ে যাসনি। উপন্যাসের নায়কের মতো বাকি জীবনটা মায়ের খোঁজে ফিরিসনি যেন। তুই স্বয়ম্ভু। স্বয়ম্ভরও হবি। তোকে পৃথিবী তার প্রাথমিক বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েই পাঠিয়েছে। এত ভাগ্য সহসা হয় না। চট করে বন্ধন স্বীকার করিসনি কখনও। তবে যারাই তোর জন্ম দিক জিনগুলো ভালো ছিল রে', বলে কস্তুরী মিত্র হাসতেন।

মহানাম তখন অকালপক্ক কিশোর। এই ইতিহাসের জন্যই কি না কে জানে পৃথিবীর সবার সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কহীন মনে হয়, কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতেও তেমন কোনও তাগিদ অনুভব করেন না। দুহাতে নেন যা পান। তার দুহাতে বিলিয়ে দ্যান যা আছে। তবু লোকে কয় কৃপণ। আইরিস তো বলেই ছিল। বন্ধু-বান্ধব সবাই অভিযোগ করত। স্বভাবের এই কূর্মতা ঢাকা পড়ে প্রচুর কথায়, পান ভোজনে, আড্ডায়, তর্কে মেলা মেশা দিয়ে। খালি যারা খুব কাছে আসতে চায় তারাই বুঝতে পারে কোথাও একটা লৌহজাল আছে বুকের কাছে। সব তীর সেখানে ঠেকে যায়। আঘাতের তীরও, ভালোবাসার তীরও।

অনেক সময়েই মহানামের মনে হয় তিনি এখানে এই গ্রহে বেড়াতে এসেছেন। বা কোন কাজে এসেছেন। যেমন গিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। যেমন ঘুরে বেড়িয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। ডাফ লেনের বাড়িটাতেই মাত্র তিনি একটা স্থিতির কাছাকাছি কিছু অনুভব করেন। এটা কি খুব বেশি ঘোরার জন্য ? না কি আপন কেউ নেই বলে ? না স্বভাব ? চন্দ্রশেখর অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই শূন্যতাবোধ যা মাসির মৃত্যুর পর হল বোধগম্য ছিল, তা এখন চল্লিশোত্তর মহানামকে মাঝে মাঝে ভাবায়। যাদের কাঁধে অনেক মানুষের, অনেক সমস্যার গুরুভার, সেই গৃহীরাও তো সুখী নয়। যাদের মা বাবা, ভাই বোন, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবই আছে, তারা এইসব প্রিয়জনদের কাছ থেকে পালাবার জন্য অনেক সময় কি রকম হাস্যকর ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তা-ও দেখা আছে। পৃথিবীতে কি মহানামের সত্যিই শেকড় নেই ! তাঁরও কি কতকগুলো বন্ধনের দরকার ছিল ? বন্ধনের বিতৃষ্ণা বোঝবার জন্য ? জীবনের অভিজ্ঞতার স্কুলে ডবল প্রোমোশন পেয়ে যাওয়া কি তাহলে সৌভাগ্য নয় ?

॥ ৬ ॥

ফোন বাজছে ঝিঁঝির শব্দে। দুপুরের প্রহরা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। কাজকর্ম শেষ, খাওয়া-দাওয়া শেষ। খাবার হজম শেষ। ঢুলু ঢুলু চোখে গজল শোনা শেষ। অরিত্র অফিসে। পুপু কলেজে। রোজকার মতো। ঠিক রোজকার মতো। তিনমাস আগেকার মতো। বাড়ি ছন্দে ফিরে এসেছে। তাল কেটে গিয়েছিল, এখন আবার বিলম্বিত একতাল। কী শান্তি ! নীলম ব্লাউস কাটছে। টেবিলের ওপর কাঁচি, ফিতে, দর্জির চক খড়ি। ঘোর চকোলেট রং-এর ব্লাউস। পিঠে, হাতায় স্ক্যালপ থাকবে। ইস্ত্রিটা ঈষৎ গরম, সামনে প্রস্তুত। না হলে স্ক্যালপ ভালো হবে না। ফোন বাজছে।

'থানে থেকে করছি। হঠাৎ টেলিগ্রামে তলব কেন ?'

নীলম সাবধানে বলল—'এমনি, দুটো দিন কাটিয়ে যাও না।'

'কোথায় ? তোমাদের বাড়িতে ?

'আমাদের কুঁড়েঘরে আর জায়গা কোথায় ? আহা, নিজের আস্তানা যেন নেই।'

'কুঁড়েঘরে তো থাকতে না ভাবী। কোনকাল থেকে বলছি, 'সুপার সীল'-এর হাতে ছেড়ে দাও। রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ছেড়ে দেবো। পেয়েবল হোয়েনেবল। পে করারই দরকার হত না। চৌধুরী সাবের ইগো-স্যাটিসফ্যাকশনের জন্যেই···।'

'তুমি আমাদের নিজের খরচায় রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেবে, তারপর ইনকাম ট্যাক্স ধরলে কি বলবো ?'

'আরে ভাবী ! চৌধুরী সাব একটা অতবড় মালটিন্যাশন্যালের পি আর ও। তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কত বাড়ি জমি-জমা সম্পত্তি থাকতে পারে। সেসবের খোঁজ কি তুমি রাখো ? ওসব পেটি ব্যাপার সীলের হাতে ছেড়ে দেবে। তা কি ব্যাপার বলো !'

'এমনি ইচ্ছে হতে নেই ? অরি সেরে উঠল একটা অতবড় অ্যাকসিডেন্ট থেকে। সেলিব্রেট করাও তো দরকার !'

'অরি চৌধুরী সেরে উঠলে সেলিব্রেট করতে আমাকে ডাকছে নাকি আজকাল ! নিউজ অফ দি ইয়ার !'

'এসো না প্লীজ। ভাবছি কটা দিন ছুটি নিয়ে সবাই মহাবলেশ্বর কি মাথেরন ঘুরে আসব। কিংবা গোয়া।'

'মাথেরন যেতে হলে, তোমারাই এখানে চলে এস। আর মাথেরন, গোয়া, মহাবলেশ্বর, মুডের মিল পাচ্ছি না তো ম্যাডাম। দুটো পাহাড় আর একটা সমুদ্র, একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা চলছে মনে হচ্ছে যেন।'

'হোক গে মনে, যা মন চাইবে, তাই করব।'

'আপাতত কি মন আমাকে চাইছে?' গলার স্বর গাঢ়।

নীলম বলল—'তাই তো তাই। তোমার সঙ্গে তো আর কথায় পারব না।' বিক্রমের পেছনে নীলম, হু-হু হাওয়ায় শূন্যে উড়ছে স্কুটার। বাজার তো প্রতিদিন আছেই ভাবী। চলো আমরা আনন্দ বাজার করি আজ।

'বিশে মার্চের ডেট লাইন কেন?'

'বহুদিন বাদে আমাদের এক পুরনো বান্ধবী আসছে, অনেকদিন পর। সকলে মিলে খুব হই-চই করা যাবে।'

'বান্ধবী কি সখী আঁধারে একেলা ঘরে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। চলে এসো সীমাকে নিয়ে।'

'আমি সীমাকে নিয়ে গেলে তোমাদের 'একাকিনী'র জুড়ি মিলবে কি করে?'

'মিলবে। মিলবে। ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। খালি এসে আমাকে'—নীলমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—'বাঁচাও', সাধু করে বলল—'উদ্ধার করো।'

'দেখা যাক, আসতে পারি কি না।'

'আহা ভারি তো ব্যবসা। যে কোনও ডামির হাতে কদিনের জন্যে তাস ফেলে এলে আর ক কৌটো ব্ল্যাক মানি কম হবে?'

'খবর্দার ভাবী, ব্ল্যাক মানি তুলে খোঁটা দিলে যাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুষারশুভ্র তোমার টাকা। হলো তো? রাখছি এখন।'

'আহা। আহা। আর একটু কথা বললে কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে? গলাটা যে তেমনি আছে। তেমনি পাখির শিসের মতো। শুনি একটু। আহ্ রোমাঞ্চ হচ্ছে।'

নীলম ফোনটা রেখে দিল। কপালে ঘাম ফুটছে। গলাটা যে তেমনি আছে। বিক্রম সুদ্ধু তাহলে জানিয়ে দিচ্ছে আজ নীলমকে ঘিরে কত পরিবর্তন। গলাটাই শুধু তেমনি আছে। পুরনো নীলম নেই। কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে। তা-ই যদি না থাকবে, তাহলে বিক্রমের ফোন ধরতে অত কেন হাত কাঁপছিল? ভয়ে? গোপনে কিছু করবার ভয়ে? এখনও? না রোমাঞ্চে? বিক্রমের কণ্ঠ শুনলে, বিক্রমকে মানসচোখে দেখলেই স্মৃতিতে দুধ উথলোয়।

ভীষণ, প্রবল, শক্তিমান, আকাঙ্ক্ষাময় এক পুরুষ, দৃঢ়, মাংসল ঠোঁট, ভীষণ রকমের বাঙ্ময়, তার গানও গান নয়, সে-ও এক মাংসল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

"লুৎফ্ উসকে বদনকা কুছ নহ্ পুছো,
কেয়া জানীয়ে, জান হ্যায়, কেহ, তন হ্যায়"—ওই তনুর স্পর্শে কী যে বর্ণনাতীত সুখ: সেকি প্রাণের? সে কি দেহের?

একটা মেয়ের মধ্যে কতগুলো মেয়ে বাস করে? ম্যাজিশিয়ানের টুপির মধ্যে থেকে খরগোশের মতো, কিংবা হাতের ফাঁক থেকে সাদা সাদা লক্কা পায়রার মতো ভিন্ন ভিন্ন ইঙ্গিতে তাদের আবির্ভাব! অরিত্র সকালে বিকেলে এক নীলমকে পায়। বিক্রমের ফোনে যে সাড়া দেয় সে সর্বৈব ভিন্ন নীলম। পুপু কাকে মা ডাকে? এযার আসার সম্ভাবনায় কোন নীলম বেরিয়ে এসেছে? মহানামই বা সেদিন মাঝরাত্তিরে কোন নীলমকে ডাক দিয়ে গেলেন? এছাড়াও আছে বিজয়া-সম্মিলনী কমিটির প্রেসিডেন্ট নীলম যোশী চৌধুরী। মণ্ডল, শা, বিজয়স্বামী আয়েঙ্গার, নন্দন খাদেলকরদের নীলম ভাবী। নীলম হঠাৎ উঠে আয়নার সামনে চলে গেল। এই বাড়িতে ফার্নিচার সবই মালটি-পারপাস, ড্রেসিং টেবল বলতে কিছু নেই। অরির শোবার ঘরে একটা লম্বা আয়না আছে। পুপুর ঘরে গোল আয়না। পাশের টেবিলের ড্রয়ারে কিছু নিত্যব্যবহার্য প্রসাধন দ্রব্য থাকে। বাকি সব পুপুর খাটবাক্সে। আয়নাটাই এ বাড়িতে একমাত্র জিনিস যেটা নীলম খুব যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করে না। এই লম্বা আয়নাটা। একটা লেসের ঢাকনা দিয়ে ঢাকাও থাকে। মহানামই বলতেন—অবিকল জেন মরিস। এরকম মিল আমি আর দেখিনি। জেন মরিস ছিলেন দান্তে গেব্রিয়েলের বন্ধুপত্নী এবং তাঁর স্ত্রীর মতোই তাঁর অনেক ছবির মডেল। মিসেস রসেটি কি সুন্দর অল্প বয়সেই মারা যান, নীলমও কেন অল্প বয়সে মারা গেল না! অল্প বয়সে মারা গেলে সে মেয়ে চিরকাল রোমাঞ্চ, ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষার পাত্রী হয়ে থাকে। তার খুব আশা ছিল অপারেশন টেবিলেই সে শেষ হয়ে যাবে। শরীরে রক্ত ছিল না। রক্তও খুব বিরল গ্রুপের, বোতল বোতল লেগেছিল। দুটো টেবিল বোঝাই হয়ে গেছিল রক্তের আর স্যালাইনের খালি বোতলে। অর্ধচেতনার মধ্যে খালি ভেসে থাকত পুপুর মুখটা। পুপুর তাহলে কি হবে, প্রত্যেক মায়ের ইচ্ছামৃত্যুর সামনে কি এই একটা পুতুলের বাধা থাকবেই? পুপু! পুপে! তুই কেন এলি? তুই কার? তুই কি আমার অপরাধ? অথচ তুই-ই যেন আমার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা। কে বলেছে ক্ষমা নেই। সেই যে অরিত্র পড়ে শোনাত কে এক কবি বলছেন—'অথচ ক্ষমাই আছে। ক্ষমাই আছে। কোনখানে তার কোনও খেদ

জমা নেই।' পুপুকে বুকে করে তেমন দীনভাবে ক্ষমা চাইতে পারলে কি বিধাতাপুরুষ ক্ষমা করবেন না ? মানুষ ফিরিয়ে দেয়, 'ক্ষমিতে পারিলাম না' বলে আক্ষেপ করে, ঈশ্বর ক্ষমা করেন। হে পিতা, ইহারা জানে না কি করিতেছে, ইহাদের ক্ষমা করো। না, না। নীলম নিজে নিজেই হঠাৎ চমকে উঠল। মানুষই ক্ষমা করে বরং। ঈশ্বর করেন না। যে যৌবন নিয়ে অমন খেলা খেলেছিল, সে যৌবন তো মানুষ কাড়েনি। কেড়ে নিয়েছেন তিনিই। মানুষকে কতকগুলো অমূল্য সম্পদ দিয়ে তিনি পাঠান। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, বুদ্ধি, প্রতিভা। পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দীর্ঘ প্রবাসে চলে যান। পরিচালনা করবার জন্য, পরামর্শ দেবার জন্য বসে থাকেন না। একদিন হঠাৎ এসে শুধু হিসেবটা বুঝে নেবেন। নীলম যোশী, তোমার সম্পদ নিয়ে তুমি কি করেছ ? নীলম কি তার কুঞ্চিত কেশকলাপ যাতে প্রকৃতি ভেতরে ভেতরে গুঁড়ি গুঁড়ি পাউডার মাখাচ্ছে। এই গুলবাহার ত্বক যা প্রতিমুহূর্তে অতিপ্রসারে ফেটে যাবে বলে মনে হয়, এই চল্লিশ আটত্রিশ আটচল্লিশ ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স্ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে ? বলতে পারবে ?—হে প্রভু, দেখো তোমার দেওয়া সম্পদ নিয়ে আমি এই করেছি। না না। তার চেয়ে ভালো নিজেকে পেছনে রেখে পুপুকে এগিয়ে দেওয়া। যশোধরা যেমন রাহুলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ, বিশালচক্ষু, **নতনাসিক,** জিজ্ঞাসু অথচ স্থির ওই নচিকেতাস্বভাব মেয়ে। ওকে এগিয়ে দিয়ে নীলম বলবে—এই যে এই করেছি।—আপনি যা দিয়ে ছিলেন বিধাতা। দেখুন তো, তা বহুগুণে বেড়েছে কি না ? তখন যদি পুপু তার সার্ত্র, ইয়েট্স, উপনিষদসংগ্রহ, গোরা এবং রিলিজন অফ ম্যান নিয়ে দাঁড়ায়, হাতে লম্বা টি-স্কেল, বিধাতাপুরুষ কি জিজ্ঞাসা করবেন না—কই নীলম, তোমাকে যা দিয়েছিলুম তা তো সুদসুদ্ধ বাড়েনি, তুমি তো অন্যের সম্পদবৃদ্ধির হিসেব আমাকে দিতে এসেছ ! **বিশ্বসুদ্ধ** লোক বলে—**পুপ** তার বাবা-মার কিচ্ছু পায়নি। ওর বাবার মনোহারী চঞ্চলতা, ওর মায়ের ভুবনশ্রী রূপ, কিচ্ছু না। ও অন্যরকম। খালি দশ মাস গর্ভে ধারণ করার যন্ত্রণা, জন্ম দেওয়ার কষ্টটুকু নীলমের পরিপূর্ণ জানা।

ড্রয়ার খুলে নীলম চিরুনি, ব্রাশ বার করল। চুল আঁচড়াচ্ছে। জট ছাড়িয়ে এবার ব্রাশ করছে। যতই ব্রাশ করছে ততই ফুলে উঠছে, ফুলে **ফুলে উঠছে** অবিকল জোয়ারের নদীর মতো। ছড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝি মহাকালীর কেশরাশি। একেবারে বেলুনের ওপরকার মতো টানটান, তেলতেল চামড়া। কোনও পাউডার, কোনও মেক-আপ লাগে না, সব ঝরে ঝরে পড়ে যায়। তৈলাক্ত সেই গোলাপী মুখের স্থূল কিন্তু ঢেউতোলা ওষ্ঠাধরে গাঢ় করে লিপস্টিক মাখছে

নীলম। খুব যত্নে। এমন টকটকে লাল যে তার পেছনে দাঁতগুলো যেন তাদের শুভ্রতার মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। আই লাইনার, ম্যাসকারা, আই শ্যাডো গোল্ডেন গ্রে। হাউসকোট ছেড়ে নীলম ঘোর লাল রঙের ঢাকাই যা বিক্রম বাংলাদেশ থেকে ১৫২৬৲ দাম দিয়ে কিনে এনে দিয়েছিল দশ বছর আগে সেই শাড়ি পরল। বিক্রম বলত খুনখারাপি রং ভাবী, সব লাল হো যায়গা। কোমরে রুপোর চাবি, হাতময় সরু সরু সোনার চুড়ি, গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে মোহরের হার, কণ্ঠে চিকচিকে কণ্ঠী, কানে পেখম ধরা ময়ূর। অরিত্র চৌধুরীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অনেকটাই এখন নীলমের হাতে গলায়। আয়নাটা খবরের কাগজের টুকরো ভিজিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করল নীলম। একি ! এ কে ! দেবীরা তো মানুষের আয়তন হন না ! সাধারণ মানবীর চেয়ে অনেক বড় হয় দেবীপ্রতিমা। দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী। কে কবে বলেছে সৌন্দর্যের মাপকাঠি এই ওই। নীলম যোশী চৌধুরী তুই দুঃখ করিস না। মেনে নিবি না কখনো কারো সিদ্ধান্ত। নিজে পরীক্ষা করে দেখ। এখনও ইচ্ছে করলে তুই বিশ্ব জয় করতে পারিস। অরিত্র জয় করতে পারিস, মহানাম জয় করতে পারিস, বিক্রম জয় তো একেবারেই হাতের পাঁচ।

কোন জয়টা যে আশু প্রয়োজন,**কোনটা** যে অত্যন্ত জরুরি অনেক ভেবেও নীলম ঠিক করতে পারল না। এক বিভোর দিবাস্বপ্নে তার সারা দুপুর বেহুঁশ হয়ে কেটে গেল। কখনও সে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ দেখে ঠোঁটের ওপর বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে, কখনও ট্রয়ের প্রাসাদের ওপর থেকে আকিল্লীসের শৌর্য দেখে, হেক্টরের শৌর্য দেখে, আর ভাবে এ সবই আমার জন্য। আবার কখনও কুরু-পাণ্ডব সেনার মাঝখান দিয়ে গরবিণী হেঁটে যায়। কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে কে যে অরিত্র আর কে যে মহানাম সে স্থির করতে পারে না কিছুতেই। খালি কানে জয়ধ্বনি ভেসে আসে দূর দূরান্তর থেকে। কিংবা বহু পুরুষের কান্না তাকে চেয়ে। গর্জন কিম্বা কান্না দুটোই তার দিবাস্বপ্ন তৈরি করে, অথচ তার মন দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করে। কিছুতেই যেন সে তার বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি পুরুষমানসে তৈরি করতে পারছে না, পারছে না। না পেরে ক্লান্ত হয়ে সে শুয়ে পড়ে, ভাবে ক্লিওপেট্রার সেই ক্ষুদ্রকায় **বিষধরকেই** সে অবশেষে বরণ করবে কি না।

বিকেলের সামান্য পরে গোধূলি লগ্নে, বাড়ি ফিরে তাকে এইভাবেই ঘুমন্ত দেখল অরিত্র। বাইরের দরজা খোলা। ভেজানো ছিল। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। অবাক হয়ে অরি ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে ছিল খানিকটা। নীলম কি

দরজা খুলে রেখে পেছনের দিকে গেছে কোনও কাজে ! যত অল্প সময়ের জন্যই হোক এরকম করা ঠিক নয়। অরি না হয়ে অন্য কেউও তো এ সময়ে ঢুকে পড়তে পারত। শম্ভাজী রাতে ডিউটি দেয়। আর একটু পর থেকে শুরু হবে তার পাহারার ঘণ্টা। এখন বাইরের গেট অরক্ষিত। খানিকটা অপেক্ষা করে অবশেষে দরজা বন্ধ করে দিল অরি। জুতো খুলল রয়ে বসে, তারপর অনেক দিনের অনভ্যাসের টনটনে পা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এইভাবে নীলম সেজেগুজে শোয়া ! চুল ছড়িয়ে রয়েছে বালিশে। পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। এয়োতি নারী যেঁন সেজেগুজে চলে যাচ্ছে। চিতায় ওঠবার আগে এই ! ইচ্ছামৃত্যু। নীলমের মনে এই ছিল ? অরিত্রর গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না ! ডাক্তারকে ডাকবে বলে ফোন তুলল। রেখে দিল। বিশুষ্ক গলা। তারপর প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে হাত রাখল নীলমের কপালে। জীবন্ত কপাল, উষ্ণ, মধুর, মমতাময়, মৃত্যুর সুদূরতা, মৃত্যুর বৈরাগ্য তো নেই ! 'নীলম ! নীলম !'

ভীষণ চমকে দুহাতে চোখ কচলে উঠে বসল নীলম। অরিত্রকে সামনে দেখে অবাক হয়ে বলল—'তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে ?'

অরিত্র বলল—'বা রে, আমিই তো তোমাকে ওই প্রশ্ন করব। কি ব্যাপার ? এভাবে শুয়ে ?'

নীলম অবাক বিহ্বল চোখে নিজের শাড়ি দেখল, চুড়ি দেখল, চোখের কাজল সামান্য ধেবড়ে হাতে লেগেছে দেখল হাত ঘুরিয়ে, যেন সে স্বপ্নে সেজেছিল, বলল—'অরি, আমি সুখস্বপ্ন দেখছিলুম, যেন আমাদের হিন্দু ম্যারেজ হচ্ছে, আগুন জ্বেলে, সপ্তপদীর আলপনা এঁকে, তুমি বরবেশে এসেছ। কলকাদার জোড়, নকশি শাল, কপালে চন্দন।'

রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল ওদের। অনুষ্ঠান-অলঙ্কারপ্রিয় কল্পনাপ্রবণ নীলম যোশীর সারা জীবনের দুঃখ যে এটা।

অরিত্র তাই মমতাস্নিগ্ধ গলায় বলল—'নীলম, তোমাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ঠিক বিয়ের কনেরই মতো। বাস্তবিক। দাও আমাকে চা-টা দাও।'

নীলম ঠিক তেমনভাবে বসে রইল, যেমন ভাবে বসেছিল। ঘুমভাঙা চোখে। সাজসজ্জার ছটা নিয়ে। আয়নায় পার্শ্বমুখের ছায়া পড়েছে। খাজুরাহোর কোনও কিন্নরী মূর্তি। ভারতবর্ষে এক মহেঞ্জোদড়োর যুগেই তন্বীতা নারীশরীরের গুণ বলে বিবেচিত হত। ব্রোঞ্জের নটীমূর্তিটিকে যদি প্রামাণ্য বলে ধরা হয়। তারপর

তো সবই শ্রোণিভারাদলসগমনা, পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা। রূপসীর আদর্শ তো এদেশে একটু পৃথুলাই। নীলম দেখতে দেখতে সমস্ত ভুলে যাচ্ছে। এতদিনের যত দুঃখ, যত ভয়, যত পাপবোধ। পশ্চিমের জানলা দিয়ে হু হু করে গোধূলি ঢুকছে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সামনে বসা অরির চোখের চশমায় তার ছায়া পড়েছে দেখতে পেল নীলম। অরি কেমন করে গোধূলি লগ্নের আহ্বান শুনতে পারে ! তারা মেঘে ঢেকেছে, অরির চশমা পাল্টে গেছে, খুবই সহজে তাই বিদায় জানায়। জনমের মতো হায়, হয়ে গেল হারা। ডাক শুনতে ভুলে গেছে অরিত্র চৌধুরী। এই সমস্ত বাসকসজ্জা একটা মায়া, একটা করুণা, গোধূলি ভর্তি ঘর ছেড়ে অরিত্র বাইরে চলে যাচ্ছে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

'নীলম, চা দাও, চা আনো, পটভর্তি করে আনো, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, ভীষণ।'

ভয়মুক্তির সোয়াস্তিতে শুকিয়ে যাওয়া গলায় পানীয় ঢালতে অরিত্র নীলমকে ভীষণ তাড়া দিতে থাকে। নীলম বুঝতে পারে ট্রয়ের প্রাসাদে হেলেনের স্বেচ্ছাবিহার মেনে নিয়ে বিপুলসংখ্যায় ফিরে যাচ্ছে গ্রীক সেনা। ফিরে যাচ্ছে আগামেমনন, ফিরে যাচ্ছে ইউলিসিস, মেনেলাউস। এলফিনস্টোন রোড দিয়ে হোলকার ব্রিজ পেরিয়ে ডেকান কলেজ পেরিয়ে আহ্‌মদনগর রোড ধরবে, চলে যাবে আহ্‌মদনগর কিংবা লোহাগাঁওয়ের দিকে।

॥ ৭ ॥

বইয়ের বন্ধন থেকে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের বন্ধন থেকে এখন বেশ কিছুদিনের জন্য একেবারে ছুটি ! অভ্যাসের বাইরের অডিওভিশুয়াল এখন অন্তত কিছুদিন। ট্রেন ঝপাং করে রাত্রের নিস্তব্ধতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চোখের ওপরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মাঝের বাঙ্কে ঢুকে পড়ল এষা। কোমর অবধি পাতলা চাদর। পায়ের কাছে জানলার ফোকর দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। পায়ের পাতা শিরশির করছে। কেমন একটা পুলক ছড়িয়ে যাচ্ছে। গায়ের চামড়া থেকে শিরশিরানিটা উঠছে পাতলা ছাপা শাড়ির কিনার বেয়ে সব পোশাকে পরিচ্ছদে, বাকি শরীরে। রক্তে সুদ্ধু। ভারি আরাম ! আহ।

প্রথম দিনের দুপুরবেলাটা খুব অসুবিধে হয়নি। রোদ চশমা পরে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। সীটের গায়ে

হেলান দিয়ে মুখে লিটল ম্যাগাজিন চাপা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া গেছে। সন্ধে হতে থাকলেই, আলো জ্বালবার সময় হলে, ট্রেনময় গুনগুন আরম্ভ হয়, কুড়মুড় করে বাদামভাজা, ছোলাভাজা, ডালমুট, চানাচুর চিবোচ্ছে, এদিকে ওদিকে একটা বাচ্চা এতক্ষণ খেলে বেড়াচ্ছিল বেশ, এযার কাছ থেকেও বার দুই ঘুরে গেছে। এখন হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করছে—'গোটা করে দাও।' তার ললিপপ তার ছেলেমানুষ-মা লোভ সামলাতে না পেরে একটু চেটে চুটে দিয়েছে। ব্যাস। আর যায় কোথায়। তার লবঞ্চুস ভাঙা হয়ে গেছে। তাকে গোটা করে দিতে হবে। অপ্রস্তুত মা অন্য ললিপপ দিচ্ছে, লাল নীল সবুজ কতরকম রঙ। ভবি কিন্তু ভোলবার নয়। তার ওই বিবর্ণ হলুদ চাটা ললিপপটাই চাই। এবং গোটা অবস্থায়। মির‍্যাকল-সাধনে অক্ষম মা বাবার অনুনয় ক্রমশ বিরক্ত বকুনিতে পরিণত হচ্ছে। চাপা গলায় চেঁচাচ্ছে বাবা। ট্রেনের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিভিন্ন দল গল্প করছে চারদিকে, এক ভদ্রলোকের ভারী গলা মাঝে মাঝে অন্যগুলোকে ছাপিয়ে উঠছে। 'আগে গীতাঞ্জলিতে বরাবর ঠাণ্ডাজল সাপ্লাই দিত।'

হাইতোলা সন্ধের আলস্য সর্বাঙ্গে চাদরের মতো জড়িয়ে চতুর্দিকের গুঞ্জনের মধ্যে লুপ্ত হয়ে বসে থাকা। কোলে পত্রিকা খোলা, এত কম আলো, পড়তে গেলে চোখে লাগে, ছবিগুলোই দেখা হচ্ছে শুধু। সামনের ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন—'কিধর যানা হ্যায় আপকা?'

—'কল্যাণ।'

—'বাস? কলিয়ান তক?'

বেশি কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। ভদ্রমহিলা বেশ জমজমাট। প্রত্যেকটা জংশনে তাঁর সঙ্গে কেউ-না কেউ দেখা করতে আসে। হাতে টিফিনবাক্স। কোনটাতে নাস্তা, কোনটাতে খানা। এযার দেওয়া কড়া-পাকের সন্দেশ নিয়েছিলেন দুপুরে। উনি পুরি ভাজি আচার এযাকে ভাগ করে দিতে চাইলেন। এযা আটার এইসব পুরি খেতে পারে না, যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত করে পিকুর পলিথিন মোড়কে দেওয়া পাতলা সাদা রুটি আলুচচ্চড়ির সঙ্গে খেল। এসব ব্যাপারে পিকুর তুলনা হয় না। বন্ধু কি মা বোঝা দায়। দ্বিতীয় দিনের জন্যেও সরু চিঁড়ে, মিষ্টি, কাটা লেবু, বিচি ছাড়িয়ে দিয়ে দিয়েছে। সারা সন্ধে এযা আড়চোখে সহযাত্রীদের দিকে তাকাচ্ছে। কখন ঘুমোয় এরা কে জানে। রাত বারোটা অবধি হয়ত আড্ডা দেয়, টিভি দেখে, অনেকের অভ্যেস হয়ত মাঝরাতের পর খাওয়া। অবশেষে মাঝের ভদ্রলোক উঠে পড়তেই, ওপাশের

ভদ্রলোকও বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। এযা উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে আড়মোড়া ভাঙল। আহ, রাতের মতো আরাম। ঘুম যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান, করুণাময় আর কেউ থাকতে পারে না। শুয়ে শুয়ে পায়ের দিকে দেখা যায় খোলা মাঠে অগণিত তারার আকাশ, তলায় ছোট্ট ছোট্ট বাক্সভর্তি ফোঁটা ফোঁটা মানুষ কণা। তারারা অত উজ্জ্বল, কিন্তু কোথাও যায় না, বিধিনির্দিষ্ট চক্রপথে ঘুরে ঘুরে মরে, কণা কণা মানুষ অথচ প্রবল প্রাণচাঞ্চল্যে ঘুরে বেড়ায়। নিজের ইচ্ছেমেতো। আমি সেই মানুষ। কখনও থেমে থাকব না। এমনি করে চলতে চলতে শেষ হবো। মৃত্যু কি আকাশের মতো? ওইরকম একরঙা? গম্ভীর? যাকে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার বলে আত্মতুষ্ট থাকছি তাও আবার বিধিনির্দিষ্ট নয় তো? পৃথিবীর চক্রাবর্তনগুলোও তো সাদা চোখে দেখা যায় না!

গাড়ি ছুটছে আজ তপ্ত খোলার মতো মাঠ ঘাটের মধ্য দিয়ে। জানলা কষে বন্ধ। প্রথমে কাচ বন্ধ হয়েছিল শুধু। তারপর খড়খড়ি। বাইরে লু বইছে। কামরায় গাড়ি ভরা অন্ধকারের মধ্যে মানুষগুলোর কুকুরের মতো জিভ বার করে হাঁপানোর অবস্থা। সামনে বসা অল্পবয়সী আগরওয়াল ছেলেটি দিল্লিবোর্ডের পরীক্ষা দিয়ে বম্বে যাচ্ছে মামার বাড়ি। রুমাল ভিজিয়ে মুখে চাপা দিয়েছে। ভিজে রুমালের ফাঁক দিয়ে এযার দিকে তাকিয়ে হাসল। অর্থাৎ তুমিও এমন করো, আরাম পাবে। ছোট-বড় কারো কাছ থেকেই কিছু শিখতে আপত্তি নেই। এযা ব্যাগ থেকে পুঁচকে তোয়ালে বার করল, ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে নিয়ে মুখে চাপা দিয়ে হাসছে ও-ও। দ্যাখো, কেমন গুরুমারা বিদ্যে। তুমি রুমাল, তো আমি তোয়ালে, চট করে শুকোবে না।

কোল্ড ড্রিঙ্কস ছাড়া কিছু খাচ্ছে না ছেলেটা। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়া ভেজিটেরিয়ান মীল একটা নিয়েছিল এযা। কিছু খেতে পারল না। পোলাওয়ে, ডালে, আলুর তরকারিতে, আচারে সবটাই একতাল পিণ্ড হয়ে আছে যেন। আগরওয়ালের মতো ঠাণ্ডা আর ফল খেয়ে কাটালেই ভালো ছিল। খাবার ছিলও সঙ্গে। পিকু বলেছিল—'সরু পাটনাই চিঁড়ে, একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে লেবু চিনি দিয়ে খেয়ে নিবি। পেট ঠাণ্ডা থাকবে।' বলেছিল, বলেছিল। খাওয়ার জন্য ছুটন্ত ট্রেনে অত কসরৎ করতে ইচ্ছে করে না এযার। এখন ট্রেনের দেওয়া গরম পিণ্ড হাতে বোকার মতো নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হচ্ছে পিকুটার অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক জ্ঞান দুটোই বেশি। কাজে লাগালে মন্দ হত না। দু বন্ধুতে যখন একত্রে শহরতলিতে বাড়ি করার কথা চিন্তা করছিল তখন পিকু হেসে

বলেছিল—'আমি তোর ঘর সামলাবো, তুই আমার বাইরেটা সামলে দিস। কিন্তু যদি বিয়ে করিস ?'

এষা গম্ভীর হয়ে বলেছিল—'ওয়ান্স ইজ এনাফ। কিন্তু তুইও তো সেটা করতে পারিস।'

পিকু আর এক কাঠি বাড়া, গম্ভীর হয়ে বলেছিল—'ওয়ান্স ইজ এনাফ।'

দুজনেই হেসে ফেলেছিল। এষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পিকু বলেছিল

—'তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে

তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি।'

গাড়ি নাগপুরে পৌঁছলে বড় বড় কমলালেবু সস্তায় কিনে ফেলল আগরওয়াল। এতক্ষণের বাকহীনতা ত্যাগ করে বলল—'কমলা বহোত আচ্ছা হ্যায় জিজি, টেস্ট করকে দেখিয়ে না।' এষাকে কিনিয়ে দিল এক ডজন। নাগপুরী লেবু খেতে খেতে চল্লো দুজন। কোথায় লাগে দার্জিলিঙের কমলা। অথচ কলকাতায় ধারণা নাগপুরী লেবু জাতে নিকৃষ্ট। অর্থাৎ নাগপুরীরা নিজেদের জন্য ভালো জিনিসটা রেখে দেয়, নিচুমানের জিনিসটা বাইরে পাঠায়। পশ্চিমমঙ্গে আমরা ঠিক উল্টো করি, সুন্দরবনের চিংড়িমাছ, মধু, হুগলি, বর্ধমানের ভালো চাল, দার্জিলিং-এর শ্রেষ্ঠ চা সব বিদেশী মুদ্রার লোভে বিক্রি হয়ে যায়। নিজেদের খাবার জন্যে নিকৃষ্টতম, অনেকসময়ে অখাদ্য জিনিস রেখে দিই আমরা। নিজেদের অপমান করতে আমাদের জুড়ি নেই।

ওয়ার্ধা পেরোতে না পেরোতেই দুধারে চষা, কাজলা মাটি। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়। বড় বড় কালো পাথরের চাঁই বিশুষ্ক নদীখাতে সাজিয়ে রেখেছে সহ্যাদ্রি। এষা অবাক হয়ে দেখে অবিকল এক পাল ছোট বড় হাতি জলকেলি করে উঠে আসছে। কি অদ্ভুত খেয়াল প্রকৃতির ! কোনও জাতকের কাহিনী যেন ভাস্কর্যে খাড়া করে রেখেছে পথের ধারে। ছদ্দন্ত জাতকে বোধিসত্ত্ব ষড়দন্ত হস্তীরাজ হয়ে জন্মেছিলেন। ওই তো সেই মহিমময় গজরাজ। পাশে পিকু নেই। আনন্দ আর বিস্ময়ের ভাগ কাউকে না দিতে পারলে তৃপ্তি হয় না। জানলা দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় ফিরে ফিরে তবু দৃশ্যটা দেখতেই থাকে এষা। সুব্রত আগরওয়াল বুঝতে পেরেছে কিছু একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে, কিন্তু ও জানলার পাশে বসে নেই। এষার উল্টো দিকের সীটে জানলা থেকে সবচেয়ে দূরে বসে আছে, হাজার মুখ বাড়িয়েও ও কিছুই দেখতে পেলো না। খাতটা বেশ নিচে। শেষকালে থাকতে না পেরে বলেই ফেলল—'কুছ অজীব চীজ হ্যায় জিজি ?' এষা হেসে বলল—'অজীব কুছ নহী ভাইয়া, পাথর হ্যায়।'

—'বাস ?'

—'বাস।' ছদ্দন্ত জাতকের হস্তীযূথের গল্প, সহ্যাদ্রির বোল্ডারে তার ভাস্কর্যের গল্প ছুটন্ত ট্রেনে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আগরওয়াল ছেলেকে সে কি করে বলে !

ট্রেন একটার পর একটা টানেল পেরোচ্ছে। যেই অন্ধকারে প্রবেশ করছে অমনি অরির সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ানক মুহূর্তের কথা মনে করে অন্ধকারকেই বরণ করছে এষা। আলোয় বেরিয়ে এলেই আবার ভয় কেটে যাচ্ছে। কত রকমই তো দেখা হল জীবনে। ভয় কিসের ? কে যেন ট্রেনের ছন্দে বলতে থাকে অভী ভব, অভী ভব। অমনি এষা আপাদমস্তক শান্ত হয়ে যায়। আবার মনে হয় কেন তার করতে গেল অরিত্রকে ? জলগাঁও হয়ে বাসে গেলেই হত। কিংবা কোনও ট্রাভেল এজেন্টকে ধরলেও হত। ওরা এক এক দিনে এক এক জায়গা দেখায়। এরকম ভ্রমণে মন ভরে না কখনও না। এষা তাই নিশ্চিন্ততার আশ্বাস সত্ত্বেও ট্রাভেল এজেন্টদের এড়িয়ে যায়। অরিত্রকে কেন এজেন্ট করতে গেল ? চিঠির পর চিঠিতে অরিত্র শুধু লেখে—'এষা, বন্ধুত্ব বড় দামী। বন্ধুত্বই শেষ কথা। আমরা কি বন্ধু হতেও পারি না। নিছক বন্ধু। নিরবধি কাল, আর বিপুলা পৃথিবী, তুলনায় জীবন পরিধি জীবনকাল যে বড্ডই ছোট। বন্ধুতা প্রত্যাখ্যানের রুদ্রতা তোমাকে মানায় না।'

লেট যাচ্ছে ট্রেন। অত রাতে পৌঁছে কাউকে দেখতে না পেলে কি করবে ? সোজা বোম্বে চলে যাবে। অতিরিক্ত টাকা গুণাগার দিয়ে বেঙ্গল লজে একটা দুটো দিন কাটিয়ে তারপর ঠিক করা যাবে সব। নাঃ, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস পৌঁছতে আরও রাত হবে। দূর যা হয় হবে। ঝাঁকানি খেতে খেতে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হতে টয়লেটের দিকে চলল এষা। সুব্রত আগরওয়াল মুখ তুলে হাসল। মিসেস জৈন বিশাল শরীর সরিয়ে জায়গা করে দিলেন। মনমদ, নাসিক রোড, ইগৎপুরী···।

বহুক্ষণের প্রত্যাশিত ট্রেন কলিয়ান পৌঁছোচ্ছে। ঘস্ ঘস্ ঘস্ ট্রেনের শব্দ ক্রমশই মন্থর, ক্রমশই ভারী। ট্রেনের কামরার সঙ্গে এষার পা এঁটে যাচ্ছে। স্বপ্নে হাঁটার মতো এগিয়েও সে এগোতে পারছে না। হালকা সুটকেস হঠাৎ হাতে তুলে নিল সুব্রত পেছন থেকে এগিয়ে এসে। এষার কাঁধে শুধু ব্যাগ। কামরার দরজার ফ্রেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। জনবহুল প্ল্যাটফর্ম। লেটে পৌঁছেছে গীতাঞ্জলি, পুরো প্ল্যাটফর্ম ব্যস্ত, সচল, সরব হয়ে উঠেছে। কোথায় অরিত্র ? সে যদি খুব বদলে গিয়ে থাকে চিনবে কি করে তাকে ? আঠার বছরের

ব্যবধান। জীবন পাল্টে গেছে, মানুষের বহিরঙ্গ পাল্টে গেছে, পরিবেশ পাল্টে গেছে, কোন ভরসায় এমন অনির্দিষ্টের বুকে ঝাঁপ দেওয়া ? তেমন কিছু লম্বা নয় প্ল্যাটফর্ম। অপরিচিত আদলের মুখ, মুখভঙ্গি থেকে চেনা মুখ, চেনা ভঙ্গি খুঁজে বার করতে পারছে না এষা। মন্থর পায়ে সে শুধু হেঁটেই যাচ্ছে, হেঁটেই যাচ্ছে, হাতে ফাইবারের সুটকেস, কাঁধে ব্যাগ, এষা হাঁটছে।

দূর থেকে, বহু দূর থেকে কিন্তু দেখতে পেয়েছে অরিত্র। কামরার দরজায় যখন এষা দূরতম নক্ষত্রের কাছে একটি উজ্জ্বল হলুদ বিন্দু, তখন থেকেই। আশ্চর্য হয়ে, একেবারে স্তব্ধ স্থাণু হয়ে দেখছে অরিত্র। এষা আসছে, অথচ আঠার বছর পার হয়নি। ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে এষা যেখান থেকে বিদায় নিয়েছিল। কফি হাউসের ওপর তলার ডান উইঙের সেই কোণ। ঠিক সেইখান থেকেই এগোচ্ছে এষা। কাঁধ ছাড়িয়ে বিষণ্ণ চুল। অন্তরালে সূর্যঅলা পাতলা একটুকরো সজল নীলচে মেঘ। চলার ছন্দে অরিত্রর সমস্ত ধ্যানের ভুবন টালমাটাল দুলছে।

তুমি আসো যুগান্তর হতে নারীচেতনার মর্মমূল থেকে যাদুঘুম ভেঙে উঠে,
সময়ের অনীকিনী স্তব্ধ করে ইশারায় ঐশ্বরিক অধরসম্পুটে।
আসো পারমাণবিক ঝটিকার ভয়াবহ ভবিতব্যতায়
তুমুল বিদ্রোহে আসো কোটি কোটি ভাইরাসের সংক্রামের মতো, রক্তকণা,
অণুচক্রিকায়।

অনড় অচল অরিত্রর কাছাকাছি যখন এষা পৌঁছল তখন আবিষ্টের মতো, সম্মোহিতের মতো অরিত্র নাতি উচ্চকণ্ঠে এই-ই বলছিল। এই স্তাবকের পাশ দিয়ে রেলকর্মী, কুলী, যাত্রী আসছে, যাচ্ছে। কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। অরিত্ররও নেই। সম্মোহিত সেই স্তব শুনতে শুনতে জলভারাক্রান্ত মেঘ যেমন অগ্নিবর্ষী হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, এষার হৃদয়ের মধ্যেও তেমনি ছোট ছোট বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতে লাগল। চিৎকার করে সে বলতে চাইল—মিথ্যে কথা। আমি তো নয়। তুমি, তুমি, তুমিই এমনি করে আসতে, অনাকাঙ্ক্ষিত ভাইরাসের মতো, অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু অমোঘ। সংক্রামক। রক্তস্রোতে নেশা ধরিয়ে, তুমুল বিদ্রোহে। রুক্ষ চুল শত শঙ্খচূড় শাবকের মতো মাথায় ফণা তুলেছে, কপাল অদৃশ্য, ধারাল কুকরির মতো নাক, ফালা ফালা চোখ। কখনও মদির, মেদুর, বসন্তে, বিপ্লবে। চারমিনারের ধোঁয়ার মতো অনর্গল শব্দ স্রোত, সাইক্লোনিক ঝড়, পাহাড়ি নদীর ঢল, হাইওয়েতে ছুটে চলা দূরপাল্লা বাসের মতো ধাবমান, গর্জমান, কখনও টুপটাপ ধরে আসা বৃষ্টি, টুং টাং কোলভরা শিউলি, বকুল,

অশ্রান্ত, অভ্রান্ত, এবং আবারও, শতবার অমোঘ।

আপার সার্কুলার রোড ধরে চলতে চলতে গাড়িটা বিবেকানন্দ রোডে বাঁক নিয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ঢুকেছিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক বলে খেয়াল হয়নি, কিন্তু বাঁদিকে দাশগুপ্ত, ইনটারন্যাশন্যাল, আর চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, সারি সারি বইয়ের দোকান, ফুটপাথ, রেলিং ভর্তি ছাত্র-ছাত্রীর টাটকা আপাতত ক্লান্তিভরা মুখ, পোর্টফোলিও হাতে কালো-চশমা অবধারিত অধ্যাপক, গবেষক, এর পরেও কলেজ স্ট্রীট পাড়া চিনতে না পারলে··· ঠিক পাঁচ বছর। মাত্রই পাঁচ বছর পর স্বদেশ। অথচ সেই পাঁচ বছর একটা যুগ। কতকিছু সম্পূর্ণ ভোলবার কঠোর প্রতিজ্ঞার পাঁচ বছর। খুব দূর কোথাও থেকে নয় অবশ্য, মাত্রই পৃথিবীর টাঁকশাল মধ্যপ্রাচ্য থেকে। প্রতিবার দেশে ফেরার টাকাকড়ি, ছুটিছাটা সবই খুঁটিয়ে পাওয়া যায়। তাইতে গালফ কান্ট্রির যেখানে যেখানে ঢোকা যায়, তাছাড়াও ভারতকে সামান্য টপকে বর্মামুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান ঘুরে ঘুরে কাটে। দেশে ফেরবার নাম করে না। সে সব দিনে এষা যা বলবে, এষা যা করবে তাইই হবার কথা। স্বামী এষার থেকে দিনক্ষণ মিলিয়ে ঠিক সতের বছর তিনমাস সাড়ে পাঁচ দিনের বড়।

শফার গোবিন্দলালকে বলল—'একটু দাঁড়াও না গোবিন্দদা, একবার নামব।'

অন্য কোথাও গাড়ি রাখার অসুবিধে, ও কলুটোলায় ঢুকল। এষা পেছু ফিরে বইপাড়ার দিকে চলল। চারদিকে পুরনো বইয়ের ঝাঁঝ, নতুন বইয়ের বৃষ্টিভেজা মাটির মতো সোঁদা সোঁদা গন্ধ। স্টলে স্টলে মোটা মোটা নোট বই, কাগজ, ম্যাপ, ফুল, পাখি, যন্ত্রযান, মহামানব।

'কি চাই। দিদি কি চাই!'

'একবার বলেই দেখুন না, কি বই!'

অত্যুৎসাহী এক ছোকরা স্টলদার টুল এগিয়ে দিতে দিতে বলল—'ফিফ্‌থ্ পেপার ইংরেজির সমস্ত নোটস বেরিয়ে গেছে দিদি। কমপ্লিট ইন ওয়ান ভল্যুম।'

কেন যে ওরা এষাকে দেখে ইংরেজি ফিফ্‌থ্ পেপারের নোট্‌স্ কিনতে আসা ছাত্রী বা দিদিমণি মনে হল কে জানে। তখন তার সারা গায়ে বিদেশ-বিদেশ বিলাস-বিলাস গন্ধ। এ গন্ধ ছাত্রী বা অধ্যাপিকাদের গায়ে থাকে না। ত্বকের যা জেল্লা, তা-ও সদ্য বিদেশ ফেরৎদের অঙ্গেই মেলে। যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, দূষিত পানীয় জলের সঙ্গে বহুদিন

মোলাকাত করেনি, ভেজালহীন খাদ্য ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করবার দীর্ঘ সুযোগ পেয়েছে।

ছেলেটিকে নিরস্ত করে বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীটে ঢুকল সে। কেন কে জানে। একলা একলা তো কেউ কফি হাউসে যায় না। হাঁটবার উপযুক্ত রাস্তাও এটা নয়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের সামনে দিয়ে, মহাবোধি সোসাইটি ঘুরে, কলেজ স্কোয়্যারের ও প্রান্ত দিয়ে কলুটোলা ঢুকলেই হবে। কলেজ স্কোয়্যারটাকে মন্দিরের মতো প্রদক্ষিণ করা তো হবে। আলমা মেটারের অংশ তো বটে। হঠাৎ তার একদা প্রিয় পরিচ্ছন্ন বইয়ের দোকানের শো কেসের দিকে চোখের দৃষ্টি চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের মতো ছুটে গেল। পাতলা ডবল ডিমাই সাইজের একটা বই। ওপরে খুব দুর্বোধ্য নারী মুখ, পিকাসো আর যামিনী রায় পাঞ্চ করেছে। বইয়ের নাম 'প্রেষার জন্য', মন্ত্রচালিতের মতো দোকানটাতে ঢুকে পড়ল এষা। সাড়ে এগার টাকা খরচ করে বইটা কিনে ফেলল। বইয়ের জন্য বেশ খরচ করা হয়েছে, যদিও মাত্র দু ফর্মার বই। কাগজের মান খুব ভালো। কবিতার সঙ্গে শুধু সরু মোটা রেখায় আঁকা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে সব ছবি।

বইটা নিয়ে গাড়িতে ফিরে এলো এষা। দ্রুত। কেন যেন মনে হল এখানে ঘোরাফেরা করা আর একদম নিরাপদ নয়। এ এক জঙ্গল। আদিম, বন্য, শ্বাপদসঙ্কুল। যে কোনও সময়ে, যে কোনও জায়গা থেকে লাফিয়ে নামতে পারে রক্তলোলুপ, হিংস্র শ্বাপদ। প্রেষারা তাহলে এখনও বেঁচে আছে? বেঁচে থাকে? কিন্তু কোথায় যাবে? অনন্ত সময় কোনও অবিমিশ্র নিরালায় মেয়েদের একলা একলা বসে থাকার দিন কি এখনও কোনও দেশে এসেছে? একটু ভাবতে হল। অবশেষে গোবিন্দকে বলল—'একটু ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে যাবে?'

রিয়ার-ভিউ মিররে দেখল ওর ভুরু কুঁচকে গেছে।

'ভিক্টোরিয়ায়? একা, বউদি?'

'তুমি একটু কাছাকাছি থাকবে। বড্ড যেতে ইচ্ছে করছে।'

'দাদার সঙ্গে গেলে হত না?'

'তখন বিকেল ফুরিয়ে যাবে গোবিন্দ। একটু নিয়ে চলো প্লীজ।'

গোবিন্দ নির্ঘাত ভাবল তার দাদাবাবু ছিটেল মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু দেখা গেল গোবিন্দ ঠিকই বলেছিল। ভিক্টোরিয়ায় এষা বসতে পারল না। প্রথমত অসম্ভব ভিড় এবং নোংরা। দ্বিতীয়ত কৌতূহল। প্রায় প্রতিটি লোক একবার করে বই হাতে মহিলাটিকে নিরীক্ষণ করে যেতে লাগল। অনেকেই নানারকম মন্তব্য করছে। তার দু চারটে গোবিন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীর

গবেষণামূলক। বসে থাকা গেল না। গোবিন্দ খুব গম্ভীর মুখে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

এসেছে সে কথা জানান দিয়ে দুজোড়া ভ্রূকুটির দিকে পেছন ফিরে এষা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল। কোলে গভীর বারান্দা। চেয়ার টেনে সেইখানে বসল। বহুতলের দশতলায়। যেন আকাশে হেলান দিয়ে। এখন ছটার কাছাকাছি, তবু আলো আছে। সেই আলোয় নাম পড়ল ত্রিলোকেশ গৌরব। না ঠিকই ধরেছে। এ প্রেষা সেই প্রেষাই। উৎসর্গ পত্রে ধারাল তরোয়ালের খোঁচা—প্রেষার জন্য, 'প্রেষার জন্য, প্রেষার জন্য।' হঠাৎ এষার মনে হল তার বুকের ঠিক মধ্যিখানে ওই তরোয়ালটার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ঢুকে গেছে। তার সূচীমুখ একেবারে হৃৎপিণ্ডে আমূল বিদ্ধ। ঝকঝকে বাঁটটুকু শুধু উঠে আছে। ভলকে ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। এষার শরীরে তাহলে এতো রক্ত ছিল? এষার বুকে তাহলে এতো যন্ত্রণা ছিল? এখনও আছে? থাকে? কোলেস্টেরলের মতো রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে গরহজম আবেগের কুচি? উপুড় হয়ে সে পড়ে থাকে বহুক্ষণ, আস্তে আস্তে রক্তের নদী থেকে মুখ তোলে। তরোয়ালটার সোনালি হাতলে মুষ্টিবদ্ধ হাত, প্রাণপণে তুলে ফেলে একটা অতিকায় রাক্ষুসে কাঁটা ওপড়ানোর মতো করে,তারপর ক্লান্ত হাতে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দূরে। পড়ন্ত আলোর ধূলিকণার মতো অক্ষর ভাসে :

'তুমি আসো যুগান্তর হতে নারী চেতনার মর্মমূল থেকে যাদু ঘুম ভেঙে উঠে...' বিকেলের আলোয় ঝিম ধরেছে। এষার চারপাশে যেন উজ্জ্বল স্বচ্ছ স্ফটিকের আবরণ যা তাকে একই সঙ্গে পৃথিবী থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন করে রেখেছে। দেখতে পাচ্ছে সব। কিন্তু সবই জলের মধ্যে প্রতিবিম্বের মতো। যে কোনও মুহূর্তে লোষ্ট্রাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে যেতে পারে সব। সে যেন মহাকাশযাত্রীর ভ্যাকুয়াম স্যুটের মধ্যে প্রশে করছে। নির্ভার। ভাসমান। লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কে ভরা ভয়ঙ্কর আকাশ। অয়নমণ্ডল। সৌরলোক থেকে সারাক্ষণ অবাঞ্ছিত, বিপজ্জনক রশ্মিসমূহ এসে বিঁধছে, বিস্ফোরিত হচ্ছে। কিন্তু তবু রক্তে কিসের নেশা? তবু কেন এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বাতাবরণে রক্তে ঝিম ধরে!

স্পেস রকেটে যাই ফোকটে
ক্লোজড্ অর্বিটে একদম ফিট
হাই সেন্টার কই মনিটর

করো নেক্সট মুভ আরে বেওকুফ
খালি বক বক টক্কা টরে টক
টরে টক্কা টক বক বক বক
আ-র ল্যান্ডিং ট্রিলি লিংলিং
রিং ভেনাসের ? নাকি হাইতির
ডালাসের ? একি সাইকি ?

নিদারুণ ক্লান্তিতে বইটা বন্ধ করে দিল এষা। চেনা এই ইডিয়ম, এই মর্স কোড। এই অর্থবহ ফাজলামি, ফাজলামির তলায় বৈদ্যুতিক ইঙ্গিত এষার চেনা। এইসব বাকপ্রতিমা এখন তার হৃদয়ে বিবমিষা জাগায়। অনুষঙ্গে। অতীতেক্ষণে।

নিশ্বাস ফেলে অরিত্রর দিকে তাকাল এষা। সিংহের কেশরের মতো সেই অবিন্যস্ত চুল এখন শাসনে এসেছে। চুল পেকে যাবার আগে একটা বিবর্ণ মরচে রঙ ধরে, সেই রঙ এখন চুলে। উজ্জ্বল, ভাবালু চোখের মণি চশমার কাচের আড়ালে। ধারাল গালের কাঠামো স্ফীত হয়েছে। অরিত্র যেন আগের মতো লম্বা নেই। খাটো হয়ে গেছে। এষা হেসে বলল—'কাকে দেখছি ? কবি ত্রিলোকেশ গৌরব ? না এগজিকিউটিভ অরিত্র চৌধুরী ?'

অরিত্র কথা বলতে পারছে না। মনে মনে যা বলছে মুখে তা বলা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে শুধু বলল—' কবিরা কখনও পুরোপুরি মরে না। এষা,তুমি শেষ পর্যন্ত তাহলে এলে ? আমার কাছে ?'

এষা মুখ তুলে বলল—'এলাম। শুধু তোমার কাছে কেন ? নীলম কেমন আছে ? মেয়ে কত বড় ?' আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল এষা নীলম নামটা কত সহজে উচ্চারণ করতে পেরে গেল সে। আর পারবার পরই বুকটা কিরকম হালকা হয়ে গেল, চলার গতি বাড়িয়ে দিল এষা। বলল—' তোমাকে ছুট করিয়ে খুব কষ্ট দিলাম। ওকি ওরকম পা টেনে টেনে হাঁটছ কেন ?'

অরিত্র বলল—' একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। ঠিক হয়ে এসেছে। ও কিছু না।' বলল না, জীবন যেতে বসেছিল, যে জীবন নীলমের সে জীবন গেলে এষার কিছু আসত যেত কিনা কে জানে!

গতি কমিয়ে দিল এষা। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অরিত্র বলল—'আগের গাড়িটা আমরা মিস করলুম। বড্ড লেট করেছে আজ গীতাঞ্জলি। লাস্ট ট্রেন ধরতে হবে। মিডনাইটে পৌঁছবে। টিকিট কেটে আনি, তুমি দাঁড়াও।'

ভীষণ ভিড়। সিদ্ধেশ্বর এক্সপ্রেস উপছে পড়ছে। এইটেই আজ কোলাপুর যাবার শেষ ট্রেন। এষার জন্য কোনমতে জায়গা করে দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল অরিত্র। ট্রেন ছুটছে, এষা শুনতে পাচ্ছে অরিত্র সহযাত্রীর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে—'ওহ নো। শী ইজ নট মাই ওয়াইফ। বাট আ গ্রেট ফ্রেন্ড। আই কুড ইজিলি লে ডাউন মাই লাইফ ফর হার।...ইয়েস...দ্যাটস রাইট। উই আর মীটিং আফটার এইটিন ইয়ার্স। ক্যান য়ু ইম্যাজিন ইট ?' মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক আড়চোখে এষার দিকে তাকালেন। এষা ভাবল অরিত্র কি কিছু খেয়েছে ?

অন্ধকারে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠছে ট্রেন। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নির্মল হয়ে যাচ্ছে। ছুটন্ত পথের পাশে আলোর মালা ছুটে যাচ্ছে।

পাটিল অরিত্রর হাত থেকে সুটকেশটা নিল। চোখে প্রশ্ন। অরিত্র বলল—'গীতাঞ্জলি সাঙ্ঘাতিক লেট। বড্ড দেরি হয়ে গেল। তুমি বাড়ি যাও।' পাটিলের খুব ইচ্ছে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু সাবকে এভাবে একা দায়িত্বে দিয়ে মাঝরাত্তিরে চলে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। অরিত্র বলল—'চলো তোমায় নামিয়ে দোব।'

পুনে শহরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নীল-নীল রাত বেয়ে অরিত্রর গাড়ি চলে। ড্রাইভারের আসনে অনেক দিন পরে অরিত্র। তার মনে হচ্ছে গাড়ি নয়, সে নৌকার দাঁড় বাইছে। এই বেয়ে চলা যেন কখনো না ফুরোয়। কী অদ্ভুত মায়াময়, শিরশিরে, সুগন্ধ রাত। যেন মর্তলোকের নয়। স্বর্গেরও নয়। এ কোনও মধ্যভূমি। যেখানে কিন্নর অথবা যক্ষ অথবা, গন্ধর্বরা থাকে। বাতাসের সঙ্গে মিশে তারা আপন খেয়ালে ঘোরাফেরা করছে এই রহস্যময় মাঝরাতে। সহসা গাড়ির হেডলাইটের রূঢ় আলোয় তারা দৃশ্য হতেই পারে। যে কবিতা সে অনেক অনেক দিন আগে হারিয়ে ফেলেছে সে-ই যেন তার সামনে, পাশে, পেছনে বসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অনিঃশেষ তার রাজকীয় মহিমা। এখনও, এখনও। এই ক্লান্ত মধ্যযামেও।

এষা ভাবছে এইভাবে কতদিন পাশাপাশি ট্রামে বাসে ট্যাকসিতে চলন্ত যানের ছন্দে দেহছন্দ বেঁধে নেওয়া। বন্ধনহীন গ্রন্থি। সর্বনেশে দিক ভোলানো হাওয়ায় ভাঁটির টানে সাগর। গায়ে নোনা বাতাস। সমুদ্রের নুন কপালে, গালে, আঙুলের ফাঁকে, দুই হাতে গতির উল্লাস। ব্রেকারের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে গভীর স্বচ্ছ নীল জল, চোরা স্রোতের টানে ঘাট থেকে আঘাটায়, রক্ষাকালীর সূচীমুখ জিভের মতো অন্তরীপ, নির্জন দ্বীপুঞ্জের অনাবিষ্কৃত কুমারী অরণ্য। জাগ্রত আগ্নেয়গিরিমালার ক্রেটার থেকে ক্রেটারে উৎক্ষেপ।

যথাকালে এই দুঃসাহসের কাহিনী খানবাড়ির কানে উঠল। ঘৃণায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিরস্কার, অবরোধ। তুলোর বাক্সর মধ্যে আঙুরকে শুইয়ে রাখা হয় খুব সম্ভব যত্নের জন্য। মানুষকেও এভাবে রাখলে তার প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়, কেউ সে কথা ভাবে না। কিন্তু জানলা বন্ধ করে দিলেও ঝড় যখন আসবার তখন ঠিকই আসে। জানলার খড়খড়িগুলো তুলে দিয়ে, গর্জন করে ঢুকে পড়ে কর্ণরন্ধ্রে। এই ঝড় সমস্ত গতানুগতিকতার মুখে পাথর খসিয়ে জীবনের মোড় ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে তবে বিদায় নেয়।

বন্ধুরা বলছে—'সাবধান এষা। অরিত্র চৌধুরীর ঈশ্বরী কিন্তু তুমি একা নও। আগেও ছিল, পরেও থাকবে। আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট থেকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট থেকে রিসার্চস্কলার, অরিত্র চৌধুরী ওরফে ত্রিলোকেশ গৌরবের ইতিহাস একই রকম।'

অরিত্র দ্রুত হাঁটছে, হাওয়ায় চুল উড়ছে, চোখের কোণ সরু হয়ে গেছে, বলছে—'কী চমৎকার কোঁকড়া চুল নীলম মেয়েটার। কী পরমাশ্চর্য কার্ভ ঠোঁটে। আমি এরকম আর দেখিনি। দেখেছ এষা?'

এষা বলছে—'তুমি আমাকে কবে বিয়ে করবে অরি?

'হঠাৎ? দুম করে?'

'কেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল?'

—'হাউ ইউ টক এষা? জানো না তুমি আমার হৃদযন্ত্র?'

—'জানি অরি। আমি তোমার ফুসফুস, পাকস্থলী, প্লীহা, যকৃৎ, বোধহয় আপাতত তোমার অন্ত্র, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ।'

—'ছি এষা ছি। তুমি কি আমার ঘর দেখে আসোনি? আজ চার বছর ধরে দেখ না? জাঠতুত, খুড়তুত, পিসতুত, সিঁড়ির তলার ঘরে কোনক্রমে দিনপাত, দেখো নি? চাকরি করতে হলে আমি মরে যাবো।"

'বেশ তো চালিয়ে যাও তোমার লেখা। তুমি যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হবে, আমি করব চাকরি।'

'তুমি চাকরি করবে? দশটা পাঁচটা? দিদিমণি? কালো ব্যাগ? বেঁটে ছাতা?' কবি গৌরব ভয়ার্ত চোখে তার ঈশ্বরীর দিকে চেয়ে রইল।

এষা বলল—'কি রকমের কবি তুমি। সত্যকে ভয় পাও, বাস্তবকে ঘৃণা করো? তুমি এসকেপিস্ট। এসকেপ দিয়ে আর কবিতা হবে না।'

— 'আমি এসকেপিস্ট নই এষা। এ পোয়েট উইথ এ মিশন। আমাকে

খারিজ করে যুগের বাবার সাধ্য নেই। কবিতা এক ধরনের সাইকিয়্যাট্রি। যুগমানসের মগজের মধ্যে ঢুকে মন্ত্রশক্তি দিয়ে তাকে সম্মোহিত করে নির্জনি থেকে সজ্ঞান স্তরে নিয়ে আসে তার সমস্ত পাপবোধ, পুণ্যের জন্য যন্ত্রণা, এ কবির দায়িত্ব অনেক। সে দায়িত্ব নিয়ে ধোপদুরস্ত ফিটবাবু হয়ে অফিস যাওয়া চলে না।'

'আসল কথা বলো অরিত্র। মিথ্যে বলছ কেন! আসলে তোমার লক্ষ্য বস্তু বদলে গেছে।

'তুমি কি নীলম যোশীর কথা বলছ? আহা এষা, তোমাকে কোনদিনও বোঝাতে পারব না তুমি তামার টাটে ভোরের প্রথম শিশিরে ভেজা বিল্বপত্র। টোট্যালি আনপলিউটেড,' কবির কণ্ঠ আর্দ্র, 'তোমার চুলে জড়িয়ে আছে কত অজানা সমুদ্রের শৈবাল যারা কোনদিন সূর্যের মুখ দেখবে না, শুক্তির অভ্যন্তরের মতো তুমি অসূর্যম্পশ্যা অপাপবিদ্ধা। আর নীলম বালবিধবার বাগানের গন্ধরাজ। তার সমস্ত দেহমনের শুদ্ধি দিয়ে গড়া প্যাশন।'

'তাই আমাকে অশুদ্ধ করলে?' চোখ দিয়ে চলকে পড়ছে আগুন। ত্রিলোকেশের চোখে মেঘ, গলায় গুরু গুরু গর্জন—'এষা, তুমি অশুদ্ধ হওনি, তোমাকে আমি ছুঁই নি, আমার কবিতা ছুঁয়েছে, আমি সজ্ঞানে চাইনি, আমার কবিতা চেয়েছিল। আর কবিতার মতো শুদ্ধ আর কিছুই হতে পারে না।'

'কবিতার জন্য কত নারী লাগে অরি?' চেয়ার ঠেলে উঠে গেল এষা। বিদ্যুতের মতো পার হয়ে যাচ্ছে অলিন্দ। স্পষ্ট তানের মতো দ্রুত লয়ে টপকে গেল সিঁড়ি। চলে গেছে। চিরকালের মতো চলে গেছে।

এবার সেই প্রথম করোনারি থ্রম্বসিস। নিঃশব্দ চিৎকারে মুখ গহ্বরের সেই একান্ত বিস্ফারণ। নিজের টুঁটি নিজে টিপে ধরা। দাবানল! দাবানল! সমস্ত স্নায়ুগ্রন্থি আগুনের ভাঁটি। জ্বলে যায়, সব জ্বলে যায়।

দাদা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের উত্তর থেকে সে নিজেই পাত্র বেছে নিল। দিনক্ষণ মিলিয়ে সতের বছর তিন মাস সাড়ে পাঁচ দিনের বড়। রাশভারি। দায়িত্ববান। স্থিরবুদ্ধি।

অরিত্র বলল—' তুমি তাহলে বইটা দেখেছিলে?'

এষা বলল—'টা কেন? আর?'

'এই প্রথম। ওই শেষ।'

'তাহলে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক নয়? যুগ তোমাকে নিল না? অরিত্র? তোমাকে তাহলে চাকরি করতে হল? দশটা পাঁচটা। ব্যাশন ব্যাগ, ঝুল ঝাড়া,

বেবি ফুড ?'

বিষণ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে অরিত্র বলল—' কবিরা কখনও পুরোপুরি মরে না এষা। দে মিয়ারলি গো আনডারগ্রাউন্ড, লাইক সীড্‌স ইন উইন্টার। তুমি চলে গেলে কেন এষা ? তৎক্ষণাৎ ? কেন অত তাড়া করলে ? না হলে হয়ত বুঝতে পারতে কবিরাও মানুষ। মানুষই ভুল করে। বইটা আমাকে ভর করেছিল এষা। তোমাকে দেবার জন্য পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করেছি। গেলে তো গেলে একেবারে বাহ্‌রিন ?'

এষার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বাহ্‌রিনের প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি চাপা দিতে অরিত্র বলল—'তা সে যাই হোক, পেয়ে তো ছিলে ঠিক ! খুশি হওনি ? এষা-প্রেষা ! তোমারই জন্য ওই বই।'

এষা মনে মনে বলছিল—'হায় অরিত্র, তুমি কি জানো না ? আমার জন্য কখনই ও বই ছিল না। আমিই ছিলুম ওর জন্য। আমার অলিন্দ নিলয়ের সব রক্ত, ফুসফুসভরা অক্সিজেনের গতায়াত, আমার পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যালের সমস্ত পিচ্ছিল, সম্ভাবনাময় নিঃসরণ, মস্তিষ্কের কোষে কোষে মগজ নামক রহস্যময় পদার্থের চলাফেরা, নার্ভাস সিসটেমের সমস্ত রিফ্লেক্স নিঃশেষে হজম করে পুষ্ট হয়েছিল ওই অতিকায় ব্যাকটিরিয়া। আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছি ওর পাতা। মলাট দুটো দুমড়ে, মুচড়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে দিয়েছি। ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দিয়েছি রঙিন পিকাসো মুখ যাতে শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয়াভাস চিরকালের মতো আদ্যন্ত মুছে যায়।

বীথিকাপথে সবুজ-সবুজ আলোয় রাতপোকা ঘুরছে। নিদ্রামগ্ন প্রিয়লকর-নগর। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই রাত্রে ঘটে থাকে। বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন। ঘটে বড় বড় অসুখ, মৃত্যু, জন্ম, মিলন। লোকচেতনার আড়ালে অরিত্র চৌধুরীর জীবনে একটা মস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ব্লক বি। শম্ভাজী আলো-জ্বলা সেট হাট করে খুলে দিয়েছে। আওয়াজে পুপুর ঘরের জানলার পর্দা সরে গেছে। দরজা খোলার শব্দ। পোর্টিকোয় মাথার ওপরে ফ্রস্টেড বালব একটা গোল, তার আলো পুপুর সুগোল মাথার ওপর দুধ ঢেলে দিয়েছে। পুপুর চার পাশ ঘিরে সাধুসন্তদের মতো আলোর ছটা।

—'বাবা বাবা। তোমরা কত দেরী করলে ? মা ভাবতে ভাবতে কান্নাকাটি করছে দেখো এখন।'

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি গলার স্বর। অনেকটা বয়ঃসন্ধির কিশোরকণ্ঠের মতো।

এষাই আগে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল। অরিত্র বুট খুলছে। পুপুর হাত ধরে এষা বলল—'আমার জন্যে তোমার বাবাকে অনেক কষ্ট করতে হল। এতটা দূর জানলে আমি এমন আবদার কখনই করতুম না। ভিটি চলে যেতুম। একটা দিন বম্বে কাটিয়ে ডেকান কুইনে চলে আসতুম।'

পুপু বলল—'তুমি আগে ভেতরে চলো মাসি। বাবার অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে আমার মা ভীষণ শেকি হয়ে গেছে। এমনিতেও খুব সুপারস্টিশাস। মা এষা এষা করে কাঁদছিল।'

নীলম সত্যি-সত্যি এখন অন্তত কাঁদছিল না। কিন্তু ওর মুখে গাঢ় কালি। সোফায় বসেছিল মৃতের মতো। এষা দাঁড়িয়ে রইল। নীলম না উঠলে, না ডাকলে সে যেন এগোতে পারে না কিছুতেই। নীলমের গণ্ডির মধ্যে পা বাড়াতে ভীষণ যন্ত্রণা। অগ্নিবলয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য নীলম বসে আছে। আঁচে দুজনেরই মুখ ঝলসে যাচ্ছে।

অরিত্র এষার সুটকেস হাতে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে বহু চেষ্টায় নীলম উঠে দাঁড়াল। বিবর্ণ মুখে অরির দিকে ফিরে বলল—' আমি ভেবেছিলুম আবার তোমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

অরি বলল—'ধুত। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। একবারই হয় জীবনে। গীতাঞ্জলি বীভৎস লেট করেছে। সিদ্ধেশ্বরটা পাওয়া গেল তাই। নইলে আজ রাত্রে ফেরা হত কি না সন্দেহ।'

—'তাহলে মায়ের একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়ে যেত বাবা।'পুপু বলল।

এষা বলল—' নীলম,আয় কেমন আছিস ?' তারপর হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে নীলমকে জড়িয়ে ধরল। কী খুশবু নীলমের কোঁকড়া চুলে। বেপথুমান আত্মসমর্পণের গন্ধ। এষার বুকে ঠিক পাখির বুকের মতো চিকন উষ্ণতা। নিবিড়, মধুর। দুজনে দুজনের কাছে দুঃখ, ভয়, সন্দেহ সব জমা রাখল। রেখে, এক নিঃশব্দ অঙ্গীকার একত্রে উচ্চারণ করে অরিত্রর দিকে ফিরল।

॥ ৮ ॥

এষার মধ্যে একটা বালিকাসুলভ চঞ্চলতা এসেছে। ভোরে উঠে পড়েছে, বাড়ির সবাই জাগবার অনেক আগেই। চুপচাপ জামাকাপড় বদলে নিয়েছে। দু মিনিট দাঁড়িয়ে ভেবেছে এরকম দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। তারপরেই শম্ভাজীকে মনে পড়ে গেল, রাত ডিউটি যখন, সকাল আটটা পর্যন্ত নিশ্চয়ই থাকবে। সন্তর্পণে সদর-দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে মেন গেটে

গিয়ে শম্ভাজীর সঙ্গে কথা বলে নিল। একটু যেন নজর রাখে।

খোলা রাস্তা। দুপাশে গাছ, মসৃণ ধূলিহীন পথ। হাঁটবার জন্যেই এসব পথের সৃষ্টি। কে যেন বলেছিলেন তাঁর প্রিয় হবি হাঁটা। ঠিকই বলেছিলেন। হাঁটা একটা নেশা হওয়ারই যোগ্য। তুমি হাঁটছো, তোমার দু পাশ থেকে ভোরের হাওয়া এসে তোমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, একটু একটু শীতালো হাওয়া, হাওয়ার সঙ্গে নাম-না-জানা গাছপালা, পাখি, আকাশ, এসবের গন্ধ জড়িয়ে থাকবেই। তুমি ধরতে চাইবে, পারবে না, গন্ধটা তোমায় চমকে দিয়ে, প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েই পালিয়ে যাবে। এই হাওয়া আর এই অবকাশ ভরা পদক্ষেপের অনুষঙ্গে কোথা থেকে এলোমেলো চিন্তারা উড়ে এসে পড়বে। হিল কার্ট রোড, বোল্ডার সাজানো। একটু দূরেই পাইন, পাইন ফারের ফাঁকে ফাঁকে পর্বতরেখা, ম্যাল রোড মুসৌরি, একদিকে পাহাড়, আর একদিকে ঢালু খাদে হোটেল, বাড়ি, দেওদার। কার্ট রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টমাস হার্ডির টেসের কথা কেন মনে পড়েছিল? এখন সেইটা আবার মনে পড়ল—গ্রহ দুরকম আছে, একরকম—সুস্থ,একরকম রুগ্ন, আমাদের গ্রহটা কিরকম? রুগ্ন। কিশোরী টেস তার বালক ভাইকে বলছে। কেন এটা মনে এলো এষা জানে না আবার মুসৌরি অনুষঙ্গে গিরীন্দ্রশেখরের পুরাণ-প্রবেশ-এর কথা মনে এলো, কীভাবে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের মিথকে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন! এইভাবে যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা পূর্ণ চেহারা দাঁড় করাতে পারা যায়। ইস্‌স এই রাস্তা দিয়ে বাজীরাওয়ের ঘোড়া গিয়েছে কি না কে জানে, তখন হয়ত ছিল শুধু পাহাড়ি রাস্তা। এমন সমতল নয়।

বাঁক ফিরতেই একরাশ আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও। এটা পুব দিক। গাছ নেই। চওড়া পথ। আশে পাশে দোকান, একটা মনোহারি দোকানের করোগেটেড ঝাঁপ গড়গড় করতে করতে উঠে গেল। বিরাট দোকান, এখান থেকেই নিশ্চয় নীলমের বাড়ির অর্ধেক জিনিস যায়। বাস চলে গেল অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। এষা দোকানে ঢুকল, তারপর ধীর লয়ে ফিরল।

ওরা সকলেই লিভিং রুমে জড়ো হয়েছে। এষা ঢুকতে পুপু বলল—'ওই তো মাসী এসে গেছে।'

অরিত্র মুখ কালো করে বলল—'কাউকে না বলে কয়ে অচেনা জায়গায় এমন বেরোতে হয়? যদি পথ হারাতে? যদি কোনও বিপদে পড়তে?'

নীলম বলল—'এষা, তোমার কী শরীরে ক্লান্তি নেই। এই গরমে এতটা পাড়ি

দিয়ে কাল অত রাতে এলে। আজ আলো না ফুটতেই বেড়াতে বেরিয়েছো!'

এষা হাত থেকে আইসক্রিমের বাক্স নামাল, হেসে বলল—'জেটে তো আর আসি নি। যে জেট ল্যাগ হবে। পথের কষ্ট কাল রাত্তিরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লম্বা ড্রাইভে একদম দূর হয়ে গেছে বিশ্বাস করো। যেটুকু ঘুমিয়েছি, সলিড। আর নীলম, তিনটে দিন হলেই একটা জায়গা পুরনো হয়ে যায়। প্রথম দিনেই তার স্বাদ নিতে হয় তাই।'

—'তিন দিনেই পুরনো? হায় কপাল।' নীলম মন্তব্য করল।—'চেনা হয়ে গেলেই সেই অচেনা-অচেনা রোমাঞ্চের ঠিকানা উধাও হয়ে যায়।'

অরিত্রর মুখের মেঘ সরে গেছে, একটু চেঁচিয়ে বলল—'এষা তুমি ভোরের চাটা মিস করলে, নীলম ওকে গুজরাতি মশলা চা বানিয়ে দাও। আমাদেরও দিও। আর ব্রেকফাস্ট দেবে টেবিল ভর্তি করে। এষা তুমি যদি এতোই ফিট থাকো, তাহলে আমি অফিস গিয়েই গাড়িটা ফিরিয়ে দেবো। নীলমের সঙ্গে গিয়ে পুনার খানিকটা অন্তত দেখে এসো। নতুন থাকতে থাকতে।'

পুপু বলল—'হ্যাঁ মাসী, নতুন থাকতে থাকতে।'

অরিত্র উঠে স্টিরিও চালিয়ে দিল।

'ও মেরে জোহরা জবীঁ তুঝে মালুম নহী
তু হ্যয়ে অব ভি হাসিন ম্যয় হুঁ নওজওয়াঁ।'

ঠিক মনে হচ্ছে এষার মাথায় কাঁধে চৈত্রশেষের কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরে পড়েছে রেড রোডে। পেভমেন্ট ভর্তি হয়ে আছে স্খলিত ফুলে ফুলে। সেই ফুল কিছু কুড়িয়ে কিছু এড়িয়ে করুণ রঙিন পথ ধরে চলে যাচ্ছে এষা।

হে আমার প্রিয়তমা, জানো না তুমি জানো না, এখনও তুমি তেমনই রূপসী, আর আমি যে এখনও নওজোয়ান। অরিত্রর মনে হল অষ্টমীর রাতে সন্ধিপুজোর সময়ে সামান্য সিদ্ধি খেয়ে ওরা যে আরতি নৃত্যটা করে সেটা এখন, এখানেই নাচতে পারলে ওর মনের মধ্যে যে বিপুল আনন্দ রোমাঞ্চ যৌবন আকাঙ্ক্ষা জমাট হয়ে রয়েছে সেটা মুক্তি পেতো।

পার্বতী মন্দিরে উঠতে উঠতে একটা ধাপে বসে পড়ল নীলম, বলল—'বলো কিরকম লাগছে।'

এষার পায়ের অনেক নিচে বিছিয়ে পড়ে রয়েছে পুনে শহর। নদীর সর্পিল রেখা, ব্রিজ, বাগান, রাস্তায় আর নদীতে তফাৎ করা যায় না রোদ চকচক করলে। এষা বলল—'অপূর্ব।'

'সত্যি ?'

'সত্য বই মিথ্যা বলিব না।'

'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লে।'

দাঁড়িয়ে পড়তে বাধা কি ? যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে না এসে থাকি।'

'তবে তোমার সাক্ষ্যটা পুরোপুরিই নেওয়া যাক।'

'তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, না ?'

'কেন, তুমি হওনি ?'

হয়েছি। যা রোদ ! সকালবেলায় বোঝা যায়নি সূর্যের এতো দাপট হবে। কি যে সাক্ষ্য নেবার কথা বললে !'

নীলম বলল—'ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি। এষা একটু বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে বলল—'অবশ্যই নির্ভয়ে।'

'আগে বলো আমাদের কি রকম দেখছো ?'

'চমৎকার !' এষা দ্বিধাহীন গলায় বলল, 'অজন্তা দেখবো বলে এসেছি। কিন্তু তোমাদের বিশেষ করে পুপুকে না দেখলে জীবনে সত্যিকার দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু না দেখা থেকে যেত নীলম।'

নীলম বলল—'এষা,সত্যি করে বলো শুধু অজন্তা দেখবার জন্যই এসেছ ! এটা কি সম্ভব ! অজন্তা দেখবার আরও সহজ পথ আছে। এই পথটাকেই বাছলে কেন ?'

এষা বলল—'দেখো নীলম, আমার অবচেতন মনে কি ছিল তা তো বলতে পারব না। কিন্তু সচেতনভাবে তুমি আর অরি দেখাতে পারবে বলেই এসেছি। আমি তো মেমসাহেব নই। আমার একলা ঘোরার অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়।'

একটু ইতস্তত করে নীলম বলল—'কোনও দুঃখ কোনও রাগ নিয়ে আসো নি ?'

এষা হঠাৎ হেসে ফেলল, নীলমের চুল উড়ছে। কানের পাশে সেগুলো গুঁজে দিতে দিতে বলল—'রাগ-অনুরাগ কোনটাই বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই, বিশ্বাস করো। থাকলে কি আসতে পারতুম ? তুমি পারতে ? বলো না ?'

'কিছু মনে করো না এষা, এতো হারিয়েছি, এমন অনিশ্চিত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছি যে আমি সহজেই ভয় পেয়ে যাই। তোমার রাগ-অনুরাগ যদি অবশিষ্ট না-ও থাকে, অরির কিন্তু ষোল আনা রয়েছে।'

'থাকলে, শীতল জল নিক্ষেপ করে নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি।

'তাছাড়া তোমার যদি রাগ থেকে থাকে দোষ তো দেওয়া যায় না। যা

ঘটেছে তোমার ওপর চূড়ান্ত অন্যায় করেই ঘটেছে,এ তো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে আমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

এষা বলল—'ভাবের ঘরে চুরি করা যায় না নীলম। হৃদয়ের ব্যাপারে উচিত অনুচিত মেনে চলা নৈতিক দিক থেকে ঠিক হতে পারে। কিন্তু সত্য হয় না, বাস্তবও হয় না। তাছাড়া যা হয়েছে ভালো হয়েছে নীলম। অরির যা স্বভাব। ও আমাকে চিরকাল দেবী টেবী বানিয়ে রেখে দিত , পেছনে চালচিত্র, হাতে চাঁদমালা ঝুলিয়ে। তার চেয়ে এ অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। বেঁচে গেছি। দুজনেই।'

কথাটা নীলমকে কোথাও খুব গভীর ভাবে আঘাত করল। সে কি শুধুই রক্তমাংসের নারী ? যাকে দিয়ে অরিত্রর প্রয়োজন মেটে, সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় ? আর এষা চির-গরিয়সী ?

এভাবে কথাগুলো বলা যায় না। এমনিতেই কেন এসেছে প্রশ্ন করে সে আতিথ্যের নিয়মই ভঙ্গ করেছে একরকম। অরি জানতে পারলে তুলকালাম করবে। কিন্তু বুকের মধ্যের কষ্ট, জ্বালা যে কিছুতেই যায় না। বলল—'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করো না। ডিভোর্স করলে কেন ? ভদ্রলোক শুনেছি সব দিক দিয়েই খুব সুপাত্র ছিলেন। খালি বয়সটাই একটু বেশি ছিল, নয় ?'

এষা জবাব দিল না। নীলম তখনও জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েই আছে দেখে হেসে বলল—'ভয় নেই অরির জন্য করিনি।'

'আহা আমি কি তাই বলেছি, তাহলে ?'

'সব কথা কি বলা যায় ?'

ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘিত হয়ে যাচ্ছে এবং এষা তার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা করবে বুঝেও নীলম ছাড়ল না। নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার অনেকটাই সে এষাকে বলে ফেলেছে আবেগের মুখে। এষারও উচিত তার নিজস্ব গোপনতা ভঙ্গ করে তার জবাব দেওয়া।

'তুমি তো মিডল ইস্টে ছিলে ?'

'হ্যাঁ, পাঁচ বছর। বাহ্‌রিন।'

'তারপর ?'

'তারপর কলকাতায় ফিরলুম।'

'কে কে ছিলেন ওখানে ?'

'শ্বশুর শাশুড়ি। উনি। আর কেউ না।'

'বেশ তো ছোট সংসার। শ্বশুর -শাশুড়ি খারাপ ছিলেন। খারাপ ব্যবহার করতেন ?

এষা নিশ্বাস ফেলে বলল—' খারাপ ছিলেন না, নীলম। খালি শ্বশুরমশাই আমাকে মাইনে করা সেবিকার মতো ব্যবহার করতেন, আর শাশুড়ি ব্যবহার করতেন খাস পরিচারিকার মতো।'

শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা করতে বাধ্য হওয়াটাই তাহলে তোমার সঙ্কটের কারণ !'

না, তা নয়, নীলম। শ্বশুর ভীষণ ভালোবাসতেন, এক গ্লাস জল খেতেও তাঁর এষা-মার দরকার হত। ধরো জলের কুঁজো-টা ওঁর নিজের ঘরেই রয়েছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে, আর আমি ধরো তখন বাথরুমে স্নান করছি। যতক্ষণ না আমি এসে জল গড়িয়ে দোব, ততক্ষণ উনি খাবেনই না। আর শাশুড়ি ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমায় আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর কুৎসা শুনতে হত। তাদের অনেককে আমি চিনিও না। তাঁর সঙ্গে আমায় প্রতিটি বাংলা এবং কিছু হিন্দি ফিলম দেখতে যেতে হত। টি ভি সিরিয়ালও। সেসবও করতুম। কিন্তু নীলম মানুষ হয়ে জন্মালে সবারই একটু নিজস্ব সময়ের, নিজস্ব কাজের দরকার হয়, সেটা তাঁরা কিছুতেই দিতে চাইতেন না। আমার সমস্ত সময়টা, জীবনটা তাঁদের তিনজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিতে হত। রাতের ঘুমটাও তো একেবারেই আমার নিজস্ব ছিল না। যখন তখন সেটাতে টান পড়ত। একরকম জোর করে শেষ পরীক্ষাটা পাশ করলুম। চুপিচুপি অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে কলেজের চাকরিটা যোগাড় করলুম। ওঁরা সেটা মেনে নিতে পারলেন না।'

'ব্যাপারটা খুব অনাধুনিক শোনাচ্ছে এষা।'

—'শোনাক। বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট পণের টাকার পরও হাজার হাজার টাকার দাবীতে শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী সবাই মিলে বউকে খুন করার ঘটনাও অনাধুনিক, একেবারে মধ্যযুগীয় শোনায়। শোনায় না ? তবু তো ঘটে। অনেক বাবা-মাই ছেলের বিয়ে দ্যান একটি উচ্চশ্রেণীর পরিচারিকা বা সেবিকা পাবার জন্যে। বাবা-মার সেবা করবার জন্য ছেলে বউ আনছে এ ধারণা তো আমাদের শাশ্বত কালের নীলম। সেবা করাটা বড় কথা নয়, সেটা জীবনযাপনের আনুষঙ্গিক। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তুমি কাজের লোক খোঁজো, নার্স খোঁজো সেই উদ্দেশ্যে ছেলের বউ খুঁজবে ? ব্যাপারটা একটু ভেবে দ্যাখো নীলম ! তারপর পান-জর্দা খেতে খেতে সেই হাসি, আর বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের

ভাবের গল্প শোনা ! উঃ আমার যে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হত।'

'আপত্তি করতে পারতিস !'

'ওরে বাবা, যতই কেন তুমি উচ্চশিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হও না, নিজের মতামত, নিজের রুচির কথা প্রকাশ করা বড়দের কাছে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার ছিল। যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাতেই দাম্ভিক রুক্ষভাষিণী বলে বদনাম হয়েছিল। পাশের বাড়ির বউটির সঙ্গে কথায় কথায় আমার তুলনা হত। সে অবশ্য শাশুড়ির নিন্দে করবার জন্যেই শুধু আমার সঙ্গে ভাব করেছিল। এবং শ্বশুর-শাশুড়ির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নিজের ছেলেমেয়েদুটিকে নিঃশর্তে তাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল।'

'ছেলেমেয়ে হলে বেঁচে যেতে এষা।'

'আরও বেশি করে মরতুম নীলম। তোমার পুপুর মতো এমন আপনাতে আপনি বিকশিত হবার সুযোগ দিতে তো পারতুম না। যন্ত্রণা বাড়ত। হাজার চেষ্টা করলেও কেউ কেউ নিজের রুচি, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব দমন করতে পারে না যে।'

'এমন অদ্ভুত বিয়ে বাড়ি থেকে দিলেন কেন ?'

'কিছু অদ্ভুত তো নয় ! বাইরে থেকে কি এসব বোঝা যায় ? শাশুড়ি গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। শ্বশুরমশাই অবসরপ্রাপ্ত জজ। তাতে কি হল ? একটি মাত্র ছেলে। সে-ও এক যন্ত্রণা। ছেলের ঠিক কতটা ভাগ বউয়ের, কতটা বাবা-মার এই তৌল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল বাড়িতে।'

—'তা ছেলে কি বেশির ভাগটাই বাবা-মার ছিলেন ?' নীলমের গলায় প্রচ্ছন্ন পরিহাস।

'নাঃ।' এষা ছোট্ট করে বলল।

'তবে ? তিনিও কি তোমাকে দেবীর মতো ব্যবহার করতেন ?'

—'না। তিনি আমাকে ঠিক বাথরুমের মতো ব্যবহার করতেন।' বলে ফেলেই এষা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ এতো স্পষ্ট, গভীর লজ্জা, দুঃখ, অনপনেয় অপমান তাকে এই মুহূর্তে এমন ভাবে বয়স্ক করে দিয়েছে যে নীলম মুখ নিচু করে ফেলল। এভাবে এষাকে জেরা করা তার উচিত হয়নি বুঝতে পেরে নিজেও ভীষণ দুঃখিত বোধ করল নীলম। কিন্তু সে তো শুধুমাত্র মেয়েলি কৌতূহলের বশে প্রশ্নগুলো করেনি, তার জানা দরকার ছিল এষার অবস্থিতি বিন্দু ঠিক কোনখানে, অরিত্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হতে পারে ? আগে থেকে জানা থাকলে, অনেক বিপদই তো এড়ানো সম্ভব। জীবন-মরণের প্রশ্ন

তার। বুঝতে পারলে এষা ক্ষমা করবে। এষা, আমাকে মাপ করো। আমি আগেও তোমার কষ্টের কারণ হয়েছি। ভীষণ কষ্ট। এখনও তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছি। আহা এষা, মুখখানা কালো হয়ে গেছে। তুমি কি এখন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে রুচিবিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক সঙ্গদানের ক্লান্তিকর স্মৃতিতে ফিরে গেছো, নাকি স্বামীর সঙ্গে অনভিপ্রেত সহবাসে! এভাবে তোমাকে দুঃস্বপ্নে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমায় মাপ করো। তুমি বোধহয় ছোট পাখি, কিন্তু ছোট হলেও আকাশে সাঁতার কাটতে না পারলে মরে যাও। এষা আমি তোমাকে খানিকটা বুঝেছি। এবং আকাশচারিণী বলেই তোমার কাছ থেকে বারবার ক্ষমা চাইবার সাহস আমার হয়।

ডেকান জিমখানার কাছে একটা ছোট পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁয় দুজনে দুপুরের খাওয়া সারল। দুজনেই চুপচাপ। দুজনেই বিষণ্ণ। বাড়িতে নেমে দরজার তালা খুলল নীলম, এষা অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে আছে। নীলম জানে না। এষার হতাশা ডিপ্রেশন, কী ভয়ানক জিনিস। যতবারই আসে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এষার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত খরচ হয়ে যায়। অথচ সে এ জিনিস জয় করবেই। প্রাণপণে বলে, আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি, অন্ধকার যতই গাঢ়, কঠিন, দুর্ভেদ্য হয়, তার জেদও ততই বেড়ে যায়। আলো আলো, শেষ পর্যন্ত সে আলোয় পৌঁছবেই। নীলম জানে না। কিন্তু নীলম এখন দেখছে তার সুদৃশ্য পোর্টিকোয় এক বজ্রাহত গাছ। পাতা নেই, , ডালপালা খসে গেছে, শুধু একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ি, তার গাঁটে গাঁটে শাখা-পল্লবের প্রত্ন চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীলমের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। হাত বাড়িয়ে বলল—'এসো, কই এসো, আমি আর কোনদিন অতীতের কথা তুলব না।'

এষার আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে। এ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মেঘ নয়। এ বুঝি সুধীন্দ্রনাথের সংবর্ত। প্রাণপণে সেই মেঘজাল দুহাতে সরাতে থাকে এষা, কোথায় সূর্য, কোথায় তুমি, কদর্মপাত্রে তুমি তোমার দক্ষিণ মুখ বারবার ঢেকো না। তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু, জ্যোতির্ধর্মায় দৃষ্টয়ে।

॥ ৯ ॥

সেমিনারের প্রথমার্ধেই মহানামের বক্তৃতা ছিল। প্রশ্নোত্তরের সময় ধার্য ছিল মাত্র দশ মিনিট। তাতে কুলোয়নি। লাঞ্চের সময় তাই বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে ঘিরে ধরেছিল ছাত্রদল। এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নিজেকে ছড়ানোর একটা

আরাম পাওয়া যায়, সেটা মহানাম খুব উপভোগ করেন। বলছিলেন—'না, না তোমরা ভুল করছো। এটা ভালোমন্দের প্রশ্ন নয়। একটা আর্ট-ফর্ম আরেকটা আর্ট-ফর্মের ওপর হামলা করবেই। বিশেষত একই শিল্পী যদি দুটো ফর্ম ব্যবহার করেন। চিত্রশিল্পীর সত্তা অ্যাসার্ট করেছে নিজেকে, হয়ত তাঁর অজ্ঞাতেই। নিখিলেশ যখন 'ঘরে বাইরে'তে গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে কথা বলছে তখন তাকে পরিচালক মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শালের ভাঁজগুলো পর্যন্ত থাকে থাকে সাজিয়ে দিয়েছেন, ওই দৃশ্যে নিখিলেশ একটু আড়ষ্টও, যেন স্টিল ছবির ধর্ম বজায় রাখতে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি', 'জলসাঘর' এগুলো সব পেন্টারের ফিল্ম। এপিসোডিক ইন স্ট্রাকচার।

চন্দ্রশেখর এসে বলল একটি সুইডিশ ছাত্র গবেষণা করতে কিছুদিন এসে রয়েছে এখানে, সে যেন কি বলতে চায়। পেছন ফিরে মহানাম দেখলেন পাতলা সোনালি চুল, সাদাটে চোখের একটি ছেলে, খুব ব্যগ্র মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ও রায়ের ছবির সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গবেষণা করছে। ওর প্রশ্ন চন্দ্রশেখর অনুবাদ করে দিল—'ঘরে বাইরে'র লাস্ট সিকোয়েন্সে বিমলা আস্তে আস্তে বিধবার বেশে রূপান্তরিত হচ্ছে এটাকে পরিচালক যেন একটা চূড়ান্ত ট্রাজেডি বলে ফোকাস করেছেন, কেন, যেন উইডোহুড ইটসেলফ ইজ আ ট্রাজেডি, বিমলা নিখিলেশের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যবোধের বন্ধনে বন্দী। প্রেমের বন্ধনে তো নয়। নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যের। সন্দীপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু সন্দীপই তাকে শরীরে ও মনে জাগিয়ে দিয়ে গেছে, এরপর সে বৃহত্তর, ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হবে, এটাই বাস্তবসম্মত নয় কি?

মহানাম বললেন—'আমাদের দেশের যে সামাজিক পটভূমিতে রায় ছবিটি করেছেন সেখানে বৈধব্য প্রত্যাহার করা যায় না। এবং তা অভিশাপ বলে গণ্য। একজন মহিলা যতই কেন আলোকপ্রাপ্ত হন না, এই সংস্কার এড়াবার সাধ্য বা এর থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবার উপায় তাঁর নেই। সামাজিক-ধর্মীয় গণ্ডির যে বেষ্টনী, তাকে ছিন্ন করবার উপায়ও তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। নিখিলেশের মতো উদারচিত্ত স্বামী বেঁচে থাকতে বিমলা যে স্বাধীনতা উপভোগ করত, তার সমস্তটাই এখন সে হারাল, ওই বৈধব্যটা তার পক্ষে চূড়ান্ত ট্রাজেডিই।

'তাছাড়াও একটা জিনিস লক্ষ্য করোনি মনে হচ্ছে, —সেটা নিখিলেশ-বিমলা সম্পর্কের সূক্ষ্ম পরিবর্তন। প্রথমে যেটা ছিল ঐতিহ্য-নির্ভর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, যার থেকে নিখিলেশ মুক্তি পেতে চেয়েছিল সন্দীপ এপিসোডের সময়ে এবং

তারপর কিন্তু সেটা ব্যক্তিত্ব-সংঘাতের এবং প্রেমের ভূমিতে এসে দাঁড়াল। ইটস আ ট্রাজেডি অফ পার্সন্যালিটি অ্যান্ড লাভ, বিমলার যত না, নিখিলেশের তার চেয়েও বেশি। এই জিনিসই সে চেয়েছে। এই খোলা চোখে চেয়ে দেখা। জাগতিক ঘটনানিচয় এবং অন্যতর চরিত্রের পাশাপাশি নিজেদের স্থাপন করে তুলনা প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বরূপ চিনে নেওয়া। ঘটল বস্তুত তাই। কিন্তু মাঝখানের সন্দীপ-এপিসোডে বিমলার যে চ্যুতি তা নিখিলেশকে এমন বেদনা দিল যা ওর আগে কল্পনায় ছিল না। তাই ও আত্মহননের পথই বেছে নিল।

জোহান বলল—'তাহলে তো বলব পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত পুরুষ নিখিলেশ নন।'

'ননই তো। সংস্কার যে আমরা আমাদের শোণিতে বহন করি, বুদ্ধি দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু আবেগের ভূমিতে এসে দাঁড়ালেই সংস্কার মাথা তোলে।'

জোহান বলল—'নিখিলেশ তাহলে বিমলাকে একরকম শাস্তিই দিলেন।'

'ভেরি ইনটেলিজেন্ট অফ য়ু। অফ কোর্স শাস্তিই দিলেন। কারণ বৈধব্যের প্রথার মধ্যে সামাজিক-ধর্মীয় শৃঙ্খল কত দৃঢ় তা তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবে এই শাস্তি দেওয়া জিনিসটা তিনি কতদূর সচেতনভাবে করেছেন বলা শক্ত। নিখিলেশ আসলে ফিল্মটিতে সবচেয়ে জটিল চরিত্র। তার শেষ সিদ্ধান্তে ব্যর্থ প্রেমিক হিসেবে বিমলার ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে আছে, স্বামী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য ব্রাভাডো আছে, আবার জমিদার হিসেবে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নেবার আন্তরিক ইচ্ছা, তা-ও আছে।'

জোহানের দ্বিতীয় প্রশ্ন—'অরণ্যের দিনরাত্রিতে' রে আরও একটি উইডোড় মেয়েকে দেখিয়েছেন, যার স্বামী অজ্ঞাতকারণে বিদেশে আত্মহত্যা করেছে এবং যে সেই স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এখন বাস করছে। যে নির্জন অরণ্য অঞ্চলে ওরা থাকে সেখানে আগন্তুক চারটি বন্ধুর মধ্যে একজনকে সে আত্মনিবেদন করল, মেয়েটিকে গ্রহণ করতে ছেলেটির কি বাধা ছিল? সে তো আগেই মেয়েটির সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে। তার ব্যবহার তো চূড়ান্ত অমানবিক। পরিচালক এখানে একটা মিলনদৃশ্য দেখালেন না কেন, গোদার হলে দেখাতেন।'

মহানাম হাসলেন—'জোহান, আমাদের দেশের যা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত তার চার ভাগের তিন ভাগ মেনে নিয়েই তো আমাদের শিল্পকর্ম!

নাহলে সেটা অবাস্তব হবে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে দেখানো হয়েছে আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের মেয়েদের শারীরিক পবিত্রতা চট করে নষ্ট করা যায় না। পাশাপাশি যেমন আদিবাসী মেয়েটির ক্ষেত্রে করা গেছে।'

'মেয়েটি নিজে চাইলেও না।'

'না, সে নিজে চাইলেও না। দ্বিতীয়ত ওই ছেলেটি মোটেই মেয়েটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, যতই ফ্লার্ট করুক। ওই পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে গ্রহণ করবার কতকগুলো ফলাফল আছে, ছেলেটি সে বিষয়ে বেশ সচেতন, তাছাড়াও আছে তার সহজাত ইনহিবিশন।'

'কেন, উইডো বলে?'

মহানাম একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

জোহান বলল—'তাহলে নাইনটিন হানড্রেড অ্যান্ড ফাইভ থেকে আরম্ভ করে তার পঞ্চাশ, ষাট বছর পর পর্যন্তও উইডোহুড সম্পর্কে ইন্ডিয়ার সমাজ আর একটুও প্রগতিশীল হয়নি, বলুন! এই ছেলেটি তো স্বার্থপর, দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে অক্ষম, এবং যৌন অক্ষমতাও তার অন্তর্গত।'

মহানাম বললেন—'তাই। কিন্তু ও যদি ওই মুহূর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করত তাহলে আমরা ওকে আরও স্বার্থপর বলতাম।'

'আশ্চর্য!' জোহান মন্তব্য করল, খসখস করে কলম চলতে লাগল ওর নোটবইয়ের পাতার ওপর। ভগবান জানেন ও ভারতের সমাজকে কোন কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

মহানাম চন্দ্রশেখরের দিকে ফিরে বললেন—'সামাজিক অবস্থার তফাতে দৃষ্টিভঙ্গির কি দুর্লঙ্ঘ্য তফাত হয়, দেখেছো শেখর! সেইজন্যেই 'দেবী' অত ভালো ছবি হওয়া সত্ত্বেও ওরা একেবারেই গ্রহণ করতে পারেনি। আর্ট-উপভোগেই বাধা সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ দিনের মানসিক অভ্যাস। তাছাড়াও, শেখর,আমার মনে হয়—মানুষে মানুষে সম্পর্কের কতকগুলো চিরন্তন মূল্যমান আছে সেখানেও আমাদের কিছু ন্যূনতা থেকে গেছে। বিশেষত মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে।'

'চিরন্তন মূল্যবোধ? ঠিক বুঝলাম না।' চন্দ্রশেখর বলল।

'ধরো, পীড়িতের প্রতি সহজ মমত্ববোধ একটা ইটারন্যাল ভ্যালু তো?'

''অরণ্যের দিনরাত্রি'র ওই বঞ্চিত বধূটিকে কিন্তু আমরা মমত্ববোধ দিয়ে দেখিনি। শী হ্যাজ বীন ট্রীটেড অ্যাজ অ্যান একসেনট্রিক অ্যান্ড নট আ প্যাথেটিক ফিগার।'

'আর একটু বুঝিয়ে বলুন।'

"অরণ্যের দিনরাত্রি' কি ? অ্যান এক্সকার্শন ইনটু দা আনফ্যামিলিয়ার, দা বিজার। চার বন্ধু একঘেঁয়েমি কাটাতে নির্জন অরণ্য-অঞ্চলে এসেছে। অপরিচিত প্রকৃতি, মানুষজন, রীতি-নীতি, শুধু অপরিচিতই নয়, অদ্ভুত, গা-ছমছমে। ওই উইডোড বধূটি'কে এই গা-ছমছমে পরিবেশের অংশ বলে দেখিয়ে তার প্রতি আমরা সুগভীর অন্যায় করেছি। বুঝতে পারছ ? স্বাভাবিক ভালোবাসার জন্য তার আকাঙ্ক্ষাটাকে আমরা উৎকট অসুখ বলে উপস্থাপিত করছি। দ্যাটস হোয়াই জোহান অ্যাজ আ হিউম্যান বীয়িং ফীল্‌স্ রিভোল্টেড।'

অডিটোরিয়াম থেকে বেরোতে বেরোতে মহানাম ভাবলেন—কস্তুরী মাসীর চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়, পনের বছরে বিধবা হন। তখন তাঁর বাবার চৈতন্যোদয় হয়। মেয়ের 'পড়াশুনো, বিদেশ-যাওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি ও সম্পত্তির জন্য শ্বশুরবাড়ির আগ্রাসী ভালোবাসা থেকে বাঁচানো এই সমস্ত দায় তিনি নিখুঁত ভাবে পালন করেছিলেন। মাসী বলতেন—'সবার তো আর এ ভাগ্য হয় না।' মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক পাঠ মাসির কাছেই। সেই মাসি যখন পঞ্চান্ন বছর বয়সে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন ! কোনও প্রস্তুতি না, কিছু না। মাসির আর যাই থাক হার্ট এবং ব্রেনে কোনও গোলমাল ছিল না।

দুপুরে নার্সিং-হোম থেকে এলেন, হাত ধুচ্ছেন বেসিনে, কনুই পর্যন্ত সাবান আর অ্যান্টিসেপটিক। এপ্রনটা অদূরে দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছে। যজ্ঞেশ্বর শরবৎ নিয়ে এলো গজগজ করতে করতে। শশা, ডিমসেদ্ধ। কয়েক দানা ডালিম আর ঠাণ্ডা দুধ—এই মাসির দ্বিপ্রাহরিক আহার। আজ শরবৎ খেতে চেয়েছেন, অর্থাৎ আর কিছু খাবেন না। তাই যজ্ঞেশ্বরের রাগ।

'খেয়ে কে কবে বড়লোক হয় বল তো ?' হাসতে হাসতে মাসি বলছেন। সোফায় বসেছেন শরবৎ হাতে করে। অন্যদিকে মহানাম, বই হাতে। হঠাৎ শরবতের গ্লাসটা হাত থেকে ঝনঝন করে পড়ে গেল। চমকে তাকাতে মাসি বললেন—'হাতটা হঠাৎ কেমন অবশ হয়ে গেল রে !' যজ্ঞেশ্বর গজগজ করতে করতে বলছে—'আমি আর এক গ্লাস টপ করে করে দিচ্ছি। তুমি যেন আবার ঘুমিও না মা।' মাসির ঘুমটিও ছিল সাধা। খেয়ে নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে ঠিক কুড়ি মিনিট চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে থাকবেন। বিশ্রাম নেবার সমস্ত নিয়মই মাসির জানা ছিল। ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল দেখে মহানাম ডাকলেন—'কস্তুরী দেবী, আপনার কিন্তু খাবার সময় হয়ে গেল।' মাসি উঠল

না, —'মাসি, উঠতে হয় যে এবার !' মাসি উঠল না। একটু ঠেলা দিলেন মহানাম, কস্তুরী কাত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন মহানাম। সত্যিই যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল।

কিছু কি মনে হয়েছিল ? কে যেন নেই ? কি যেন নেই ? এই ছিল, এই নেই। একটা শূন্যতা ! মাসির সঙ্গে কতটুকু দেখা হত ? হোস্টেল জীবন শেষ করে বাড়ি এসে বসার পর ? রাত দশটা, সকাল সাতটা আর দুপুর একটা থেকে দুটো। রাতে কিছুক্ষণ গল্প হত। ইদানীং ওই সময়টা মহানাম পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। শূন্যতাবোধ যদি থেকেও থাকে পরবর্তী ঘূর্ণাবর্তে সব তলিয়ে যায়। মাসির দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা সব উইলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ! দুঁদে সলিসিটর মাসির বাবার সময়কার, বললেন—'কেন হাঙ্গামা করছ বাবারা ! সুবিধে হবে কি ! ক্যাশ টাকা সব কস্তুরী মিত্রর স্বোপার্জিত, অনেকদিন মহানাম রায়ের অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। বসতবাড়িটি আবার কস্তুরীর বাবার স্বোপার্জিত, একমাত্র সন্তানকে বিনাশর্তে দিয়ে গেছেন। কিছুতেই হাত দিতে পারবে না।'

তারপরই অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজ, প্রোফেসর ডেকার, বন্ধুবান্ধবী। শূন্যতা বোঝবার সময় নেই। চতুর্থ বছরে প্রবাস থেকে ফিরে এলেন। পুরো ইয়োরোপ দেখার পর। সেই যজ্ঞেশ্বর, সেই সাদা কালো ছকের মার্বলের মেঝে। বিশাল বিশাল আয়না-ওলা দেয়াল-আলমারি পঙ্খের দেয়াল, ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতি জ্বেলে জমাট আসর।

অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসছে। এযার আসার কথা না। সে নেহাতই নবীন, আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রী। কিন্তু সে নিজের অধিকার কারো থেকে কম মনে করে না। উদ্ভট উদ্ভট কথা বলে মহানাম পার পান না। 'সিল্‌ক-মসৃণ' বা 'হাতুড়ি-মুখর' কেন গুরুচণ্ডালি হবে না, 'হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে' 'এক মাইল শান্তি কল্যাণ' কেন রসভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে না। 'একজোটে কাজ করে মানুষেরা যেরকম ভোটের ব্যালটে', কি রকম তুলনা ?' 'প্রকৃতির বুদোয়ারে' কি না লিখলে চলত না ? এইসব প্রশ্ন সে এমন মুখ করে জিজ্ঞেস করে যেন উত্তরটার ওপর তার জীবনমরণ নির্ভর করছে।

কবিতা যে স্বকীয় উচ্চারণের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ প্রবেশ করছে আস্তে আস্তে, গুরু-গাম্ভীর্যের পাশাপাশি চটুলতার ধাক্কা দিয়ে সে যে ঝিমন্ত শ্রোতাকে জাগাবার কাজে ব্যস্ত, এবং স্বভাষার অভিধান ভাবপ্রকাশে যথেষ্ট নয় মনে করে সে তার জানা সমস্ত ভাষা থেকে যে ক্রমশ শব্দ আহরণ করবেই—এই সমস্ত কথা মহানামকে সময়

খরচ করে বোঝাতেই হয়। কথা দিতে হয় তিনি তাকে বিশ্বসাহিত্য পড়তে সাহায্য করবেন। না হলে এষা ভীষণ বিমর্ষ হয়ে যায়।

হঠাৎ মহানাম জিজ্ঞেস করেন—'তোমার বন্ধু সেই ছেলেটি। সে কেমন আছে!'

'ভালো আছে?'

'দ্যাটস আ মিথ। মোটেই ভালো নেই। র‍্যাগেড ফিলসফার, চুল আঁচড়ায় না, জামা-টামা ইস্ত্রি করে না, ও তো সালফারের পেশেন্ট!'

॥ ১০ ॥

চন্দ্রশেখর ওর সার্ভের কাজে শহরে যাবে, সারাদিনেরই কাজ। যাবার পথে মোড়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল মহানামকে। বলল—'সকাল সকাল না গেলে চৌধুরীকে ধরতে পারবেন না, এখনও অফিসে জয়েন করেছে কি না অবশ্য জানি না, যদি বেরিয়ে যায়!' মহানামের ইচ্ছে ছিল বিকেলের দিকে যাওয়া। সকাল বেলাটা কারো বাড়ি গেলে তাকে বিব্রত করা হয়। কিন্তু বিকেলে লোকের বাড়িতে আরও অতিথি আসা সম্ভব, মহানাম অরিত্র আর নীলম ছাড়া আর কোনও লোকের সঙ্গে, বিশেষত অপরিচিতর সঙ্গে দেখা করার তাগিদ অনুভব করছেন না। চন্দ্রশেখরও বলল—'বিকেলে বেড়াতে বা কারো বাড়ি যেতে পারে, চৌধুরী-দম্পতি খুব জমাটি লোক।' মেন রাস্তার ওপরই চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন মহানাম। বাঁক ফিরে হাঁটছেন, যেন আসল গল্প বা প্রবন্ধ আরম্ভ হবার আগে উপক্রমণিকা, উপক্রমণিকাটুকু বেশ ভালো করে উপভোগ করে, ব্লক বি'র সামনে এসে দাঁড়ালেন মহানাম। শনিবার, ঘড়িতে প্রায় সাড়ে-আটটা। খুব তাড়ার মুখে গিয়ে তাঁকে ধরতে হচ্ছে অরিত্র চৌধুরীকে। আর একটু সময় পাওয়া গেলে ভালো হত। সামনে ছোট লন। গোটা তিনেক বেতের চেয়ার, একটা মোড়া, একটা স্টিলের ফোল্ডিং টেবল। একটা কুশন ঘাসের ওপর পড়ে গেছে। আশেপাশে খাবার-দাবারের টুকরো কিছু পড়েছে নিশ্চয়। কারণ কিছু কাক ঘাস থেকে খুঁটে খুঁটে কিসব মুখে তুলছে। আদর্শ গৃহস্থ অরি চৌধুরী। কাক, বিড়াল এদের ব্যবস্থা করেই সংসার পেতেছে। পুরো বাড়িটার আপাদমস্তক ভালো করে চেয়ে দেখলেন মহানাম। এইখানে কিছু পাখি বাসা বেঁধে রয়েছে। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে এসে। এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে। তাঁর না আসলেও চলত। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব, রহস্যের সমাধান···কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব কি পাওয়া যায়, আর সব রহস্যের সমাধান

জীবনে করতে পারবেন এতো অহমিকা মহানামের নেই। অঙ্কের ফিগার নয় হিউম্যান ফ্যাক্টর নিয়ে যেখানে রহস্য। সম্ভবত এই পাখিরা তাঁকে শিকরে বাজ, কি পেঁচা কি ওই রকম একটা কিছু ভয়ঙ্কর অশুভকর মনে করছে। করুক, তিনি যে সত্যি তা নন তা এই মুহূর্তে এদের জানতে দিতে তাঁর ইচ্ছে নেই। কিছু শঙ্কা, কিছু মোহ থাক না? মন্দ কি? সত্যিকারের বীতরাগভয়ক্রোধ যতক্ষণ না হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ জীবনযাপনে একটু উৎকণ্ঠার ভাগ থাকা ভালো। নইলে অরাজকতা বাড়ে। দু ধাপ সিঁড়ি উঠে ছোট্ট চত্বর পেরিয়ে মেরুন রঙের দরজার ধারে বেল টিপলেন মহানাম। বেজেছে কি বাজেনি, দরজা খুলে গেল। সামনে এষা। আকাশ নীল আর সাদা ছোট ছোট ছাপ-ছাপ শাড়ি পরে, কাঁধে একটা পাতলা কালো চাদর, চুলগুলো মুখের দু পাশ দিয়ে যথেচ্ছ সামনে এসে পড়ছে, কানের পেছনে তাদের গুঁজে দিতে দিতে অরিত্রর বাড়ির দরজা খুলছে এষা। মহানাম জীবনে কখনও এতো অবাক হননি। এষা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, বিস্ময়ে নির্বাক। মহানামের আগমনের সংবাদ এখনও তাকে শোনানোর কথা মনে পড়েনি নীলম কিম্বা অরিত্রর। এষাকে নিয়েই এখন ওরা ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে মহানামের মতো অতবড় সংবাদও বিস্মরণ হয়ে গেছে। অরিত্র বোধহয় মনে মনে আশাও করেছিল যে মহানাম শেষ পর্যন্ত আসবেন না।

মহানাম বললেন—'আমি ঠিক দেখছি? তুমি এষাই তো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এষার মতো কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি নও। আমার না-জানা যমজ-টমজ। সিনেমায় যেমন ডাবল রোল-টোল দেখায়'—

এষা হেসে ফেলল। মহানাম ভেতরে এক পা বাড়িয়েছেন। বললেন—'কোনও সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে ঢুকে পড়িনি? এ বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে উনসত্তর সত্তরে চলে যাওয়া যায় না তো? হে নারী, যদি তুমি এষাই হও, তাহলে সত্তরের এষা হয়ে কি করে সায়েন্স ফিকশন ছাড়া অষ্টআশিতে···'

এষা বলল—'এই কথাটা আমি শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে গেছি মহানামদা। যারা সর্বক্ষণ চলে, সময় তাদের ছুঁতে পারে না চট করে, রেসে হেরে যায়, তাছাড়া আপনিও তো খুব বদলান নি!'

মহানাম খুব ইঙ্গিতপূর্ণভাবে নিজের জুলপিতে হাত দিলেন, দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন। বললেন—

'থোড়ি দাড়ি পক্কা, থোড়ি ঔর কঁচ্চা/
ওহী আদমি অচ্ছা, ওহী আদমি সঁচ্চা। তা ব্যাপার কি বলো তো। সেদিন

রাত্তিরে দেখলুম নীলম বেরিয়ে এলো, আজ সকালে দেখছি তুমি। অরিত্র কি তাহলে তোমাদের দুজনকেই বিয়ে করে ফেলেছে ?'

এষা আর থাকতে পারল না, উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। হাসির শব্দ পৌঁছল বাথরুমে, দাড়ি কামাতে কামাতে কাঁধে তোয়ালে অরিত্র অবাক হয়ে বেরিয়ে এলো, নীলম রান্নাঘর থেকে হাতে মশলার কৌটো, পড়ার ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে পুপু।

এদিকে মহানামের মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে। সাদা ধবধবে পায়জামা, পাঞ্জাবি, বিশাল মানুষ একটি। ওদিকে পুপুর মাথা। পুপু বাবাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি লম্বা অসাধারণ দীর্ঘকায়া তরুণী এক।

মহানাম বললেন—'বাঃ। এষা, তোমার শঙ্খধ্বনিতে এক এক করে কুশীলবরা সবাই এসে পড়েছে। তিনটি মুখ আমার সর্বসাকুল্যে চেনা, যদিও কাউকে কাউকে চিনতে একটু দৃষ্টি বিস্ফারিত করতে হচ্ছে। চতুর্থ ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ হোক।'

অরিত্র পুপুর পিঠে হাত দিয়ে প্রায় যেন তাকে বেষ্টন করে ধরে বলল—'পুপ্ ওরফে সমিদ্ধা চৌধুরী ! আমার একমাত্র সন্তান। আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করছে। পুপু ইনি বিখ্যাত ডক্টর মহানাম রায়। হিসট্রি, সোসিওলজি, সাহিত্য, শিল্প, অঙ্ক কোনটা যে ঠিকঠাক ওঁর বিষয় আমার জানা নেই। এ যুগের ভারতবর্ষের অ্যারিস্টটল বলতে পারো, তবে তোর বাস্তুবিজ্ঞানটা ওঁর একেবারে জানা নেই।'

পুপু অবাক হয়ে চেয়ে আছে মহানামের দিকে। নীলম দেখছে পুপু চেয়ে আছে, মহানাম দেখছেন, নীলমের মুখ শুকিয়ে গেছে।

হাতজোড় করে নমস্কার করছে পুপু, বলছে—'হ্যাভ আই মেট য়ু সামহোয়্যার প্রোফেসর ? আই মাস্ট হ্যাভ।'

মহানাথ বললেন—'ডিড য়ু বাই এনি চান্স গো টু দা ফিল্ম ইনস্টিট্যুট অর ম্যাক্সমূলার ভবন লেকচার্স লাস্ট উইক ! আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস লাইকলি।'

'নো, বাট, আই হ্যাভ নেভার সীন আ ফেস সো ফ্যামিলিয়ার। এক্সকিউজ মি প্লীজ, আমি একবার বাজারে যাচ্ছি।' পুপুর ভঙ্গিটা এমন যেন সে ঘোরের মধ্যে কথা বলছে।

এষা বলল—'আমি রেডি। দাঁড়া একটু, থালিগুলো নিয়ে নিই। মহানামদা, একটু বসুন। আমরা এক্ষুণি ফিরে আসছি।'

রান্নাঘরে থলি আনতে গিয়ে এষা দেখল নীলম নিঃশব্দে কাঁদছে। বেসিনের

ওপর বাসনধোয়ার নাম করে কাঁদছে। চোখ দিয়ে টপটপ করে বড় বড় ফোঁটায় জল নেমে সব ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'এ কি নীলম ? কি হচ্ছে !' এষা ফিসফিস করে বলল, 'কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তাড়াতাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে স্কুটারের পেছনে চড়ে বসল এষা। বাড়ির পাশ থেকে ভটভট করতে করতে স্কুটার এগিয়ে গেল খোলা দরজার সামনে পোর্টিকোর ওপারের ঢালু রাস্তা বেয়ে। বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল। সামনে পুপু, প্যান্ট আর ঢোলা জামা পরে, ছোট চুল, বিশাল কান-ছোঁয়া চোখে একটা বিস্ময় থমকে আছে। ভ্রূ কুঁচকে আছে সামান্য। হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরে রয়েছে দু হাত, যেন ফসকে যেতে পারে বলে তার রোখ চেপে গেছে। পুপু পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে কোন দূর মায়ার দেশে চলে যাচ্ছে। পেছনে যাদুকরী। সঙ্কটের সময়ে ওকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে। পুপুর কি সাহায্য লাগবে ?

অরিত্র একটু দমকা জোর দিয়ে বলল—'বসুন মহানামদা। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

মহানাম বসতে বসতে সোজাসুজি বললেন—'মেয়েটি কি আমার ?'

অরিত্রর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—'হতে পারে ক্ষেত্রজ, কিন্তু কন্যাটি আমারই।'

মহানাম বললেন—'এরকম অদ্ভুত মিল আমি আর কক্ষণো দেখিনি। যেন আয়নায় নিজেকে দেখছি। নীলম কি গর্ভিণী অবস্থায় সারাক্ষণ আমাকেই ধ্যান করেছিল ! তাই যদি হবে তো চলে এলো কেন ?'

এই সময়ে নীলম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—'মেয়েটি যদি তোমারই হয়, তুমি কি ওকে নিয়ে যাবে এখান থেকে ছিঁড়ে, না চতুর্দিকে ঢোল শহরৎ করে ঘোষণা করবে ? কোনটা করতে চাও ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। জট বড্ড পাকিয়েছে। আমি একটা একটা করে গিঁট খুলি। মেয়েটি তাহলে, প্রকারান্তরে স্বীকারই করছ, আমার। এতদিন ধরে অরিত্র ওকে পালন করেছে, এতই স্নেহে যে অনায়াসে বলতে পারল ক্ষেত্রজ হলেও হতে পারে, কিন্তু কন্যা ওরই। অর্থাৎ পিতৃস্নেহেই পালন করেছে। নীলম, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি সুখেই আছো, সুখের বরং একটু আধিক্যই ঘটে গেছে ! না, না। সমিদ্ধাকে আমি নিয়ে তো যাবই না, কিন্তু ও যে স্বপ্রকাশ। আমার ধারণা আমাকে ওকে একত্রে দেখার পর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না কারও ও কার। হায় অরিত্র, বিধাতা তোমার সঙ্গে বেশ বড়সড় একটা ঠাট্টাই

করেছেন মনে হচ্ছে। সেই ঠাট্টাটাকেই তুমি বোকার মতো বয়ে বেড়াচ্ছ। ওকে ওরকম ছেলেদের মতো সাজিয়ে রেখেছো কেন ? তাইতে সাদৃশ্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে।'

'ও ওরকমই পছন্দ করে।' নীলম সংক্ষেপে বলল।

'ভাগ্যিস ওর দাড়িটাও নেই! একমাত্র বাঁচোয়া। তা এখন উপায়!'—মহানাম বললেন।

অরিত্র রুক্ষ গলায় বলল—'একমাত্র উপায় আপনার চলে যাওয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পুনেঁ থেকে।'

মহানাম মাথা নেড়ে বললেন—'তুমি অতিথির সৌজন্যও একসময় পালন করোনি, গৃহস্বামীর আচারও আজ পালন করছ না। এ আমি জানতাম মোটামুটি। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয় অরিত্র। আমার একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম আছে, তোমার ছোট সুবিধের জন্য আমি তো আমার বড় অসুবিধে করতে পারি না। তবে, তোমার জানাশোনাদের আসরে আমি না-ই এলাম। একটা বাঙালি সাহিত্যসভার জন্য বলতে এসেছিল, শেখরকে আমি বরং না করে দেবো। কিন্তু এষা কোত্থেকে এলো ? আমার সব হারানো মণি-মাণিক্যগুলো তোমার কবলীকৃত হয়ে গেছে দেখছি। কোন মন্ত্রে ? তুমি কি যক-টক হয়ে গেছো ?'

অরিত্র বলল—'মন্ত্র নিশ্চয়ই কিছু আছে, যা আপনার জ্ঞানের অগম্য।'

এই সময়ে দরজায় বেল বাজল, অরিত্র তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল। ওপরের ফ্ল্যাটের মহিলা। কখন প্যাসেজের বাতি কেটে গেছে, সেই বিষয়ে কিছু বলতে এসেছেন।

মহানাম তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে পকেট থেকে পাইপটা বার করে তামাক ভরতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মহিলা চলে যেতে নীলমের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হেসে বললেন—'নিজের পেছনটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। নীলম, দেখো তো, আমার পেছনটা আবার সমিদ্ধার মতো নয় তো ?'

অরিত্র ফিরে এসে বসতে বসতে বলল—'লোকে কি ভাববে সেটা একটা প্রশ্ন বটে। তবে আপনার দাড়ি-গোঁফের জন্য মিলটা খানিকটা অপ্রকট থাকবেই। আমি ভাবছি পুপুর নিজের কথা। ওর যদি কিছু মনে হয় ?'

নীলম গালে হাত দিয়ে বসেছিল, বলল—'আমিও ঠিক তাইই ভাবছিলাম।'

মহানাম বললেন—'এ নিয়ে অত ভাবাভাবির কি আছে ? ও অলরেডি জেনে গেছে।'

নীলম বিবর্ণ হয়ে বলল—'কী বলছো কি তুমি ?'

অরিত্র উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, বলল—'ননসেন্স !'

'ঠিকই বলেছি। সমিদ্ধা এটুকু জেনে গেছে যে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব গভীর। মেয়েটি শুধু প্রখর বুদ্ধিমতীই নয়, খুব পরিপক্ক ওর ইনটুইশন। ভারি আশ্চর্য সৃষ্টি করেছি তো ! অরিত্র আশা করি, অধিকার নয়, কিন্তু সৃষ্টির এই আনন্দটুকু উপভোগ করতে আমাকে তুমি বাধা দেবে না।'

অনিমেষ চোখে মহানামকে দেখছে নীলম। জুলফিতে সামান্য পাক ধরেছে, চুলে দাড়িতেও একটু একটু। অসাধারণ বলিষ্ঠ চেহারা। অথচ আকর্ণ টানা উদাসীন চোখ। সবচেয়ে লক্ষণীয় নাকটা। পাতলা, ভঙ্গুর, যেন মানুষের নয়, এই নাক আর ওই চোখই নীলমকে পাগল করেছিল বলা চলে। মা রেখে গেলেন হোস্টেলে। লোক্যাল গার্জেন মায়ের বন্ধুপুত্র। ছাত্রমহলে নাম অ্যারিস্টটল। কিছুটা উপহাসে, কিন্তু কিছুটা সম্ভ্রমে তো বটেই। হোস্টেল থেকে অ্যারিস্টটলীয় জ্ঞানের সন্ধানে প্রতিদিন মহানামদার কাছে না ছুটলে ঘুম হত না নীলম যোশীর।

সেইসব বেলাভূমিহীন সমুদ্রের মতো দিন ! মুগ্ধ হরিণী চিনতে কতটা সময় নিলেন মহানাম ! মেয়েরা নিজেরাই জানে না বাঞ্ছিতকে পাবার জন্য তারা কি কি প্রয়োগ করে, কতভাবে ! নীলম কি সে সব নিঃশেষে প্রয়োগ করেছিল ? তার তূণে যত তীর, দশ হাতের যত প্রহরণ ! ভরদুপুরের নির্জন বেলায় সেই উদ্ভিন্ন হাসি, নিপুণ ধানুকী তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে শরসন্ধান করছে ! নিশ্বাসে আত্মনিবেদন। মহানাম যদি আবিষ্ট, নীলম নিজে তবে সম্পূর্ণ আত্মভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুগ্ধ, সম্মোহিত। সম্মোহন মহানাম স্বেচ্ছায় করেননি। নীলমের ভাগ্য নীলমকে নিয়ে এ খেলা খেলল। দুটি সম্মোহন মিললে একটি চূড়ান্ত মিলন ঘটেই যায়। এখনও দেখতে পাচ্ছে নীলম বিশাল দুই চোখ তার মুখের ওপর স্থির, নাকের পাটা কাঁপছে, সহসা মহানামের মুখ তার মুখের মধ্যে নেমে এলো। এইভাবে, ঠিক এইভাবে পুপুর জন্ম দিল। মুগ্ধতার মধ্যে, সম্মোহনের মধ্যে, অথচ মোহ রলে কিছু পুপুটার নিজের চরিত্রে আছে কি না সন্দেহ।

নীলমকে কেঁপে উঠতে দেখে অরিত্র বলল—'ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আছে। নীলম,তুমি গায়ে একটা সুতির চাদর-টাদরও দাও।'

মহানাম হেসে বললেন—'এ ঠাণ্ডার কাঁপুনি না রোমাঞ্চের শিহরণ কে জানে অরি।'

অরিত্র গম্ভীর হয়ে গেল। মহানাম যেন প্রমাণ করতে চাইছেন, যতই নীলমের ঠাণ্ডা-লাগার বিষয়ে স্বামী-সুলভ উৎকণ্ঠা সে প্রকাশ করুক, তাকে আরও অন্তরঙ্গভাবে জানেন মহানাম।

নীলম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'তোমাকে চা দিচ্ছি মহানামদা। কিন্তু তুমি আজ খেয়ে যাচ্ছো।'

মহানাম বললেন—'ভরপেট ব্রেকফাস্ট খেয়েছি, দু তিন কাপ চা। আমি আর চা খাবো না নীলম। আচ্ছা এক কাজ করো পাতলা করে লেবু-চা বানিয়ে দাও।'

অরিত্রর খুব অবাক লাগল। অরিকে একবারও না জিজ্ঞেস করে নিজের দায়িত্বে নীলম নেমন্তন্ন করে বসল মহানামকে, যে মহানাম আসলে মহাকাল কি না এখনও স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। খেয়ে যাওয়া মানে অনেকক্ষণ বসা, এষা ফিরবে, গল্প করবে, পুপু ফিরবে, পুপুর সঙ্গে কি কথা বলবেন মহানাম? এমন শনিবারটা মাটি তো হয়ে গেলই, উপরন্তু ফাউ জুটল সর্বক্ষণের উদ্বেগ।

মহানাম বললেন— 'অরিত্র, কিছু গান টান বাজাও।'

'হঠাৎ!'

মহানাম হাসতে হাসতে বললেন—'অপ্রস্তুত হোস্টরা যখন কথা খুঁজে পায় না, এবং কথা দিয়ে নির্বোধ নীরবতা ঢাকবার প্রয়োজন অনুভব করে তখন তো গানই বাজায়। জগজিৎ সিং গোলাম আলি কিম্বা জালোটা যা হোক। গজল কী গজল্লা, বা ভজনের ভুজুং ভাজুং!'

অরিত্র উষ্ণ হয়ে বলল—'আমাকে কি আপনি উপহাস করছেন মহানামদা! উপহাস সহ্য করবার বয়স আমার অনেক দিন চলে গেছে।'

মহানাম বললেন—'দ্যাখো ভায়া, তা যদি বলো, তোমার আমার যা সম্পর্ক তাতে করে ফরাসী কেতার একটা ডুয়েল আমরা অনায়াসেই লড়ে যেতে পারি। সে ডুয়েলের ফলাফল কি হবে আমার ব্যায়ামের চার্টখানা দেখলেই বুঝতে পারবে। না দেখলেও শুধু চেহারাখানা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সে সবে দরকার নেই। কবিদের ওপর দার্শনিকদের জয় ঠিক কোনখানে বলো তো? কবিরা যখন মিথ্যে স্তব-স্তুতি করে বোকা মেয়েদের ভোলায়, দার্শনিকরা তখন সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। মিথ্যে বলে তো লাভ নেই, নীলমকে যেতে না দিলে তুমি যত বড়ই চোর হও, তাকে নিয়ে যেতে পারতে না। তবে একটা মস্ত দোষ তোমার, বড্ড বেশি মিথ্যার আশ্রয় নাও। কবিরা তো এমনিতেই যথেষ্ট মোহন মিথ্যা বলার অধিকার পেয়েছে, তার চেয়েও নীচু স্তরের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তুমি নিজেকে আমার কাছে বড্ডই ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করেছো। নীলমকে তুমি এমন কি বলেছিলে, যার জন্য বেচারি অমন সঙ্কট অবস্থায়ও আমার ওপর ভরসা রাখতে পারল না। দেখো অরিত্র, প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি ঘৃণ্য বলে ভাবতে ভালোবাসি না, আমার ঘৃণাটা উচ্ছেদ করতে তুমি আমায় একটু সাহায্য করতে

পারো না? যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর ঘৃণা নিয়ে বাঁচতে ভালো লাগে না।'

অরিত্র প্রাণপণে সংযত হয়ে বলল—'আপনি কি নীলমের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কোনও কৈফিয়ত দাবী করতে এসেছেন? একযুগ পরে? যেহেতু এককালে আমার মাস্টারি করেছেন কিছুটা এবং যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি আপনার কাছে তাই চূড়ান্ত অপমান সত্ত্বেও কিছু বলছি না। এর চেয়ে বেশি এগোলে কোর্টে যেতে হয়।'

মহানাম বললেন—'ডিফ্যামেশন তখনই হয় অরিত্র যখন অপবাদটা মিথ্যা দেওয়া হয়। তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি মিথ্যার কথাটা সত্যিই বলেছি। একঝুড়ি মিথ্যা দিয়ে তুমি নীলমকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে, আরেক ঝুড়ি মিথ্যা দিয়ে এষাকে আমার কাছে পৌঁছতে দিলে না। সেই মিথ্যেগুলো ঠিক কি বলো তো!'

অরিত্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—'আপনি এতই আত্মতুষ্ট যে নিজের সম্বন্ধে নিজেই কিছু জানেন না। আপনাকে আমাদের সার্কলে সবাই কি বলত জানেন? ওম্যানাইজার। বুঝলেন? ডার্টি ওম্যানাইজার। একটার পর একটা মেয়েকে আপনি নষ্ট করেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের ভাঁওতা দিয়ে। নিজেকে ডন জুয়ান ভেবে যতই আনন্দ পান, অক্সফোর্ডে যে বেলেল্লাপনা চলে, সত্তর দশকের কলকাতায় তা চলত না। নীলমের কাহিনীটা যদি পুরো প্রকাশ করে দিতাম তাহলে নকশালদের হাতে প্রথম খুন হতেন আপনিই!'

মহানাম শান্ত হয়ে বসেছিলেন—অরিত্রের কথা সম্পূর্ণ শেষ হলে বললেন—'আশ্চর্য! তোমাদের সার্কল-এ তোমার মতো প্রতিভাবান নারীপ্রেমিক থাকা সত্ত্বেও তোমার বন্ধুরা আমাকেই ওম্যানাইজার বলে শনাক্ত করল? খুবই আশ্চর্য। সেইজন্যেই তুমি আমার চরিত্রের এই বিখ্যাত দিকটাকে বিষয় করে নীলমকে বেশ কয়েকটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলে সেই সময়ে। না? বাঃ। এবার জটগুলো বেশ সরল হয়ে আসছে। কিন্তু আমি যদ্দূর জানি এষা তোমার জন্য উন্মুখ ছিল, আমাকে বঞ্চিত করবার জন্য তুমি এষাকে উচ্ছিন্ন করলে কেন? এবং তারও পর এষা যখন ওর দারুণ রক্ষণশীল বাড়িতে কোনরকম সান্ত্বনা না পেয়ে ধিক্কারে, লজ্জায়, আমার দ্বারস্থ হচ্ছিল সেখানেও তুমি তোমার গোপন তীর ছুঁড়তে ভুললে না তীরন্দাজ। নীলমকে দিয়ে এষাকে তুললে, তারপর এষাকে দিয়ে আবার··· না না অরিত্র তুমি ঠিক কিভাবে এদের ব্যবহার করেছ আমার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। কি যে তোমার বিচিত্র রসায়ন।'

নীলম পেছনের দরজা দিয়ে ওপরে লেবু আনতে গিয়েছিল। লেবু-চা এনে

রেখে চলে গেল। সে বুঝতে পেরেছে, অরিত্রর সঙ্গে মহানামের কিছু একটা বোঝাপড়া হচ্ছে, এটা হওয়া দরকার। অনেক দিন ধরে বকেয়া হয়ে আছে।

অরিত্র অবাক হয়ে লক্ষ করল—যেভাবে রেগে যাওয়া তার উচিত ছিল সে রাগছে না সেভাবে। চোখা-চোখা কথাগুলো সে বলে ফেলতে পেরেছে। উপরন্তু বিজয় লক্ষ্মী তো তারই দিকে। সে হঠাৎ হেসে বলল—'অনেক রকম অকথ্য অপবাদ তো দিয়ে গেলেন একটার পর একটা। তবুও নীলম আমারই রান্নাঘরে আপনার জন্য রান্না করছে, এবং এষা আমার ঘরে আপনাকে অভ্যর্থনা করে আপনারই জন্য বাজার করতে গেছে।'

মহানাম শব্দ করে হেসে উঠলেন, বললেন—'গুড, গুড। এই তো অরিত্র, তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছ। এইটাই আমি তোমাদের বরাবর বলে এসেছি। ম্যাচিওরিটি দরকার। কি আবেগের। কি বুদ্ধির। এখন হৃদয় এবং বুদ্ধিকে একটা উল্লম্ব রেখায় একত্র স্থাপন করতে পারলেই তোমার বুদ্ধির মুক্তি এবং মুক্তির বুদ্ধি হবে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। ভালো, ভালো। আমার তোমার ওপর বিন্দুমাত্র রাগ নেই।'

এই সময়েই এষা ও পুপু ফিরল। দুজনেরই মুখ লাল হয়ে গেছে রোদে। অরিত্র একটু ধমকের গলায় বলল—'পুপু, তোমাকে কতবার টুপি পরতে বলেছি। এষা, তুমিও তো মাথায় ঘোমটা দিয়ে নিলে পারতে। ভীষণ রোদ। এই রোদে তুমি যে কি করে ঔরঙ্গাবাদ যাবে, আমি তো বুঝতেই পারছি না। ইলোরা তো রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার! আপনি কি বলেন মহানামদা!'

'আমি আপাতত কিছুই বলি না। আগে যাই। আমাকে তো যেতেই হবে।'

এষা বসে পড়ে বলল—'কোথায়? ইলোরায়? আপনি যাচ্ছেন মহানামদা! আমাদের সঙ্গে চলুন তবে। আমরা, মানে আমি তো যাচ্ছিই। আপনাকে যেতে হবেই বলছেন কেন?'

'একটা লেখার জন্য।' মহানাম বললেন, 'তোমাদের প্রোগ্রাম ঠিক কি না জানলে তো···?'

নীলম এই সময়ে বেরিয়ে এসে বলল—'প্রোগ্রাম যা-ই হোক, তুমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছোই।'

পুপু বলল—'ডক্টর রয়, আপনি কি আর্টের ওপর লিখবেন?'

মহানাম ফিরে তাকালেন, বললেন, 'কিসের ওপর লিখলে তুমি খুশি হও?'

পুপু জবাব দিল—'আর্ট অ্যান্ড রিলিজন।'

মহানাম বললেন—'অল রাইট, তাই-ই লিখব। তুমি বাংলা পড়তে পারো?'

পুপু খুব লজ্জিত গলায় বলল—'ভালো করে নয়।'

'নীলম, এটা ঠিক করোনি, মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা যথেষ্ট সুন্দর ভাষা। তোমরা ওকে এটা না শিখিয়ে ভুল করেছ। পশ্চিমবঙ্গে যেসব অবাঙালি থাকেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু যে যার মাতৃভাষা লিখতে পড়তে পারে।'

পুপু বলল—'ওটা আমারই দোষ। আমি শিখেছিলুম ঠিকই, চর্চার অভাবে ভুলে গেছি। দেখে নেবো। আপনি কি বাংলায় লিখবেন?'

মহানাম বললেন না যে এটা একটা বইয়ের পরিকল্পনার অন্তর্গত। বিদেশী পাবলিশারের ফরমাশ। শুধু অন্যমনস্কভাবে বললেন—'তুমি বাংলাটা শিখে নেবে বলছ বলে আমি বাংলাতেই লিখব সমিদ্ধা, তোমায় পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে তুমি এতো ভাবছো কেন?'

পুপু বলল—'আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ইফ আর্ট কুড বি ইন্টারপ্রেটেড অ্যাজ আ কাইন্ড অফ রিলিজন! ডক্টর রয়, আমার মার একটা রিলিজন আছে, ওই ঘরের তাকে কয়েকটি মূর্তিকে ফুল, আগরবাতি নদীর জল—এসব দিয়ে পুজো করে, মানে শী প্রেজ বিফোর দোজ ইমেজেস। আমার বাবার সঙ্গে মার মাঝে মাঝেই ঝগড়া হয়, অলটার্কেশন। বাবা বলে, —'কি পাপ পাপ করো, পাপ আসলে মানসিক অসুস্থতা, আর পুণ্য হল মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় কাথার্সিস, অর্থাৎ নিজের যা ইচ্ছা তাই করা উইদিন লিমিটস। আর যদি কনসেনট্রেশন দিয়ে শান্তি পেতে চাও তো বই পড়ো, ছবি আঁকো, মূর্তি গড়ো, কবিতা লেখো। এখন মার রিচুয়াল আর বাবার রিচুয়ালের মধ্যে কি সম্পর্ক জানতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। মানে আই ফীল ইট ইজ অফ ভাইট্যাল ইমপর্ট্যান্স টু মি।'

অরিত্র নীলমের দিকে চাইল। এসব কথা নিয়ে মাঝে-মধ্যে তাদের মধ্যে লড়াই হয়েছে বটে, কিন্তু পুপু এতো আগ্রহ নিয়ে সেসব শুনেছে এবং এইভাবে গুছিয়ে সে বিতর্কের সারবস্তুকে অনায়াসে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে এ কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মহানাম খুব অবাক হলেন। তাঁর চোখ কেন জানি আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। তিনি বললেন—'তুমি নিজে রিলিজন নিয়ে কি ভাবো? তোমার নিজের কোনও রিলিজন আছে পুপু?'

'আছে ডক্টর রয়। ধরুন আমি কনসেনট্রেশন করি বইয়ে, বা ড্রয়িং-এ। রিচুয়ালসও আছে কিছু যার মধ্যে দিয়ে আমি মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধার করি যেমন ব্যায়াম, গান শোনা, পিকচার গ্যালারি, আর্ট এগজিবিশনে যাওয়া, ডক্টর রয়,আমি

রোজ নিয়ম করে কাউকে না কাউকে কিছু-না-কিছু দিই। ভেতরটা কিরকম একটা হয়ে যায় বোঝাতে পারব না, ইট মাস্ট বী আ রিচ্যুয়াল।'

পুপুর বাবা মা ভীষণ অবাক হয়েছে। পুপু আজকে যা বলছে তা তার অন্তর্জীবনের কথা। কখনও বলেনি। কখনও আলোচনা করেনি। কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। অরিত্র অনুভব করছে তার ভেতরে অভিমান জমছে। নীলমের কেন খুশি লাগছে সে জানে না। এবার পুপ্‌কে খুব কষে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে কেন জানে না। স্নেহ যেন শতধারায় ছুটে যেতে চায় আঠার বছরের ওই তরুণ মুখটির দিকে।

মহানাম হেসে বললেন—'খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে আথেন্সে যখন পেরিক্লিস, সেই সময়ে ফিডো বা জেনোফোন নামে কোনও ভদ্রলোকের বাগানবাড়িতে সান্ধ্য মজলিশ বসেছে ধর। সমিদ্ধা, সেখানে তোমার বয়সের কিশোররা উপস্থিত রয়েছে অনেক। কিশোরী অবশ্য নেই একটিও। চলো সেই মজলিশে একমাত্র তরুণী সভ্য বলে তোমাকে আমরা নিয়ে যাই।'

পুপু বলল—'সক্রেটিস থাকতেন, না ? আর প্লেটো ? ডক্টর রয়,আপনি সেই মজলিশে কার ভূমিকা নেবেন ? প্লেটোর ?'

মহানাম বললেন—'একেবারেই না, আমিও একটি জিজ্ঞাসু তরুণ, আমার নাম যা খুশি হতে পারে, ইউরিপিদিস টিস যা হোক।'

নীলম হঠাৎ বলল—'অতবড় একজন মানুষকে কি তখন থেকে ডক্টর রয়, ডক্টর রয় করছিস পুপু। কি তোদের জেনারেশনের কালচার আমি কিছুই বুঝি না।'

'বাঃ। কি বলব তাহলে বলে দাও—।' পুপু বালিকার মতোই মায়ের তিরস্কার মেনে নিল—'জেঠু, না, কাকু, না, মামু ? কি ?'

মহানাম অট্টহাস্য হেসে বললেন—'জেঠু, কাকু, মামু ডাকার চেয়ে আমাকে ও বরং না-ই ডাকলো নীলম। হোয়াটস রং উইথ ডক্টর রয় ?'

॥ ১১ ॥

বিরাট রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে আলো-পিছলোনো গাড়িখানা নিঃশব্দে প্রিয়লকরনগরের রাস্তায় পাশ ফিরছে। খুব রাজকীয় এই ধীর, শব্দহীন পাশ ফেরা। কিন্তু কেমন গা-ছমছমে। গাড়িটা চেনা নয়, কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশয় নেই নীলমের এ গাড়ি বিক্রমের। কোনও গাড়িই বেশিদিন রাখে না ও, দুটো সব

সময়ে মজুত থাকে স্বামীস্ত্রী দুজনের ব্যবহারের জন্য। নিজেরটা কিছুদিন অন্তরই বদলায় বিক্রম। সীমা যেটা ব্যবহার করে সেই স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড বোধহয় সে গত দশবছর ধরে ব্যবহার করছে। বিক্রমের প্রথম গাড়ি। এটা নিশ্চয় বিক্রমের সাম্প্রতিকতম সংগ্রহ। কনটেসা মনে হচ্ছে। ভেতরে সীমা আছে কি না কে জানে। দরজা খুলে সে পোর্টিকোয় দাঁড়াল। সকালবেলার ভেজানো চুল এখন শুকিয়ে গেছে। ক্লিপে আটকানো চুল। এষা আসার পর থেকে নীলম সকাল বিকেল শাড়ি পরেই থাকে। শুধু রান্না করবার সময়ে একটা এপ্রন গলিয়ে নেয়। ফিকে গোলাপি রঙের টাঙাইল শাড়ি, নীলম খুব সলজ্জ সাজ সেজেছে।

সীমা ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—'হ্যাল্‌ লো !' এক ঝটকায় দরজা খুলে নেমে পড়ে এগিয়ে এল—'চিনতে পারছো ড্রেসটা ? নীলমদি !'

নীলম বলল—'কেন, আমার চেনবার কথা ?'

বাঃ। ছ সাত বছর আগে পুজোর সময়ে বানিয়ে দিয়েছিলে।'

ম্যাজেন্টা রং সিল্কের ওপর অলিভ গ্রীন সাটিন পাটকরা কাঁধের কাছ থেকে প্লিট দিয়ে দিয়ে নেমে এসেছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। তার ওপর বাদলার কাজ। পায়েও দুরঙ।

নীলমের মনে পড়ল—সাদাতে কালোতে অবিকল এইরকম একটা পুপুকেও করে দিয়েছিল। খুব পছন্দ ছিল ওর সেটা। পরে পরে কবেই ছিঁড়ে ফেলেছে। সে আশ্চর্য হয়ে বলল—'সাত বছর বোধহয় হল, তুমি এখনও এটাকে এইভাবে টিকিয়ে রেখেছো ?'

সীমা বলল—'তার আগের বছর, তার আগের বছর, তারও আগের বছরের জিনিসও নতুনের মতোই আছে। নষ্ট হবে কেন যত্ন করলে ? এতো সুন্দর ড্রেস। প্রথম প্রথম পার্টি ড্রেস হিসেবেই ব্যবহার করেছি। এখন এইরকম দূরপাল্লা যেতে হলে পরি, সঙ্গে নিই।' সীমার কথার ভঙ্গিতে খুব আত্মপ্রসাদ। বলল—'নীলমদি, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। একটু বোধহয় রোগা হয়েছো। ভালো লাগছে। এটা কি শাড়ি ? রাজকোট ?'

'উঁহু। টাঙাইল !'

'টাঙাইল ? একদম বোঝা যাচ্ছে না তো ? কি মিহি খোলটা। কোত্থেকে পেলে গো ?'

নীলম বলল—'আমার বন্ধু যে এসেছে, সে-ই এনেছে।'

চওড়া টাই হাঁকিয়েছে বিক্রম। স্বভাব-ফর্সা রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। গাল-টাল থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। নীলম বলল, 'কি ব্যাপার, শীল

সাহেব ? সত্যি সত্যিই যে সাহেব হয়ে যাচ্ছেন দিন কে দিন ?'

সীমা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল—রাখো রাখো, ওসব অ্যালকহলিক রঙ। প্রথমে জেল্লা দেবে, তারপর লিভার অ্যাফেক্ট করলেই অ্যাফ্রিকান।'

গাড়িটা থামিয়ে রেখেছিল বিক্রম। পার্ক করবার জন্য পেছোতে পেছোতে ভরাট গলায় বলল—'খবর্দার গিন্নি, লিভার তুলে কথা বলবে না। তারপর ভাবী তোমার বাড়ি তো গেস্টে গেস্টে উপছে পড়বার কথা, এমন বাসি-বিয়ের কনের মতন একলা দাঁড়িয়ে ?'

বিক্রম দুহাত ঝাড়তে ঝাড়তে নেমে এলো।

নীলম বলল—'উপছে পড়বার কথা ! সে আবার কখন বললাম। একজনই তো !'

'বাঃ সেই একজনই যে একশজন এটুকু রীডিং বিটুইন দা লাইন্স বিক্রম শীলের করবার ক্ষমতা জরুর আছে। তেমন তেমন আদুরে-বিড়ালের মতো টেঁপা-টেঁপি গোছের কেউ এলে কি আর তুমি অধীনকে স্মরণ করতে ? এ নিশ্চয়ই বাঘিনী।' লাফিয়ে পোর্টিকোয় উঠে বিক্রম দু হাত দু পাশে রেখে বাঘিনীর মুদ্রা করল।

সীমা অপাঙ্গে দেখে বলল—'নীলমদির বন্ধু বাঘিনী কিনা জানি না, তবে তুমি যে বাঘের বেশে শেয়াল এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

বিক্রম ছদ্ম রাগে নীলমের কাছে এগিয়ে এসে বলল—'কথাটা তোমার বোন বা বন্ধু না জাকে ফিরিয়ে নিতে বলো ভাবী, নইলে ভীষণ ঝগড়া হয়ে যাবে, শেয়াল অতি ছ্যাঁচড়া জীব।'

নীলম হাসি চেপে বলল—'ঝগড়াটা কার সঙ্গে করবে ? আমার না সীমার ?'

'তোমার সঙ্গে ঝগড়া ?' বিক্রম হাসিতে মুখ ভরে বলল—'আহাহা হা, ভাবী, সে তো সব সময়েই প্রণয়ের ঝগড়া। মানভঞ্জন, জয়দেব, গীত গোবিন্দ। আমার কি অত সৌভাগ্য হবে ?'

দিনটা চমৎকার। রোদ এখনও গা-জ্বালা হয়ে ওঠেনি। আকাশে আজ পাতলা মেঘ আছে মনে হয়। তাই রোদের মধ্যে একটা জ্বালাহীন আলো-আলো ভাব।

বাঁক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অরিত্রর স্কুটার এসে পৌঁছল। অরিত্র বলল—'তুমি নেমে যাও এষা, তোমাকে থলে নামাতে হবে না। আমি বৌ করে একবার মোড়ের দোকান থেকে আসছি।'

'কি সিগারেট ?'

অরিত্র হেসে ঘাড় নাড়ল। মুখ ঘুরিয়ে আবার চলে গেছে। বিক্রম বলল—'চৌধুরীদা কি আমায় দেখে পিঠটান দিল নাকি ভাবী ?'

এষা নেমে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন এষা পুপুর সঙ্গে বাজারে বেরোচ্ছে সকালে। আজ অরি ধরেছিল মুরগী আনতে ওর সঙ্গে এষাকে যেতেই হবে। অত বড়লোক প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে বসেছিল। এষার যত কথা নাকি নীলমের সঙ্গে, পুপুর সঙ্গে, অরি কি কেউ না ? বানের জলে ভেসে এসেছে ?

নীলম বলেছিল—'বাব্বাঃ, স্টেশন থেকে প্রিয়লকরনগর এই ন দশ মাইল পথ নিয়ে এলে সেদিন একলা, পাটিলকেও তো পথের কাঁটা সরিয়ে দিলে তাতেও তোমার প্রাইভেট কথা শেষ হয়নি ?'

সবাই হাসছিল। পুপু সুদ্ধু।

'আমার কথা কোন দিন শেষ হবে না', অরি গোঁজ হয়ে বলেছিল।

পুপু বলছিল—'মাসি, মাসি, লুক হাউ হী ইজ পাউটিং ! হী ইজ চেঞ্জিং কালার। অ্যাবসল্যুটলি গ্রীন নাউ উইথ জেলাসি। যা হয় কিছু করো মাসি। এ দুর্দশা দেখা যায় না।'

এষা বলল—'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে মুরগীর ছিটেফোঁটাও যেন আমি দেখতে না পাই। আমাকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।'

এষা একদম মাংস খায় না। কিন্তু রাঁধতে ভালোবাসে। রবিবার ও রাঁধবে বলছিল কিছু একটা নতুন পদ। নীলমের দিকে তাকাল এষা একবার, বলল—'নীলম, যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এসে যাবো। ভেবো না।'

'না ওইভাবে না'—অরি তখনও গোঁজ।

'কি হল আবার ?'

'ওকে সেজে আসতে হবে। গোল্ডেন সিল্কের শাড়ি। চুলে কায়দাকরা, রঙ-টঙ যা যা সব মাখো তোমরা, সেসব মাখতে হবে।'

'কি মুশকিল ! গোল্ডেন সিল্কের শাড়িটা আমার লাট খেয়ে আছে। ইস্ত্রি হয়নি। সেদিন ট্রেনে পরেছিলুম', এষা চলে গেল।

ঠিক দশ মিনিট পর কালো টিপ ছাপ গরদ রঙের পাড়হীন শাড়ি পরে, মাথার চুলে আলগা খোঁপা বেঁধে এষা বেরিয়ে এলো। কানে টলটলে মুক্তো। ঠোঁটে হালকা রঙ।

এখন ওকে সেই বেশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বিক্রম। পুরো একটা রসালো ক্রিমরোল। মিষ্টি ননীতে ভরা ভেতরটা, সুগন্ধে জিভে জল আসে। সূর্য সামান্য সেঁকেছে। কি নিপুণ পরিমাণজ্ঞানের সঙ্গেই যে সেঁকেছে। থাউজন্ড আই

ল্যান্ড ড্রেসিং ছড়ানো চমৎকার স্যালাড এক ডিশ। মুচমুচে চিবুক। চীজ-স্ট্র-এর মতো নাকখানা, ছোট্ট ছোট্ট নাগপুরী কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট। কানে অয়েস্টার, গালে ক্রিম পাফ কুকিজ। সব মিলিয়ে আবার ডুবো-ডুবো মাখনে বেশ নরম রসালো করে ভাজা লম্বা সোনালি বেকন এক টুকরো।

নীলম বলল—'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি বিক্রম শীল। বম্বের নাম্বার ওয়ান বিল্ডিং অ্যান্ড রোড কনট্র্যাকটর। আর ইনি তাঁর ভাগ্যবতী পত্নী সীমা। তোমরা তো বুঝতেই পারছ এইই এযা খান, আমাদের বন্ধু।'

'তোমাদের বন্ধু?' সীমা চোখ বড় বড় করে বলল। নীলম অস্বস্তিতে হাসছে। অরিত্র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলল—'এজ ক্যানট উইদার হার, নর কাস্টম স্টেল হার ইনফিনিট ভ্যারাইটি।' তারপর বিক্রমের দিকে কূট চোখে তাকিয়ে বলল—'কতক্ষণ এসেছ?'

বিক্রম কান ছোঁয়া হাসি হেসে বলল—'আরে দাদা, ঘাবড়াইয়ে মৎ, আমি জাস্ট এইমাত্র এসে পৌঁছলাম। এখনও কিছু গড়বড় করবার মওকা পাইনি, এযার দিকে ফিরে বলল—'বুঝলেন এযাজী, বিক্রম যায় বঙ্গে, বিক্রমের স্টেজ যায় সঙ্গে। বিক্রম এসে গেলে সেখানে আর সব জেন্টলম্যান ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যায়', বুকটা চিতিয়ে বিক্রম বলল—'তাই এইসব আতুপুতু জেন্টলম্যানরা আমাকে পছন্দ করে না একবারে। বলতে বলতে দু হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে বিক্রম গেয়ে উঠল—

"এলো এলো এলোরে দস্যুর দল
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার ঢল—এল এল।"

এযা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল—'অদ্ভুত ভালো গলা তো!'

বিক্রম গাল কাত করে অরিত্রর দিকে চেয়ে হেসে উঠল—'দেখলেন দাদা, দেখলে ভাবী, ফার্স্ট রাউন্ডটা কি রকম ফটাস করে জিতে গেলাম! আই কাম, আই সি, আই কঙ্কার।'

তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অরিত্র সীমার দিকে তাকিয়ে বলল—'তারপর সীমাচলম, তোমার খবর বলো।'

সীমা বলল, 'বাব্‌বাঃ! আমি আবার খবর বলব কি? আমি তো জন্মের মতই এই রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হয়ে রয়েছি। আমার কোনও আলাদা খবর হয়?' বিক্রমের দিকে তাকিয়ে সীমা বলল—'আমাদের আগে সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিতে হবে তো?'

বিক্রম হাত নেড়ে বলল—'ওসব তোমার কাজ তুমি করো গে যাও। আমি

এখন একদিকে নীলম ভাবী আর একদিকে এযাজীকে নিয়ে জমিয়ে বসব। সামনে বসে চৌধুরীদা জুলজুল করে দেখবে।'

অরিত্র ছাড়া উপস্থিত সকলেই হাসতে পারল। বিক্রম প্রথম তার ব্যবসা শুরু করে পুনেতেই। সামান্য পুঁজি, আর খানিকটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিল। অরিত্র ওকে অর্ডার পেতে প্রচুর সাহায্য করে। হাসি-খুশি জমাটি স্বভাবের ছেলে বলে চট করে ওকে পছন্দ হয়ে যেত সবারই। সে সময়ে অরিত্রর বাজার হাট, নীলমের সখের সভা-সমিতি, ওদের সিনেমা দেখা, ছোটখাটো ভ্রমণ সব কিছুতে বিক্রম-সীমা থাকতই। পুপুকে একরকম কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে বিক্রম। কিন্তু অরিত্রর ধারণা, ধারণা কেন, দৃঢ় বিশ্বাস ওকে যে আস্থা ওরা দিয়েছিল তার মর্যাদা বিক্রম রাখেনি, নীলম ঠিক কতটা জড়িত ভাবতে গেলে অরিত্রর ভুরু কুঁচকে যায়। হার্ট আর ফুসফুসের মধ্যবর্তী অলিন্দটুকুতেও প্রচণ্ড টান পড়ে, ভাবতে সে চায় না তাই। কিন্তু নীলম ওকে আড়াল না করলে অরিত্র একসময়ে ওকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবার কথাও ভেবেছিল, যাচ্ছেতাই অপমান করে। পারেনি। পুপু একটা মস্ত বাধা ছিল। সীমাটাও খুব নির্দোষ, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, ওকেও আঘাত দেবার কথা দুবার ভাবতে হয়। বিক্রমের ব্যবসা এখন ছড়াতে ছড়াতে মেন অফিস বম্বের শহরতলিতে চলে গেছে। থানে অঞ্চলে তার প্রাসাদোপম বাড়ি। কিন্তু পুনার ফ্ল্যাটও ছাড়েনি সে। অরিত্রদের সঙ্গেই এখানে জমি কিনেছিল। কয়েকটা ব্লক পরেই, ডি ওয়ান এ ফ্ল্যাট রয়েছে ওর। কেয়ারটেকার সহ। এলে সেখানেই থাকে। আসতে হয়ও মাঝে মাঝে।

একহাতে চাবি, আর একহাতে একটা সুটকেস তুলে নিয়েছে সীমা। কাঁধে ভারী ব্যাগ। অরিত্র বলল—'চলো সীমাচল, আমি তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

সীমা কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে বলল—'দরকার নেই অরিদা, আপনি বসুন না।'

'তা হয় না সীমা। বর্মা-চীন এসব জায়গায় শুনেছি মেয়েদের মোটঘাট বইবার ট্র্যাডিশন ছিল, আমাদের অভ্যাস অন্যরকম।' ভালোমতো ঠেস দেওয়া হল মনে করে সে সীমার সুটকেসটা ছিনিয়ে নিল।

বিক্রম হা-হা করে হেসে উঠে বলল—'যত গালাগালই দিন দাদা, বিক্রম শীল নড়ছে না। টাকা এনে দিচ্ছি ছপ্পর ফুঁড়ে, এতখানি পথ ড্রাইভ করে পৌঁছে দিলুম। আবার মোট বওয়াবওয়ি কি? অত পারব না।'

অরি সীমার কাঁধে হাত রেখে বলল—'চলো সীমা।'

সীমা মেয়েটি খুব পাতলা, ছোটখাটো। ফোলা-ফোলা সাধারণ মুখচোখের মেয়ে। সাজে নিখুঁত। বম্বে পুনার বড় বড় বিউটি পারলারে গিয়ে গিয়ে মাথা

থেকে পা অবধি পরিচ্ছন্ন সাজগোজের সমস্ত গোপনকথা ওর জানা হয়ে গেছে মনে হয়। কথাও বলে চটপট। কোথাও কোনও জড়তা নেই। খালি অরিত্রর মনে হয় সীমা একটা বর্ণিল বুদবুদ। যে কোনও সময়ে ফট করে ফেটে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এতো ভঙ্গুর, এতো শূন্যতা দিয়ে ফাঁপানো। সে শূন্যতা চরিত্রের না অভিজ্ঞতার অতটা বলবার মতো ভালো করে সীমাকে সে কখনই জানবার তাগিদ অনুভব করেনি। খুব মমতার সঙ্গে ওর কাঁধে হাত রাখল অরি। পাতলা কাঁধ, ভয় হয় সামান্য চাপেই না ভেঙে যায়। একে সুটকেস হাতে দিয়ে পাঠাল কি করে বিক্রমটা? জানোয়ার একটা। একে এতো কষ্টই বা দেয় কি করে লোকটা? জানোয়ারও নয়, পিশাচ।

সীমা বলল, 'কি এতো ভাবছেন অরিদা!'

'কিছু না। তোমরা কি কেয়ার-টেকারকে খবর দিতে পেরেছো?'

'ইদানীং আমাদের তো আলাদা কেয়ার-টেকার নেই। ডি ওয়ানের কমন দারোয়ান মোহন, ওরই কাছে আমাদের চাবি থাকে। ওকে ফোন করেছি কাল। ও-ই সব পরিষ্কার করে রাখবে। আপনাদের বাড়ি তো ছোট। ইচ্ছে করলে এযাদিকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারেন। একটা বেডরুম পুরো পড়ে থাকবে।'

—'না, না।' আতঙ্কের সুরে অরিত্র বলল —তারপর একটু শান্ত হয়ে বলল—'এযা আমাদের বাড়িতে এসেছে। তোমাদের ওখানে পাঠালে কি মনে করবে বলো তো? তার কোনও দরকারও নেই। আর এম টি ডি সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি—কাল পরশুর মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা।'

'কোথায় কোথায় যাচ্ছেন? কে কে?'

ওদের বাড়ি এসে গিয়েছিল। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে, দরজা খুলে বেশ খুশি হয়ে উঠল সীমা। বলল—'বসুন অরিদা, আমি একটু মোহনের সঙ্গে কথা বলে আসি, দরকার আছে।'

একটু পরেই ফিরে এলো সীমা। অরি দেখল ওর মুখে একটা ছায়া আসা-যাওয়া করছে। বলল—'অরিদা, ওযে ইতিমধ্যে একবার এসেছিল আপনি জানতেন?'

অরিত্র বলল—'না তো! আমাদের বাড়িতে তো দেখি নি! রাস্তা ঘাটেও না।'

—'মোহন বলছে সাহেব এসেছিলেন।'

অরি বুঝতে পারছে সীমার গলা শুকিয়ে গেছে। সীমা চট করে হল পার হয়ে

ওদিকে চলে গেল। শোবার ঘরের দরজাটা খুলল। অরির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। অতি ভঙ্গুর এবং অসহায় বালিকার মতো দেখাচ্ছে। কি খুঁজছে সীমা? বিক্রম কি কোনও কিছুর প্রমাণ রেখে যাবে? গেলেই বা কি? সীমার কিছু করার আছে?

অরিত্র বলল—'কি করছ সীমাচল? এবার কি আনপ্যাক করবে? আমি সাহায্য করতে পারি।'

সীমা পেছন ফিরেই বলল —'না আমি করে নিচ্ছি। সবই ঠিক আছে। কিচেনটা একবার দেখে আসি।'

রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলো সীমা। আসলে ও ছটফট করছে। বলল—'আপনি বরং চলে যান অরিদা, বাড়িতে আপনার বন্ধু এসেছেন, আমি যেটুকু গুছিয়ে নেওয়ার নিচ্ছি।'

অরিত্রর মায়া হচ্ছে খুব, বলল—'আমার তাড়া নেই। দুজনে এক সঙ্গেই ফিরব। তোমার এতো কি করার আছে? চট করে নাও। নীলমের কাছে গিয়ে চা-টা খাবে। তেষ্টা পেয়েছে তো?'

সীমা ওয়ার্ডরোব খুলে নিজেদের জামাকাপড়গুলো টাঙিয়ে রাখল। ফ্রিজ বোঝাই মদ এনে সাজিয়ে রেখেছে মোহন। কৌটোর খাবার। চট করে একটু কফি তৈরি করে ফেলল সে, অরিত্রকে অবাক করে দিয়ে রান্নাঘর থেকে ধূমায়িত কফি নিয়ে ফিরল। সামনে রেখে বলল—'তেষ্টা আসলে আপনারই পেয়েছে না অরিদা?'

'তোমার পায়নি?'

'ভীষণ ভীষণ। এই কফি খেলেও আমার গলা ভিজবে না অরিদা' সীমাচলম্ কি রকম অদ্ভুত গলায় বলল।

'ওঃ ভুলে গেছি', সে আবার উঠে গেল রান্নাঘরে—এক প্লেট বিস্কুট নিয়ে ফিরল।

'কফির সঙ্গে বিস্কিট নিন অরিদা, শুধু খাওয়া ঠিক না। তারপর বলুন কে কে যাচ্ছেন, কোথায় কোথায়।'

'খুব সম্ভব আমরা কাল রাতের বাসে ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছি। ভোরে পৌঁছে ওদের টুরিজম-এর বাসটা নেবো। দুটো দিন। প্রথম দিন ইলোরা, দ্বিতীয় দিন অজন্তা। এই তো আপাতত প্রোগ্রাম। যাচ্ছি আমি, এযা, আর আমাদের এক পুরনো মাস্টারমশাই ডক্টর রায়, উনিও রয়েছেন এখন পুনেয়।'

'নীলমদি যাচ্ছে না? পুপু?'

'নাঃ। নীলম যাচ্ছে না পুপুর পরীক্ষা বলেই। পুপুর এ সেমিস্টারের পরীক্ষা রয়েছে।'

'কালই যদি আপনারা বেড়াতে বেরোন তো আমাদের ডেকে আনার কি দরকার ছিল?' অনুযোগের সুরে বলল সীমা।

'নীলম ঠিক কি ভেবে কি করেছে আমি তো জানি না। তাছাড়া দুদিন পরই তো আমরা ফিরে আসছি। তোমরাও তো যেতে পারো।'

'বাঃ, আমরা টিকিট কি করে পাবো? চলুন, তাহলে ওকে এক্ষুণি গিয়ে বলি।'

অরিত্রর মনে হল ও একটা দারুণ উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে। বিক্রমকে সঙ্গে নিতে ওর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। অথচ ওরা সবাই চলে যাবে বিক্রমকে পেছনে ফেলে, আবারও ওর ঘরসংসার প্রায় বিক্রমের কাছে গচ্ছিত রেখে, সেটাও তো সম্ভব নয়।

হঠাৎ অরিত্র খুব চঞ্চল বোধ করল। ভেতরের চঞ্চলতাকে যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে সে বলল—'সীমা, তোমার যদি খুব দেরি থাকে তো আমি এগোচ্ছি।' উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল—'তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।'

অরিত্র চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিল সীমা। দামী দামী জিনিসে ভর্তি হলঘর। মাঝখানে ঝাড়বাতি জ্বলছে। আলো ছড়িয়ে পড়েছে এনসাইক্লোপিডিয়ার সেটের ওপর ঘুরন্ত বুককেসে, প্রত্যেকটা দেয়ালে একটা করে মূর্তি কিম্বা গাছ। মাঝে মাঝে নীচু সোফা। মোরাদাবাদী পেতলের পরাতের মতো টপওয়ালা তিনপায়া টেবিল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোনও শিল্পগতপ্রাণ মানুষের ঘরে এসে পড়া গেছে। কিন্তু এ বাড়ির মালিক মোটেই শিল্পরসিক-টসিক নয়। মালকিনও এসব খুব বোঝে না। যে গৃহসজ্জাবিশারদকে দিয়ে এটা করানো হয়েছিল সে তার সাধ-না-মেটা ভালোবাসাগুলো দিয়ে ঘর সাজিয়েছে। গৃহসজ্জার একটা কোর্স সীমাও নিচ্ছিল, তার কিচ্ছু করবার নেই বলে। কিন্তু যতক্ষণ সে তার কোর্স নিয়ে ব্যস্ত থাকত, বিক্রমের বিপথগামিতার সে সময়টা ছিল সুবর্ণসুযোগ। তাই মাঝপথে কোর্স ছেড়ে দিয়ে আবার বাড়ি এসে বসল সীমা।

সীমা দেখল সে কাঁদছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, বুক জ্বালা করছে। অথচ সেটা সে প্রথমে বুঝতেই পারেনি। শোবার ঘরের মধ্যে সে এমন কিছু কিছু জিনিস পেয়েছে, তাতে তার স্বামীর বিশ্বস্ততাহীনতার খবর আবার নতুন করে তার কাছে পৌঁছেছে। মোহন প্রাণ গেলেও কিছু বলবে না। যেটুকু বলেছে না

জেনে বলে ফেলেছে।

সীমা বাথরুমে গিয়ে তার গোলাপি বেসিনে বিদেশী সাবান দিয়ে মুখ ধুল। ফেনায় ফেনায় মুখটা ঢেকে যেতেই সামান্য চোখ ফাঁক করে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। বাথরুমের গোলাপি টালি, মৃদু আলোর মহিমায় আয়নার ফেনা-ঢাকা মুখটিকে কোনও স্বপ্নের মুখ বলে মনে হচ্ছে, ফেনাগুলো ধুয়ে দিলে হয়ত বেরিয়ে পড়বে কোনও অসাধারণ মায়াবিনী কুহকিনী ব্যক্তিত্বময়ী মুখ যার চোখের ইঙ্গিতে পৃথিবীতে ভাঙাগড়া হয়। এদের কথা সবাই জানে, সীমাও জানে। ক্লিওপেট্রা, নূরজাহান, এমন কি মাতাহারি। প্রত্যেকবার মুখে সাবান লাগালে সীমার এদের কথা মনে পড়ে। আস্তে আস্তে খুব অনিচ্ছুক ভাবে মুখে জল লাগাতে লাগাতে সীমা দেখতে লাগল কি ভাবে একটি আশাহত বালিকা মুখ ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে।

গাছের ওপর দাদা বসে আছে। পেয়ারা ফেলছে আর বলছে—'নে সীমা, ধর।' কিছুক্ষণ পর সীমা বলছে—'আমিও গাছে চড়ব।'

দাদা বলছে—'হুঃ। উনি গাছে চড়বেন! যেখানে আছিস সেখানেই থাক বলছি।' আসলে মাত্র দু বছরের বড় দাদাকে সব সময়ে উঁচুতে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল সীমা। নিজের মনের মধ্যে সবসময় একটা হীনতাবোধ। যেন দাদা চিরকাল উঁচুতে, দাতা। সে চিরকাল নিচুতে; গ্রহীতা। সেদিন পেয়ারা গাছে জোর করে উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড কাঠ-পিঁপড়ের কামড়ে পা ফুলে ঢোল। দাদা বলছিল—'আর কোনদিন উঠবি আমার গাছে? উঠবি আর? যা রয় সয় তাই করিস।' সীমার বাবা আসছেন সপ্তাহশেষে। কিম্বা চলে যাচ্ছেন, ট্রেনে। জমি থেকে উঁচুতে। সীমার থেকে উঁচুতে। অনেক দূর থেকে আসছেন, অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা বা দাদা কাছাকাছি থাকলেই সব নিরাপদ। আর যেন ভয় নেই। কেউ আর কিছু করতে পারবে না। বিক্রমের পাশেও সীমা একটা অণুর মতো। বিক্রম যা যা করবে সীমাকে তা নিঃশব্দে মেনে নিতে হবে। নয়ত এই নিরাপত্তার বৃত্ত থেকে সে দূরে, বহু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়তে পারে। সে এক মহা ভয়। বিক্রম কী আশ্চর্য! ছিল মফঃস্বলের গানের মাস্টার। জলসায় গান গাইত খোলা গলায়, আর আশপাশের বাড়ি থেকে ঢালাও নেমন্তন্ন পেতো। মগরা থেকে বালি সাপ্লাই দিতে আরম্ভ করল। লরিও নিজের না। বালিও নিজের না। একদম খালি হাতে শুধু কথার জোরে কনট্র্যাক্টগুলো যোগাড় করত। তারপর সীমাকে নিয়ে সাহসে বুক বেঁধে একেবারে বম্বে মেল। কী অসাধারণ শক্তি, সাহস, ক্ষমতা! সীমা বম্বে

ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, পুনেতে নিউট্রিশন কোর্স করেছে, বিউটিশিয়ান্‌স্ কোর্স করেছে, কিন্তু বিক্রমের সমকক্ষ হবার তার সাধ্যও নেই। সেই ছোটবেলার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরই জুটল, খালি রূপকথার মিলনান্ত শেষ অংশটায় একটা চিরকালীন প্রশ্নচিহ্ন থেকে গেল, যার জন্য সীমা মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে যায়, মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছেঁড়ে, এত ব্যথা, এত অস্বস্তি তার সারা শরীরে, মনে। ছেলেটাকে পর্যন্ত কিছুতেই কাছে রাখে না বিক্রম, প্রথমে উটিতে পড়াচ্ছিল, এখন পাঠিয়ে দিয়েছে সুদূর দেরাদুন।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিনের বেলায় অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে দূরে শুধু অরিদার বাড়ির আলোর দিকে চোখ রেখে যেন ভূতাবিষ্টের মতো পথ চলতে লাগল সীমাচল। নীলমদি কি সুখী! অরিদা কি ভালো! কত স্নেহ, মায়া, মমতা! অরিদা বরাবর তাকে ভালোবাসেন। যখন তারা পুনেয় থাকত, পাশাপাশি বাড়িতে! অরিদার এতো বাড়বাড়ন্ত হয়নি, বিক্রমের তো হয়নি বটেই! অরিদা নিজের বোনের মতো স্নেহ করেন সেই থেকে। আজ এই সবাই বসে গল্প করছে। বিক্রমের অবহেলা স্পষ্ট। এই অপমানের মধ্যে অরিদা তার সুটকেস তুলে নিয়ে সঙ্গে এলেন, এতক্ষণ বসে রইলেন। মনে মনে সীমার জীবনের দুঃখ কি কিছু বোঝেন। বুঝলেও প্রকাশ করেন না। খালি স্নেহ আর দরদ দিয়ে মুছে দিতে চান। সীমার মনে হল তার বুকের সমস্ত কান্না অরিদাকে লক্ষ্য করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। ওইখানে, একমাত্র অরিদার ওই দরদভরা বুকেই এই অপমান, অবহেলা, নিত্যদিনের এই দুঃসহ ঈর্ষার জ্বালা, যন্ত্রণার স্থান হবে।

॥ ১২ ॥

'টিকিট না পাই, কোই বাত নেই, গাড়িতেই যাবো', হেঁকে বলল বিক্রম, 'তোমরা রাত্তিরে কেন ব্যবস্থাটা করলে বুঝলুম না।'

'ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাবার জন্যে। ইলোরা অজন্তায় প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে হবেই। তার ওপর এতোটা রাস্তা গরমে যেতে হলে নেহাত নিরেট মাথা ছাড়া আর সব মাথাই ধরবে'—অরিত্র জবাব দিল।

নীলম অনেকক্ষণ থেকে চুপ করে বসে আছে। এষা রান্নাঘরে। মুরগী রান্নার খুব সুবাস বাতাসে। সীমা আর অরিত্র বিক্রমের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে মত্ত। অরির ইচ্ছে বিক্রম চেষ্টা করুক, যদি টিকিট পাওয়া যায়, নয়তো একটা ল্যান্ডরোভার ভাড়া করে নিক। বিক্রমের গোঁ সে ওই গাড়ি নিয়েই অরিত্রদের

লাক্সারি কোচের পেছন পেছন যাবে। নীলমের মনে হচ্ছে সে কারও বাড়ি বেড়াতে এসেছে। অল্প-চেনা কারো বাড়ি। এখনও আড় ভাঙেনি। ওদের আগ্রহের সঙ্গে নিজের আগ্রহ মেলাতে পারছে না। ভীষণ একটা একাকিত্ব তার চারদিকে বৃত্ত রচনা করছে। শীগগীরই এমন একটা সময় আসবে যখন সেই যাদু-বৃত্তের মধ্যে অপর কেউ ঢুকতেও পারবে না, সে নিজে বেরোতেও পারবে না। কেমন হাঁপ ধরছে নীলমের।

পুপু স্কুটার পার্ক করে এসে দাঁড়াল। সকালবেলাই ও বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল নিজের কাজে। বলল—'আরে বিক্রমকাকু এসে গেছো? খুব দেরি করলে কিন্তু। কাকীমা! আগে এলে না কেন তোমরা? মাসির সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

বিক্রম হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরল পুপুকে। গালভরা হাসি। সীমা বলল—'তুই কি আরও লম্বা হয়ে গেলি?'

'তুমি তো প্রত্যেকবারই আমাকে আরও লম্বা দেখো। ওই রেটে বাড়লে তোমাদের আর ফ্ল্যাগস্টাফের দরকার হবে না। আমার কানের সঙ্গে ফ্ল্যাগটা বেঁধে দিও রিপাবলিক ডে-তে। কি বিষয়ে কথা হচ্ছে তোমাদের।'

অরিত্র বলল—'পুপ, কাল রাতে আমরা ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছি। তুই আর তোর মা থাকছিস। অসুবিধে হবে না তো? তোর পরীক্ষাটা বড্ড বেয়াড়া সময়ে পড়ল রে!'

পুপু বলল—'মা যাচ্ছে না কেন? আমার জন্য?'

অরিত্র বলল—'ন্যাচ্যারাল।'

'কোনও দরকার নেই। আমি হোস্টেলে থেকে যেতে পারি কদিন প্রীতার কাছে। মা কেন শুধু-শুধু আটকে থাকবে? আই উইশ আই কুড গো টু। খুব ভালো পার্টি হচ্ছে তোমাদের।'

অরিত্র বলল—'তোকে ফেলে তোর মা যেতে চাইবে না, দ্যাখ।'

নীলম ম্রিয়মাণ গলায় বলল—'হোস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিতে তোর অসুবিধে হবে পুপু।'

'হোস্টেলেই তো সবচেয়ে সুবিধে মা। আমি এমনিতে অজন্তা মিস করব তার ওপর তুমি যেতে না পারলে···এষা মাসি তো রোজ রোজ আসছে না।'

'কিন্তু তোর মার তো টিকিটই কাটা হয়নি।'

'কোই বাত নেই', বিক্রম বলল— 'আমার অতবড় গাড়িটা কি ফাঁকা যাবে?'

পুপু বলল—'ইস্‌স্ বিক্রমকাকু তোমরাও যাচ্ছো, না? গান গাইবে নিশ্চয়ই। আচ্ছা বাবা, ডক্টর রায় শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলেন? তোমাদের সঙ্গেই

যাচ্ছেন ?'

'যাচ্ছেন।'

'ইস্‌স্‌। হাউ আই উইশ মাই টেস্ট কুড বি ডেফার্ড !

অরিত্র বলল—'বুড়োদের সঙ্গে বেড়াতে তোর ভালো লাগত ?'

'বুড়ো কে ? তোমরা ? আ মোস্ট ইন্‌ট্রেস্টিং লট' এষা মাসি, ডক্টর রয়, উঃ ! বিক্রমের গান, সীমার গান, সীমা আমাকে মনে করে গাস।'

নীলমের চোখে কি উড়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। সীমা বলল—'চোখে জল দাও, নীলমদি,ঘষাঘষি করো না।' নীলম উঠে গেল। অরিত্র একেবারেই চায় না নীলম যাক।

দুপুর বারোটা নাগাদ নীলমের কাছে খেয়ে-দেয়ে মহানাম, সীমা আর বিক্রম এগিয়ে পড়ল। রাতে কোচ ছাড়বে। মহানামের টিকিটে নীলম। বিক্রম বলছিল—সীমা, এষা আর নীলম তিনজনেই তার গাড়িতে চলুক। অঢেল জায়গা। একটা টিকিট নষ্ট হয় হোক। কোই বাত নেই। অরিত্র শুনে বলল—'হ্যাঁ তিন মহিলা তোমার সঙ্গে যাক, আর তুমি মস্তানি দেখাতে গাড়ি খাদে ফ্যালো আর কি।' বিক্রমরা গিয়ে একটা রাত অপেক্ষা করবে। পরদিন সকালে সবাই একসঙ্গে ইলোরা দেখতে বেরোবে।

নীলম দেখল উঁচু-নিচু খাড়াই সব পেরিয়ে তারা অবশেষে দিগন্ত জোড়া সমতলে এসে পৌঁছেছে। রাতভর দীর্ঘ যাত্রার শেষে ঔরঙ্গাবাদের প্রান্তে সূর্য উঠছে। বাসি মাঠ দু পাশে, খেত। তার এক পাশে অরিত্র, আর এক পাশে এষা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নীলম সারা রাত নিজেকে জাগিয়ে রেখেছে। আস্তে করে ডাক দিল—'এষা,ওঠো। অরি, ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছে গেছি।' নীলমের মনে হচ্ছিল পুপুই সারা রাত মশাল জ্বেলে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওঃ কী দুঃস্বপ্নের রাত !

রেস্ট-হাউসে স্নান-টান সেরে ওদের যাবার কথা ইলোরা, পথে পড়বে দৌলতাবাদ ফোর্ট। মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম-এর বাস ছাড়বে সাড়ে আটটা নাগাদ। ওরা নেমে দেখল বিক্রম, সীমা, মহানাম প্রস্তুত। বিক্রম বলল—'গাড়িতেই আমরা সবাই বাসটার পেছন পেছন যাবো। গাইডের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি।'

নীলম বলল—'সেই ভালো, উঁচু বাস থেকে বারবার নামতে উঠতে ভীষণ কষ্ট হয়।'

একটু ঠাসাঠাসি হয়েছে। সামনে বিক্রমের কনুইয়ের জন্য জায়গা রেখে মহানাম বসেছেন বেশ খানিকটা স্থান নিয়ে। অরিত্রর কৃশতা সেটা পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। পেছনে সীমা আর এষা যেটুকু জায়গা ছেড়েছিল, নীলম ভালো

করেই তাকে পুষিয়ে দিয়েছে। —'বেশ আরাম করেই বসা গেছে', নীলম বেশ তৃপ্ত কণ্ঠে বলল। অরিত্র বলল—'তোমার আরাম আবার অন্যের হারাম হচ্ছে কি না দেখো একটু।' বিক্রম বলল—'কোই বাত নেই, ভাবী', সীমা বলল—'এষাদি, আপনি হেলান দিয়ে বসুন না, আমি একটু এগিয়ে বসছি', মহানাম বললেন—পাঁচজনের কথা মনে করেও অন্তত তোমার একটু ব্যায়াম করা উচিত নীলম।' নীলম বলল—'এতো গঞ্জনা আর সহ্য হয় না।' এষা চুপ। পিকুর সঙ্গে চুক্তি, যে যখন যেখানে যাবে অন্যজনকে চিঠিতে খুঁটিনাটি জানাবে। এষা এখনও পিকুকে চিঠি দেয়নি। আজ রাতে এসে প্রথম দেবে কি না ভাবছে।

গাড়ির অভ্যন্তরে প্রান্ত-যৌবনের আকাঙ্ক্ষার গন্ধ। ভারাতুর করে রেখেছে হাওয়া। পুপের মতো কিশোরী থাকলে তার ব্যক্তিত্বের দুধে-গন্ধ দ্বারা পরিপ্লুত হতে পারত। সবাই, অন্তত অনেকেই অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছে তাদের মধ্যে একটা কামচক্র তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে ঘুরছে। অরিত্র প্রচণ্ডভাবে চাইছে এষাকে, সীমা চাইছে তার স্বামীকে যাকে পাওয়ার মতো করে সে কখনও পায়নি, বিক্রম চাইছে সম্ভব হলে এষাকে, নইলে নীলমকে, নইলে তার অভ্যস্ত নারী সীমা ছাড়া অন্য যে কোনও রমণীকে। নীলম চাইছিল মহানামকে, মহানাম কাউকে স্পষ্ট করে চাইছিলেন না, অথচ তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে একটা চাওয়ার প্রার্থনা নিঃশব্দে শরীর পাচ্ছিল, তিনি চৈতন্যের কুয়াশায় তাকে অনুভব করতে পেরে নাতিদূর ভবিষ্যতে কোনও বন্ধনের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হচ্ছিলেন আবার একই সঙ্গে, তাঁর শরীর-মন আত্মার চাহিদা থেকেই স্বত্‌-উৎসারিত এ প্রার্থনা বুঝে তার পূর্তি কি হতে পারে ভেবে শান্ত একটা প্রতীক্ষাবোধে স্তিমিত হয়ে ছিলেন। এষা চাইছিল অজন্তাকে তার সমস্ত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, শৈল্পিক এবং মানবিক রঙ-রূপের সূক্ষ্ম বর্ণিকাভঙ্গ সহ। এতো গাঢ় সেই চাওয়া যে সে পরিমণ্ডলের এই কামগন্ধ সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিল। তার একপাশে নীলম, আর একপাশে সীমা। মাঝখানে যেন একটা অন্তরালের মধ্যে তার নিঃশব্দ বসে-থাকা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। সে নিজেও অন্য কাউকে টের পাচ্ছিল না। জীবনের সব চূড়ান্ত পরিচ্ছেদের সম্মুখীন হলেই তার এইরকম গভীর আত্মমগ্নতা হয়। কথা বলতে ইচ্ছে করে না, জিভ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, কণ্ঠ স্বপ্ন দেখছে। হাত-পা ভারি হয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে চলাফেরায় সক্ষম করে তুলতে হয়।

দৌলতাবাদ ফোর্টের প্রাচীর আরম্ভ হয়েছে বহুদূর থেকে। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। ভাঙা-ভাঙা প্রাচীর-রেখা বইছে তো বইছেই। বাস থেমে গেছে।

সান-গ্লাস, ছাতা, ফ্লাস্‌ক্‌, ক্যামেরায় সজ্জিত টুরিস্ট দল নেমে পড়েছে। বিক্রম গাড়ি রুখতে এষা নেমে একটু সরে দাঁড়াল। সে ভেতরে যেতে চাইছে না। অন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে। কি হবে সেই ইতিহাসবস্তু দেখে যার সাক্ষ্য তুমি আগেই নিয়ে রেখেছো, যা তোমাকে জীবনসম্পদ হিসেবে কিছু দেবে না। দেবে না তুমি জানলে কি করে? সহজাত বোধ দিয়ে। ভুল করতে পারো। ইনটুইশন সহসা ভুল করে না। এই ধরনের একটা ছোট্ট বিতর্ক নিজের মধ্যে শেষ করে নিয়ে এষা ফোর্টের বাইরে। চালার নিচে দোকান, কয়েকটা কাঠের বেঞ্চি ফেলা। এই যাত্রায় এই প্রথমবারের মতো এষা মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত আখের রস এক গ্লাস যত না তেষ্টা, তার চেয়েও বেশি সময় কাটাবার উপকরণ হিসেবে নিয়ে বসল। চুপচাপ বসে থাকা লোকের চোখে লাগে। দরকার হলে আরও এক গ্লাস নিতে হবে।

এষা অনেকক্ষণই একলা একলা বসে থাকার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল তার দলের কয়েকজন ফিরে আসছে। একত্রে নয়। নিম্ন বর্ণিত ক্রমে।

প্রথম বিক্রম। তার বপু একখণ্ড কাঠের ওপর রেখে সে গজল ধরল একটা। বিক্রম এষার সঙ্গে আলাপিত হয়েছে, কিন্তু পরিচিত হয়নি। যতটুকু দেখেছে শুনেছে তাতে তার প্রাণান্তকর কৌতূহল জেগেছে। কৌতূহল সংবৃত রাখাটা সভ্যতার শর্ত, বিক্রম তার ধার ধারে না, এষা তাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই সে নগ্ন আকারে তার সমস্ত কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলত কিন্তু এষা প্রশ্রয় দিচ্ছে না। অবহেলা বা অবজ্ঞাও করছে না, এটা বিক্রম বুঝতে পারছে, তাই তার রাগও হচ্ছে না। আসলে কুমীর যেমন বকুল গাছ, কিম্বা সপ্তর্ষিমণ্ডল চেনে না, বিক্রমও তেমনি এষাকে চিনতে পারছিল না। অথচ বহিরঙ্গে দুজনেই এক মনুষ্য জাতির বলে চেনাটা তার স্বাভাবিক অধিকারের অন্তর্গত বলে মনে করছিল।

দ্বিতীয় অরিত্র। বিক্রমের গান মাত্র আধখানা হয়েছে কি হয়নি দেখা গেল অরিত্র ফিরে আসছে। তার দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ। বিরক্ত গলায় সে বলল—'খালি ধুলো খাওয়া। দূর দূর। সব পাষাণই কি ক্ষুধিত পাষাণ যে কথা বলবে!'

বিক্রম বলল—'আন্ডার-এসটিমেট করছেন দাদা, এই দুর্গের মধ্যে এক একটা জায়গায় এক একরকম ডিফেন্স মেকানিজম। কোথাও থেকে পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি পৌঁছে যায় ওপরের গুপ্ত ঘরে, কোথাও দু দিক থেকে খোলা তলোয়ার এসে ঘ্যাচাং করে মুণ্ডু কেটে নেবে। গাইড আবার খুব রোমহর্ষক উপায়ে দেখায়

কোনটা কোনটা। অন্ধকারে সবাইকার হাত থেকে দেশলাই নিয়ে নেবে, টর্চ নিয়ে নেবে। নাটকীয় ভাবে বলবে এইবার একটা দারুণ জিনিস দেখাবো, দর্শকরা যেই পা বাড়াতে যাবে, বলবে আর একপাও এগোবেন না কেউ। একটামাত্র দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালবে—সামনে অন্ধকূপ। এতো গভীর গর্ত যে তার তলা দেখা যায় না।'

এষা বলল—'তাই না কি? আমার তো শুনেই গা ছমছম করছে! নিরাপদ তো! ওরা যে গেল!'

বিক্রম বলল—'ওরা ঠিক থাকবে। এই চৌধুরীদা পড়ে যেতে পারতেন, যা ছটফটে আর অবাধ্য!' তারপরই দু হাতে বরাভয়মুদ্রা করে বলল—'না, না, এষাজী, কেউ পড়বে না, রেলিং দিয়ে জায়গাটা কবেই ঘিরে দিয়েছে।'

'আপনি আগে দেখেছেন বুঝি?'

'ন্যাচার্যালি। সেইজন্যই তো গেলাম না। কতগুলো ধাপ ভাঙতে হয় জানেন? লোকে ঘোড়ায় চড়ে উঠত—ওয়ান্স ইজ এনাফ।'

এষা বলল—'অরি, তুমিও গেছো বুঝি?'

অরিত্র গম্ভীর মুখে বলল—'না।'

'তাহলে গেলে না? ইনটরেস্টিংজিনিস মনে হচ্ছে!'

'তুমিই বা গেলে না কেন?'

বিক্রম প্রায় অট্টহাস্য করে বলে উঠল—'এই তো এষাজী, আপনি গেলেন না, তাই চৌধুরীদাও গেলেন না।'

এষা শুধু বলল—'আমি ইলোরা অজন্তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখছি।'

একটু পরেই দেখা গেল নীলম ফিরে আসছে। মুখ লাল হয়ে গেছে পরিশ্রমে। গাছের ছায়ায় বসতে বসতে বলল—'বাব্বাঃ। এ আমার কম্মো না।'

সীমা ফিরল না কারণ সে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল নীলম এষাকে এবং এষা নীলমকে পাহারা দিয়ে রাখবে। সে মহানামের পেছন পেছন উঠে যাচ্ছিল। মহানাম এগিয়ে যাচ্ছিলেন এক শান্ত অথচ অদম্য কুতূহলে, কোথায় এর শেষ, তাঁর দেখা চাই। এইভাবেই আস্তে আস্তে সরকারি গাইডের পেছন পেছন ইলোরার বৌদ্ধগুহা, জৈনগুহা, ত্রিতল বিহার দেখতে দেখতে কৈলাস-মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে মহানাম লক্ষ্য করলেন তাঁর দলের সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখছে ইলোরা এবং সরকারি দল এখনও বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে, কারণ দ্রষ্টব্য গুহাগুলোর কোনও কোনওটার সামনে দাঁড়িয়ে গাইডকে বেশ বিশদ বক্তৃতা করতে হচ্ছে। দলে দুটি জাপানী ছেলে আছে, গাইডকে ভাঙা ভাঙা জাপানীরও

আশ্রয় নিতে হচ্ছে। তিনি নোটবই বার করলেন। বিক্রম এবং অরিত্র ছবি নিচ্ছিল।

এবা বলল—'মহানামদা, আমি খুব সামান্য সংখ্যক ছবি নেবো। আপনি আমাকে একটু গাইড করুন।'

মহানাম বললেন, 'তুমি আমাকে ফলো করে যাও। আমিও খুব বেশি নিচ্ছি না।'

উঁচু রোয়াকের ওপর উঠতে নীলমের অসুবিধে হচ্ছিল, বিক্রম ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে যথাস্থানে পৌঁছে দিল। এবার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলল—'আমি আর এক হাতে আপনাকেও তুলতে পারি।' সীমা হালকা লাফে সিঁড়ি টপকাচ্ছিল, বলল—'লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়ে রাবণের হাতে সীতা কবার ধরা দ্যান ?' অরিত্র চেঁচিয়ে বলল—'মহানামদা, অত এগিয়ে যাবেন না। গাইডকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আপনি না থাকলে আমাদের দেখাবে কে ?'

মহানাম এগিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিক্রমের ব্যাপারটা এবার তিনি ধরতে পেরে গিয়েছিলেন, নীলমকে ওরকম জাপটে ধরে রোয়াকে তোলার দৃশ্যটা তাঁর খুব খারাপ লেগেছিল। তিনি অরিত্রর সহযোগী হবেন বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রোয়াকের প্রান্তে এসে একটু গলা তুলে বললেন—'তোমরা একটু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখো, এই মন্দির পাহাড় কেটে তৈরি। এই পাহাড় নমনীয় ব্যাসল্ট পাথরের। না দেখে শুনে স্থপতিরা মন্দিরের কাজে হাত দেননি। সাধারণ দেবালয়ের মতো নিচে থেকে গাঁথুনি দিয়ে তৈরি নয় এসব মন্দির বা গুহা। ওপর থেকে কেটে কেটে নেমেছেন শিল্পীরা। বাটালির দাগ, ছেনির দাগ ওপরদিকে তাকালেই দেখতে পাবে।'

বাঁ করিডর ধরে এগোতে এগোতে তিনি সীমাকে লক্ষ্য করে বললেন—'শিব-পার্বতীর পাশা খেলার রিলিফটা লক্ষ্য করো, ভালো লাগবে। পার্বতী মাটিতে হাতের ভর দিয়ে উঠছেন একদম গ্রাম্য মেয়েদের ভঙ্গিতে। শিল্পী যে ভঙ্গিটা খুব ভালো করে চেনেন সেটাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এই যে দেব-দম্পতির বিবাহ দৃশ্য। পার্বতীর মুখভাব দ্যাখো নীলম, এখানেও সলজ্জ নারী মূর্তি। বিক্রম এই দ্যাখো ত্রিপুরান্তক শিব। লক্ষ্য করেছো অরি চোল পিরিয়ডের যে নটরাজকে আমরা অগ্নিবলয়ের মধ্যে সাঙ্কেতিক মুদ্রায় নাচতে দেখি, বা লৌকিক কল্পনার যে স্থূলোদর আশুতোষ শিবকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত তার থেকে এ কল্পনা কতো ভিন্ন ! ইনি চতুর্ভুজ নন। আকৃতিও অনেক

তরুণ। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণের ইতিহাসের কতকগুলো মিসিংলিঙ্ক খুব সম্ভব এই বিভিন্ন শিব। মহিষাসুরমর্দিনীর মতোই যুদ্ধকালেও মুখে প্রসন্ন বরাভয়ের হাসি।'

বিক্রম বলল—'আসলে শিব তখন যুবাপুরুষ ছিলেন। দেখছেন না কেমন সিংহকটি ! এই সময়েই পার্বতী ওরফে দুগগা ওঁর প্রেমে পড়েন। পরে যতই বয়স বেড়েছে, ততই ভদ্রলোক ভুঁড়োপেটা হয়ে গেছেন, পার্বতী ডিভোর্স না করলেও এই পিরিয়ডেই ওঁকে পাত্তা দেওয়াটা বন্ধ করলেন, ব্যাস শিব টার্নড ভিখারি শিব। দা বেগার গড। আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে।'

সীমা বলল—বয়সের কথা তুলছো কেন ? অনেক সো-কল্ড ইয়ং ম্যানও তো ভুঁড়োপেটা হয়ে যেতে পারেন। বিশেষত দেবতাদের মধ্যে যেরকম সুরাপানের চল ছিল !'

'সেটা অবশ্য ঠিক', মহানাম বললেন, 'সমুদ্রমন্থনকালে সুরা উঠলে অসুররা তা প্রত্যাখ্যান করেন বলেই অসুর এবং দেবতারা গ্রহণ করলেন বলেই সুর বলে পরিচিত হলেন। তবে সেই সুরা আর্যদের মৈরেয়, মাধ্বী, গৌড়ী, আসব অর্থাৎ লিকিয়র, লিকর এবং ওয়াইন কি না এ বিষয়ে নানা জনে নানা কথা বলে থাকেন। প্রতীক হিসেবে নেওয়ারই চল।'

এবা বলল—'প্রাচীন আর্য জাতির কিন্তু সুরাটাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় পানীয় মনে করা অসম্ভব নয় মহানামদা। প্রচণ্ড শীতের দেশ থেকেই তো এসেছিল। সেই সুরাসক্তির লোকস্মৃতিকেই যদি মিথ দিয়ে প্রকাশ করে থাকে।'

অরিত্র বলল—'আমার ধারণা সমুদ্রমন্থনের মিথটা আসলে একটা ফার্টিলিটি মিথ। সমুদ্র যোনি এবং মন্দর পর্বত লিঙ্গের প্রতীক। উত্থিত যা কিছু অর্থাৎ লক্ষ্মী, উর্বশী, অপ্সরা, ধন্বন্তরী —এসবই সেকশুয়াল অ্যাকটের ঐশ্বর্য প্রকাশক।'

বিক্রম হাঁ করে চেয়েছিল, বলল—'ব্রাভো চৌধুরীদা, ব্রাভো ! আপনি যে দেখছি লেটেস্ট আমেরিকান পর্নোকেও ছাড়িয়ে গেলেন !'

মহানাম আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললেন—'অরিত্র, তুমি কি এটা কোথাও পড়েছ ? না নিজস্ব মত এটা তোমার ?'

অরিত্র বলল—'কোথাও থাকতে পারে। তবে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক্ষুণি মনে হল।'

বিক্রম এই সময়ে তার মুখের শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল। সীমা পেছন থেকে কনুইটা ধরে বলল—'মন্দির প্রাঙ্গণ নোংরা করছো

কেন ?'

'কোথায় ফেলব তাহলে এটা ?' —বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল বিক্রম।

'দাও, আমার হাতে দাও'—সীমা সিগারেটের টুকরোটা তার ছাতার বাঁটে ঘষে ঘষে নিভিয়ে ফেলল, তারপর ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা পলিথিন প্যাকেট বার করে তাতে পুরে রাখল।

মহানাম হেসে বললেন, 'বাঃ, তুমি খুব রিসোর্সফুল মেয়ে তো ! ওই রকম প্যাকেট কি তুমি সব সময়েই সঙ্গে রাখো ?'

সীমা বলল— 'কি করব বলুন, এঁর যা স্বভাব, কোথায় কি আবর্জনা ফেলবেন, আমি ছাড়া আর কে সে সব বয় ?'

মহানাম আশ্চর্য হয়ে এবার সঙ্গে চোখাচোখি করলেন। অরিত্র বলল— 'রিয়্যালি সীমাচলম, য়ু আর ফ্যানটাসটিক !'

এর পর ওরা মন্দির গাত্রের অজস্র রিলিফ দেখতে দেখতে অন্যদের সঙ্গে মিশল গিয়ে। পাথরে তৈরি অথচ পেলব, পাথরের গায়ে চিরকালের মতো শিলীভূত অথচ উড্ডীন। পাখা নেই ক্রিশ্চান ছবির দেবদূতদের মতো, অথচ তারা যে মর্ত্যলোকের মাধ্যাকর্ষণ বন্ধন থেকে সর্বৈব মুক্ত, তাদের ভঙ্গি দেখলে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। গুরুভার পদার্থকে বৈজ্ঞানিক যে উপায়ে শক্তিতে পরিণত করেন তাতে বিশ্বধ্বংসী বিস্ফোরণ হয়, শিল্পী যেভাবে করেন তাতে বিশুদ্ধ আনন্দের বিস্ফোরণ হতে থাকে, কত কাল ধরে এই উড়ন্ত জীবন্ত পাথর লঘুপক্ষ করছে মানুষকে !

অন্যরা এগিয়ে গেছে। এষা ফটো নেবার পরও নৃত্যপর শিবমূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে নতজানু। দূর থেকে বিক্রমকে ফিরতে দেখেই সে আবার সচল হল। প্রায় ওই নটরাজের মতোই।

কৈলাস মন্দিরের বাইরে এসে নীলম বলল— 'আমার ওই জৈন গুহা দেখবার আর শ্রখ নেই। আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।'

গাইড ভদ্রলোক বললেন, 'ম্যাডাম, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আসবেন এর পরে এলে। এমনিতেই ঔরঙ্গবাদ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে গরম, তারপর এ সমস্তই লাভা দিয়ে গঠিত অঞ্চল। মাটির ঘনত্ব খুব বেশি নয়।'

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে চার জন। বিক্রম, অরিত্র গ্রুপ ফটো নিচ্ছে। এষা বলল, 'মহানামদা, স্থাপত্য ভাস্কর্যের এতো ছবি নিলেন, আমাদের ছবি, মানুষের ছবি তো একটাও নিলেন না ? মানুষের স্মৃতির তাহলে কোনও দাম নেই আপনার কাছে !'

মহানাম লজ্জিত বোকা ছেলের মতো ক্যামেরা তাক করতে বিক্রম সুদু হেসে উঠল। এষা মুখ আড়াল করে ফেলল দু হাতে, হাসতে হাসতে বলল— 'আমার ছবি নিতে দেবো না আপনাকে।'

অরিত্র বলল— 'ভয় নেই। আমার ছবিতে তোমরা সবাই আছো। নীলম পালিয়ে গেল, কিন্তু আমার চেনা স্টুডিও আছে। ওকেও কি রকম ঢুকিয়ে নিই দ্যাখোনা।'

মহানাম বললেন—'অরি, তুমি কি খুব ভালো ছবি তোলো ? কি ক্যামেরা তোমার ?

'বহুদিন আগেকার রোলিফ্লেক্স।'

'আমার কয়েকটা ছবি যদি ভালো না আসে তোমার প্রিন্ট থেকে দিতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই।' অরিত্র বলল, 'আপনার গাইড দক্ষিণা হিসেবেও দিতে হয়। আচ্ছা মহানামদা, আমার সত্যি কথা বলতে কি এই কৈলাসই সব চেয়ে অ্যাপীলিং মনে হল। কেন বলুন তো ?'

মহানাম বললেন— 'শিল্পকীর্তি যখন বিরাট হয়, তখন একটা আলাদা মাত্রা পায়। শ্রবণবেলগোলার মহাবীর বা মহাবলীপুরমের রথ দেখে আমার কথাটা আগেই মনে হয়েছিল। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, সমুদ্র যা কিছু আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করি, এই সব স্থাপত্য ভাস্কর্য যেন বিরাটত্ব দিয়ে তাদের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে।'

'সৌকর্যটা কি কিছুই না ?' —এষা বলল—'ধরুন মুখশ্রী, ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা, উড়িষ্যায় যে মুক্তেশ্বর মন্দির আছে, কোণার্ক বা লিঙ্গরাজের কাছে খেলার পুতুল কিন্তু অপূর্ব।'

'সেটাও কিছু। ধরো আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র যদি পট হয় তো গাছপালা, সব রকমের প্রাণী, ফুল ফল ইত্যাদি তার খুঁটিনাটি। কৈলাস মন্দির সেই বিশাল বিশ্ব পটভূমির প্রতিরূপ। তার গায়ের সব কারু কাজ, রিলিফ, মূর্তি হল, ডিটেলস।'

এষা বলল— 'দেখুন মহানামদা, পৃথিবীর, বিশেষ করে, প্রাচীন পৃথিবীর যত আর্ট সব ধর্মকে কেন্দ্র করে, অথচ সেই সুন্দরের আধারস্বরূপ ধর্মই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বৈরী।'

'আসলে এষা, ধর্মও আমাদের জীবনে সেই ফাইন একসেসের জন্য আকাঙ্ক্ষার আরেক প্রকাশ। ধর্ম আর শিল্পের পেছনে একই জাতীয় প্রেরণা কাজ করে বলে আমার ধারণা। বিস্ময়বোধ, সম্ভ্রমবোধ, বিশালের কাছে

আমাদের আকিঞ্চন, সমর্পণ। এই সব কিছুর এক রকম প্রকাশ ধর্মে, আর এক রকম প্রকাশ শিল্পে, স্বভাবতই দুটো মিলে গেছে। কিন্তু যত দিন এগিয়েছে ধর্মে প্রাতিষ্ঠানিকতাদোষ, সংকীর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ও নীতি দোষ এসে গেছে, শিল্পের সঙ্গে তার ফাঁক ততই চওড়া হয়েছে।'

অরিত্র বলল— 'ধর্মের সংখ্যা তো ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুধু হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, শিখ ধর্ম নিয়ে তো চলছে না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, অর্থোডক্স গ্রীক চার্চ, চার্চ অফ ইংল্যান্ড, ইউনিটেরিয়ান এ তো অজস্র ডালপালা। আজকাল আবার বাহাই ফেথ বলে একটা নতুন ধর্মের কথা শোনা যাচ্ছে। ইস্‌কনও তো পুরনো বৈষ্ণব সেক্‌ট্‌ বলে মনে হয় না।'

মহানাম বললেন—'এই সব ব্যাপারগুলো যতটা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য ততটা ধর্মতত্ত্বের নয় অরিত্র। তুমি যেগুলোর নাম করলে বেশির ভাগই অন্য একটা ধর্মের সংস্কারমূলক। খ্রীষ্টধর্ম তো আসলে জুডাইজমের সংস্কার করতে তৈরি হয়েছিল, ব্রাহ্মধর্ম, শিখধর্ম সবই হিন্দুধর্মের সংস্কারক আন্দোলন। বাহাই ফেথও ইসলামের সংস্কারমূলক বলেই আমার বিশ্বাস।'

॥ ১৩ ॥

পিকুকে চিঠি লেখা শেষ করে এষা স্নান করতে চলে গেল। চার দুগুনে আট পাতার চিঠি। খুব সম্ভব পিকু অনেক দিন আগেই আশা করেছিল চিঠি। কিন্তু পুনেয় পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও যোগাযোগ করেনি সে। পুনেয় সে জীবনের যে পর্বের সঙ্গে পুনর্যুক্ত হয়েছে পিকুর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। আমার বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী খুব যত্ন করছে,ওদের মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে— এই রকম গোছের একটা না-রাম না-গঙ্গা চিঠি লেখা যেত, পিকুর তাতে মন ভরতো না। অথচ প্রিয়লকরনগর তার মনের মধ্যে কিভাবে পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়েছে, কিভাবে সেই ক'দিনের মধ্যে স্মৃতি-বিষাদ উপভোগ-জটিলতা-জট ছাড়ানোর নাটক ঘটে গেছে, কত পুরনো চেনা মানুষের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আনন্দ ভয় এসব চিঠি লিখতে গেলে এসে পড়বেই। তার চেয়ে আজকের অভিজ্ঞতা অনেক নৈর্ব্যক্তিক। তাই আজ লিখতে বাধা নেই। ক্লান্তিও যে কত উপভোগ্য হতে পারে সেটা স্নান করতে করতেই বোঝা যাচ্ছে। বিবি কি মকবারা, ঔরংজীবের কবর, প্রত্যেকটা জায়গায় নেমে নেমে, ঘুরে ঘুরে পিকুর জন্য দৃশ্য ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। রেস্ট হাউসে ফিরল

রোদে ঝলসা-পোড়া আধ ডজন উস্কো-খুশকো চুলো মানুষ। সারা সন্ধ্যে বিক্রম সীমা গান শুনিয়েছে, ওদের এনার্জি অফুরন্ত। ক্লান্তিটা যেন অঙ্গে অঙ্গে এলিয়ে আছে এখন, আলসে বিলাসে।

খুব সুন্দর সাবান আর ট্যালকামের ভুরভুরে গন্ধে ঘর ভরে দিয়ে এষা ঘরে ঢুকল। গোলাপি রাত পোশাকে নাইলন-ডলের মতো সীমা শুয়ে শুয়ে মুখের ক্রিম তুলছে। নীলম উপুড় হয়ে পিঠে হাওয়া লাগাচ্ছে। সাদা সাদা ফ্রিলগুলো ওর মাথার চারপাশে উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। দৃশ্যটা এক নজর দেখে এষা চুল আঁচড়াতে লাগল। বিশ্রামের দৃশ্য দেখলেও যেন শরীর বিশ্রাম পায়।

সীমা উঠে বসে হঠাৎ বলল— 'এষাদি,আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

এষা চুলটাকে বিনুনি করতে করতে বলল— 'এই হয়ে ওঠেনি আর কি!'

সীমা বলল— 'আপনাদের মতো মেয়েদের কিন্তু বিয়ে-টিয়ে না করে থাকা উচিত নয়।'

এষা হেসে বলল— 'কেন বলো তো? তুমি লেজ কেটেছ বলে সব শেয়ালেরই লেজ কাটতে চাইছ?'

সীমা বলল— 'তা নয়। মেল ডমিনেটেড পৃথিবীতে নিজেকে রক্ষা করবেন কি করে?'

'করছি তো। করলাম তো এতদিন!'

'কি জানেন', সীমা বলল— 'লোভনীয় বস্তু বেওয়ারিশ পড়ে থাকলেই লোকে মনে করে সম্পত্তিটা জনগণের।'

এষা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল— 'সীমা,তুমি কি নিজেকে বস্তু বলে ভাবো? সম্পত্তি বলে ভাবো? এখনও?'

'আমি নিজে না ভাবলে কি হবে এষাদি, লোকের ভাবনা তো তাতে আটকায় না।' বিষণ্ণ সুরে এষা বলল,'আমি যে নিজেকে সেভাবে ভাবতে পারি না, তাই লোকে মনে মনে কি ভাবছে সেটাও আদৌ আমার ভাবনার বিষয় হয় না, তোমার মনে আসছে জেনেও আমি ভীষণ মর্মাহত বোধ করছি। সীমা তুমি নিজেকে এবং আমাকে বস্তু বলে ভেবো না, লক্ষ্মীটি!'

সীমা বলল, 'কি করব বলুন! আমাদের সমাজের পুরুষরা যে তাই ভাবে। রক্ষা করার দায়িত্বটা নিতে হয় বলেই বোধহয় ভাবে।'

'হয়ত পুরুষরা ভাবে না সীমা, আমরাই তাদের ভাবতে বাধ্য করি। কারও ওপরেই কখনও খুব বেশি নির্ভর করতে নেই। পুলিশ এবং মিলিটারি ধরো আমাদের সবার রক্ষার দায়িত্বে আছে। তাই বলে কি জনসাধারণকে তারা

বস্তু ভাবে,নিজেদের সম্পত্তি ভাবে ? শ্রম ভাগ তো সমাজে থাকবেই, যার যার সামর্থ্যানুযায়ী। তোমার ওপরেও যাতে কেউ কেউ নির্ভর করতে পারে, এমনভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারো না ?'

'আমার ওপর যার নির্ভর করার কথা সেই টিটো তো দেরাদুনে অন্য লোকের ওপর নির্ভর করতে শিখছে এষাদি। আর টিটোর বাবা ? সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

'টিটোর বাবা স্বাধীন হলে কিন্তু তোমারও স্বাধীন হবার কথা, তোমার ওপর নির্ভর করে তিনি তোমাকে বন্দী করছেন না। তাহলে তোমার স্বাধীন হতে বাধা কোথায় ?'

সীমা হাসতে লাগল—'আপনি জানেন না এষাদি,এক এক জনের স্বাধীনতা অন্যের পরাধীনতার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়।'

এষা বলল— 'না সীমা, আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি নিজেকে স্বামীর বা অন্য কোনও পুরুষের মুখাপেক্ষী ভাবতে মেয়েরা এক ধরনের গৌরব বোধ করে। 'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি, ওর মত নেই, ও এই বলছিল' এ রকম তুমি প্রায়ই এমন মেয়েদের বলতে শুনবে যারা উচ্চশিক্ষিত, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন। এটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কি আমি জানি না, তোমারও মনে হয় নিজেকে স্বামীর সম্পত্তি ভাবতে গর্ব হয়, আমার মতো স্বাধীন মেয়েদের থেকে নিজেকে অনেক উঁচুদরের মনে হয়, তাই না ?'

'এষাদি, আপনি আমার ওপর রাগ করলেন ?'

নীলম এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, বলল—, " বেওয়ারিশ' 'জনগণের সম্পত্তি' কথাগুলো কিন্তু মোটেই সম্মানজনক নয় সীমা। তুমি এগুলো কেন ব্যবহার করলে আমি জানি না।'

এষা তাড়াতাড়ি বলল— 'নীলম, সীমা ঠিক সেভাবে বলেনি, আমি ওর পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছি। আমি কিন্তু রাগ করিনি। একটু বোধহয় উত্তেজিত হয়েছি শুধু। তবে আমার অভিজ্ঞতায় মেয়েরা অতি জটিল চরিত্র। তারা জানে না, তারা কি চায়। সমস্ত জিনিসের প্রতিই তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। একই সঙ্গে চাওয়া ও না চাওয়া। এমন কেন হয় তা জানি না।'

নীলম উঠে বসে বলল— 'এষা,তুমি একেবারে ঠিক বলেছ। একই সঙ্গে চাওয়া এবং না চাওয়া। কেন ? কেন আমরা এমন সৃষ্টিছাড়া হলুম ?'

সীমা বলল—'এষাদি, আপনিও তাহলে এই একই সঙ্গে চাওয়া এবং না চাওয়ার রোগে ভোগেন ? যদি এটা মেয়েদের সাধারণ চরিত্র লক্ষণ হয় !'

এষা বলল— 'না সীমা। আমি ওই রোগে ভুগি না। আমি বোধহয় পুরোপুরি

মেয়েও নই তাহলে। যা চাই তা কক্ষণো ভুল করে চাই না। কোনও সঙ্গত ইচ্ছে হলে যেমন এবার অজন্তা-দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়েছিল, সেটাকে সম্ভব করতে যা করার সমস্ত করেছি, এখন মোটেই মনে হচ্ছে না, চাইনি, ভুল করেছি। তবে আমি আরেকটা রোগে ভুগি, সেটাকে রোগ বলবে কিনা অবশ্য তুমি ভেবে দ্যাখো, সেটা হল একই সঙ্গে পাওয়া এবং না পাওয়া।'

'সেটা আবার কি ?' সীমা কৌতূহলী হয়ে বলল।

নীলম বলল—'তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না ওসব।'

সীমা কেমন ছোট্ট গলায় বলল— 'না নীলমদি, তের বছরের ছেলে আমার, পনের বছর বিয়ে হয়েছে। একই সঙ্গে পাওয়া আর না পাওয়া কি জিনিস ভালো করেই বুঝি। আমারটা বুঝি। অন্যেরটা কি রকম, অর্থাৎ এষাদিরটা কি রকম, তোমারটা কি রকম বুঝতে চাইছিলুম শুধু।'

ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে বাইরে। লনের বড় আলোটা নিবে গেলো, মৃদু আলো জ্বলছে। রাত হতে যেন শান্তি। এ জায়গায় দিনের আলো মরতেই চায় না। জানলা দিয়ে ঘুমন্ত বাসগুলো দেখা যাচ্ছে দূরে। কাল সকালে আবার আড়মোড়া ভেঙে সচল হবে। কি নিবিড় বিশ্রাম ওদের। অথচ অরিত্রর যতবার চোখ বুজছে কতগুলো বিশ্রী দৃশ্য সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নীলম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলে সে পরিপূর্ণ এষার দিকে ফিরতে পারে। কিন্তু নীলম তাকে সেই নিশ্চিন্ততা দিচ্ছে না। সে বিক্রমকে ডেকে এনেছে, মহানাম কোন সুদূর অতীত থেকে ভেসে উঠেছেন। মহানামকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে তাঁর সন্তানের জননী। মহানাম ব্যাপারটা জানতেনই না। মহানামকে সে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। এবং এই ভ্রমণে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্রধানত সেই-ই। মহানাম আসছিলেনই। কিন্তু তাঁকে এইভাবে অরিত্রর সঙ্গে, এষার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া এটা নীলমের একটা কূট চাল। বড়ের চালে মাত হয়ে যেতে বসেছে যেন অরিত্র চৌধুরী। এক দিক থেকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রম শীল, আর এক দিকে মহানাম রায়। নীলম নিজে অন্ধ বিচারদেবীর নির্ভুল নিক্তি হাতে নিয়ে তার সমস্ত কীর্তি-অকীর্তি তৌল করবার ইচ্ছায় তৃতীয় দিকে দাঁড়িয়ে। অথচ রক্তে কোন বিস্মৃত নদীর কলরোল। এষা যেন কোণার্কের সূর্য মন্দিরের সেই কিংবদন্তীর চুম্বক। অরিত্র পর্তুগীজ জাহাজ। গোটা যেতে না পারে তার শরীরের সমস্ত লোহা টুকরো টুকরো হয়ে এষার তটে গিয়ে আছড়ে পড়বে।

মহানাম চোখ বুজে শবাসন করছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় ব্যায়াম করার অভ্যাস। আজ সারাদিন এতো ঘোরাঘুরি হয়েছে যে ব্যায়াম করতে আর ইচ্ছে

হয়নি। সন্ধ্যেবেলায় বেশ ভালো গানের আসর বসেছিল। শবাসনে শুয়ে যতবার হাত পায়ের খিল খুলে দিয়ে নির্গ্রন্থে ডুব দিতে চাইছেন ততবার চোখের সামনে অস্পষ্টভাবে এসে দাঁড়াচ্ছেন শবাসনা। একি অদ্ভুত বিভ্রম। দেখে এলেন পার্বতীর গৌরীরূপ, অথচ সেই টাটকা স্মৃতি অনায়াসেই ছাপিয়ে উঠছে একি কোনও তান্ত্রিকের সংস্কার তাঁর রক্তে? শবাসনার সেই বিপুল কৃষ্ণতা আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেলছে তাঁর মনোলোক। দৈবী তন্দ্রা তাঁর মন হরণ করে নিচ্ছে। মন যদি লয় পেয়ে যায় তাহলে কি দিয়ে বইয়ের পাতা ভরবেন মহানাম? মহানাম প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলেন। বিবেকী মনঃশক্তিকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। শূন্যতার আনন্দে, কৃষ্ণতার আনন্দে মজবার ইচ্ছে তাঁর এখন নেই। তাঁর ইচ্ছা আস্তে আস্তে সচেতন তন্দ্রার ভূমিতে তাঁকে রেখে চলে গেল। মহানাম গভীর এক নিশ্বাস ফেললেন।

হঠাৎ খুব ছোট্ট একটা শব্দ হল। মহানাম ইচ্ছাঘুম থেকে ইচ্ছাজাগরণে চলে এলেন। দেখলেন দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সচকিত হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর পাশের এবং মাথার দিকের দুটো খাটই শূন্য। দুই সঙ্গীর এক জনও ঘরে নেই। ঘরে যথেষ্ট টাকাকড়ি। বিদেশ বিভূঁই। নিশুত রাত। মহানাম উঠে বসলেন। দরজা ভেজানো থাক। কিন্তু তিনি জেগে থাকবেন যতক্ষণ না এরা ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে। বাঁদিকে দুটো বড় বড় জানলা। হঠাৎ মহানাম দেখলেন লনের মৃদু আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বিক্রম। কিছুটা ব্যবধানে আস্তে আস্তে হাঁটছে অরিত্র। ওদের কি ঘুম আসছে না, বাইরে পায়চারী করতে গেছে। এই গভীর রাতে! ভুতুড়ে আলোয় ওদের দেখাচ্ছে বন্যপ্রাণীর মতো, বিক্রমকে তার দশাসই স্থূল চেহারার জন্য আর অরিত্রকে তার কেমন সতর্ক বেড়ালের মতো চলাফেরার জন্য। মহানাম আশ্চর্য হয়ে দেখলেন বিক্রম রাস্তা ছাড়িয়ে তাঁদের ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে। পাশের ঘরে তিন মহিলা, সেই ঘরের বিশালাকৃতি জানলা বরাবর সে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে ভয় হয় বুঝি জঙ্গল-টঙ্গল, কোনও গরিলা-জাতীয় মানবেতর প্রাণী। মহানাম জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, একটু কেশে উঠলেন. সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম পাশ ফিরে তাকাল, অরিত্রর সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি হয়ে গেল।

চাপা ক্রুদ্ধ গলায় অরিত্র বলল— 'কি করছ?'

'আপনিই বা কি করছেন?' —তেরিয়া ভঙ্গিতে বিক্রম বলল।

'জানতে চাও কি করছি? তোমাকে হাতেনাতে ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি।'

'চুরি করেছি নাকি আমি!'

'পারলে করো!'

'সাবধান চৌধুরীদা। অপমানের একটা সীমা আছে, এতো বাড়ালে সহ্য করব না, হাতাহাতি হয়ে যাবে।"

মহানামের হঠাৎ হাসি পেল। অরিত্রর সঙ্গে সবাই ডুয়েল লড়তে চাইছে। অরিত্র বীরপুরুষ হয়েই জন্মেছে। অন্য পুরুষের সঙ্গে তার সব সময়ে দ্বৈরথ। সম্মুখসমরে ছাড়া বোঝাপড়া হয় না। এই বিক্রমশীলটি আবার কি ধরনের পুরুষ কে জানে? অরিত্র যদি পৌরাণিক, ও বোধহয় তবে প্রাগৈতিহাসিক।

তিনি জানলা থেকে বললেন —'কি ব্যাপার অরিত্র? বিক্রম?'

দু-জনেই জানলার দিকে চমকে ফিরে তাকাল। পাশের ঘরের জানলায়ও বোধহয় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। জানলা বন্ধ হবার মৃদু শব্দ হল একটা। অরিত্র বড় বড় পা ফেলে ফিরতে লাগল। বিক্রম উল্টোদিকে চলে গেল। অরিত্র ঘরে ঢুকল, মহানাম শুয়ে পড়েছেন, অরিত্রর উত্তেজিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলেন, সে চাপা গলায় আত্মগত বলল— 'স্টুপিড, স্কাউন্ড্রেল!' মিনিট দশেক পরে বিক্রম ঢুকল। দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে শব্দ করে শুলো। খাটটা মচমচ্ করে উঠেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার নাক-ডাকার শব্দ শুনলেন মহানাম।

সকালে মেয়েরা রেড়ি হয়ে খাবার ঘরে একত্র হলে অরিত্র বলল— 'আজ আমরা বাসে যাচ্ছি। চারটে সীট বুক করে এসেছি। অত ঠাসাঠাসি ভালো লাগে না।'

বিক্রম বলল— 'কোই-ই বাত নেই।'

সীমা বলল— 'ইস্‌স্ আমাকে একা-একা তোমার সঙ্গে গাড়িতে যেতে হবে।'

'যাও না তুমি বাসে, কে বারণ করেছে? একা একা ড্রাইভ করতে আমার দারুণ লাগে।'

সীমা বলল, —'হ্যাঁ আমি বাসে যাই। আর তুমি একটা অ্যাকসিডেন্ট করো।

'রাস্তায় কটা গাড়ি যে অ্যাকসিডেন্ট হবে? টুরিজ্‌ম্-এর বাসটার পেছনে অবশ্য ভিড়িয়ে দিতে পারি। আহ! ফাঁকা রাস্তায় যা হাঁকাব না?' গাড়ি হাঁকাবার মধ্যেও যে একটা প্রচণ্ড জৈব উল্লাস আছে, বিক্রমের চোখমুখ সেটাই ব্যক্ত করল। মোট কথা উল্লাসের কোনও না কোনও মাধ্যম সে খুঁজে নেবেই।

সীমা বলল— 'কার-রেসগুলো দেখেছো? এক একটা গাড়ি কি রকম উল্টে যায়! দাউ দাউ আগুন। ভেতর থেকে বেগুন পোড়ার মতো ড্রাইভারকে টেনে বার করতে হয়! সুদ্ধু এই কারণেই আজ আমি তোমার গাড়িতে যাবো। এবং

মাঝে মাঝেই তুমি আমার হাতে স্টিয়ারিং ছাড়বে।' বিক্রমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সীমা ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল। বলল, 'অরিদা কেন বাসে সীট বুক করলেন আমি জানি। কালকে তোমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটিটা কি নিয়ে হচ্ছিল? বেড়াতে এসে কি লড়াই না করলেই নয়?'

বিক্রম চোখ মটকে বলল— 'চৌধুরীকে কালকে আচ্ছা করে খেপিয়েছি। চটে একেবারে বোম। এমনিতেই তো লোকটার মনটা নোংরা!'

সীমা গম্ভীর হয়ে বলল— 'তুমি কি জানলার ভেতরে হাত বাড়িয়ে কাউকে টেনে বার করতে পারতে কাপড়ের পুতুলের মতো?'

বিক্রম হা হা করে হেসে উঠল— 'টেনে বার করতে হবে কেন? তোমাকে ডাকলে তুমি চলে আসতে না? অমন চমৎকার ছমছমে রাত একা-একা ভালো লাগে?'

সীমা বলল— 'ওইটা তোমার মস্ত ভুল ধারণা। আমাকে যখন তখন ডাকলেই আমি চলে আসব এ রকম আর ভেবো না।'

বিক্রম নিজের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা ঢাকতে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল— 'আচ্ছা আচ্ছা নাও নাও। অনেক বাজে বকেছ। এবার চলো।'

একদম সামনের সারিতে জায়গা হয়েছে মহানাম ও নীলমের। পেছনে আর পাঁচটা সারি পরে অরিত্র এষাকে নিয়ে বসল। সীটগুলোর পেছন অনেকটাই তোলা। মহানাম অস্বাভাবিক লম্বা। শুধু পায়ের জন্য অনেক সময়ে মানুষে মানুষে দৈর্ঘ্যের তফাত হয়। কিন্তু মহানামের কোমর থেকে মাথা পর্যন্তও অন্যদের চেয়ে লম্বা। এবং সেই কারণেই ফিকে নীল কলার এবং তার ওপর চুলের ঢেউ ভর্তি মাথা পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। একটু পাশ ফিরলেই স্পষ্ট হচ্ছে নাক, চোখের টান এবং দাড়ির রেখা। নীলম একদম ডুবে গেছে। তবু অরিত্র আজ নিশ্চিন্ত। নীলমের পাশে বিক্রম নেই। নীলমকে কোলে তুলে কৈলাস মন্দিরের রোয়াকে তুলে দিচ্ছে বিক্রম এই কুৎসিত দৃশ্যটার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। অবশ্য নীলমের পাশটা মহানামকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু মহানাম বিক্রম নয়। মহানামের পাশে বসে নীলম তার পুরনো কলেজী রোমাঞ্চের কিছু ফিরে পেলে পাক। অরিত্র এষার পাশে বসতে পেরেছে। অরিত্র এষার পাশে। অরিত্র এষা।

—ঘুরে-ফিরে, চোখের কোণ দিয়ে কটাক্ষে, সোজাসুজি নানাভাবে অরিত্র তার প্রিয়তম দৃশ্য এষাকে দেখছে। গলায় চিকচিকে হার, কানের পেছনে দু চার গাছি চুল কেমন গুটিয়ে ছোট্ট ছোট্ট হয়ে রয়েছে। নীল শাড়ি তার কপালে ছায়া

ফেলেছে। অন্য দিনের থেকেও কালো লাগছে এষাকে। গতকালের রোদটাও তো সমস্তই মাথার ওপর দিয়ে গেছে। এই কালো কী প্রাণভরা, মন-ভরা। ম ম করছে কালোর আভায় গোটা বাসটা, অরিত্রর চিত্ত।

এষা বলল— 'ওগুলো কি গাছ? বলো তো অরি। দৌলতাবাদ ফোর্টের ওদিকেও দেখেছিলুম।'

'কোনগুলো? ওঃ। ওগুলো তো শিমুল।'

'ওই রকম চকচকে রুপোলি গা? রোদ পড়ে কি রকম দেখাচ্ছে দেখো! একদম রুপোর গাছ বলে মনে হচ্ছে। শুধু ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলটুল নেই। কী অপরূপ। দ্যাখো দ্যাখো কী অজস্র! এ যেন আলোর গাছ! স্বর্গের বাগানে।'

'মহারাষ্ট্রে তুলোর চাষ হয় জানো না? কি আশ্চর্য!'

'ও এই বুঝি সেই তুলো? কালো মাটি এমনি আলোর জন্ম দেয়? অরি জানো, আমি ট্রেনে আসতে আসতে শুকনো নদীর খাতে পাথরের তৈরি হাতির পাল দেখে এসেছি। তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম! একেবারে জাতকের গল্প। ছোট বড় মাঝারি নানান সাইজের হাতি!'

'আমাকে দেখাতে চেয়েছিলে এষা! সত্যি করে বলো চেয়েছিলে দেখাতে!'

'কাউকে একটা দেখাতে চাইছিলুম। ভাগ করে না নিলে কি দেখার আনন্দ পূর্ণ হয়?'

'এষা, তুমি বড় নিষ্ঠুর। মিথ্যে করেও কি বলা যেত না আমাকেই দেখাতে চেয়েছিলে!'

'বাঃ, মিথ্যে বুঝতে পারলে তোমার খারাপ লাগত না?' এষা হেসে বলল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অরিত্রকে এখানে কল্যাণ স্টেশনে দেখবার আগে সে তার কোনও স্পষ্ট অনুভূতি তার সম্পর্কে আদৌ ছিল না, এ কথা বললে অরিত্র তাকে আরও কত নিষ্ঠুর ভাববে?

'এষা, তুমি আমার কাছে এসেছ, আমাকে দেখবার জন্য, দেখা দেবার জন্য, কাছে পাবার জন্য—একথা একবার বলো। অন্তত একবার!'

এষা বলল—'অনেস্টলি অরি, আমি অজন্তা দেখতে এসেছি, অজন্তা আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে যে কি টানা টানছে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। জীবনের কাছে প্রার্থনা আমার যেন সিসটিন চ্যাপেল দেখা হয়!'

অরিত্র গভীর বিষাদে বলল—'তবু বললে না। মিথ্যা করেও বললে না আমার কাছে এসেছ। অজন্তার টান কি মানুষের টানের চেয়ে বেশি হতে পারে!'

এষা বলল—'অরি, তুমি যে বলছিলে কবিরা কখনও পুরোপুরি মরে না। অজন্তার টান তুমি কবি হয়ে যদি বুঝতে না পারো, আমি আর কাকে বোঝাবো ?'

এষার একটা হাত মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে অরি বলল—'নাই বলো কোনও মোহন মিথ্যা। অথবা গোপন সত্য। আমি যে অন্তত অজন্তার প্রসঙ্গেও তোমার মনে এসেছি এর থেকেও কি কিছু প্রমাণ হয় না ?'

'কি প্রমাণ হয় ?' এষা হাসছে।

'প্রমাণ হয়—"চাই চাই আজও চাই তোমারে কেবলি
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম।"

এষা বলল—'তোমাকে চাওয়া আমার সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলে আমি আসতামই না অরি। আসতে পারতামই না। তোমাকে চাইলে অপমান, প্রত্যাখ্যান, ব্যবহৃত হবার বেদনা এসব টাটকা ক্ষতের মতো দগদগে থাকতো। এসবের খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারছি।'

এষা প্রত্যেকটি কথা বলছে আর অরিত্রর বুকে ত্রিশূল বিঁধছে। বলল—'এষা, প্রেয়া, কি ভাবে তোমার কাছে ক্ষমা চাইব। কিভাবে। এষা, আমাকে মাপ করো।'

'কি আশ্চর্য, সে তো অনেক দিন আগেই করা হয়ে গেছে অরিত্র! আমি যে বললুম একেবারে ভস্ম হয়ে তারা আকাশে ছড়িয়ে গেছে। ওইসব তীব্র অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে পেরেছি বলেই তো আমি আমি। আমার মনের জমিতে ওইসব স্মৃতির ভস্ম পড়েছে, নিশ্চয় তাকে উর্বর করেছে। আমি আনন্দিত যে ওই ব্যাপারটা ঘটেছিল, এবং চুকেও গিয়েছিল। এবং তারপর আমি তোমাকে অবলম্বন করে এখন অজন্তা যেতে পারছি নীলমকে সঙ্গে নিয়ে। অরি আমি, আমি অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, একেক সময় মনে হয় যদি আমার একশটা শরীর একশটা মন থাকত...'

'তাহলে ? তাহলেও কি তার একটা আমাকে দিতে না ?'

'জীবনকে গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করতে হয় যে অরিত্র, এত সময় লাগে! এতগুলো মন। বোধহয় জন্মের পর জন্ম একটা অভিজ্ঞতাকেই উল্টে-পাল্টে

দেখতে কেটে যায়। উদ্বৃত্ত তো কখনও থাকে না। সব সময়েই যেন কম পড়ে যায়।'

'এতো নিষ্ঠুর তুমি হতে পারলে এষা ? শত শত জন্মের, শত শত শরীর মনের একটাকেও তুমি আমায় দিতে রাজি নও ? না হয় আমি একটা ভুল, একটা অন্যায় করেই ফেলেছি!'

'অরি, শোনো, ভুল কিছু তুমি করোনি। অন্যায় করেছ ঠিকই। গোটা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সে অন্যায়ের গুরুত্ব এমন কিছু নয়। আমাকে তো চিরকালের মতো ক্ষতিগ্রস্ত করোনি। বরং, বরং তোমার নির্বাচন ঠিকই হয়েছে। নীলমই সেই মেয়ে যে তোমাকে বাউণ্ডুলে থেকে এমন আদর্শ, সফল গৃহী করতে পেরেছে। ও-ই তোমার সঠিক জীবনসঙ্গী।'

'আমার বাইরেটা বদলে গেছে। আমি সুখে আছি ঠিকই। কিন্তু এই ধরনের ঘরপোষা সুখই কি মানুষের চরম কাম্য হতে পারে। এষা তুমি সেই প্রেষণা যে আমাকে আমার নিজের কক্ষ পথে ঠিকঠাক ঠেলে দিতে পারত।'

এষা হেসে বলল—'কিছু মনে করো নি অরি। কয়েকটা কবিতা লেখা না হলেও মানুষের খুব একটা এসে যাবে না, কিন্তু শান্তি, পিতা-মাতা-সন্তানের সুন্দর সফল ইউনিট যতই বাড়ে সমাজের পক্ষে তো ততই মঙ্গল। আর তাছাড়া দেখো, তুমি নীলমকে চেয়ে আমাকে ছাড়লে, নীলমকে পেয়ে আবার আমাকে চাইছ, আমাকে পেয়ে গেলে নিশ্চয় আর কাউকে চাইবে। তোমার মোটামুটি এই রকমই স্বভাব!'

'বেশ তো, তোমাকে পেয়ে গেলে যদি আমি রাহুমুক্ত হই তো, তুমিও তো এরকম মুক্তি পাবে। পাবে না ? যদিও তুমি আমাকে মোটেই ঠিক বিশ্লেষণ করোনি, তবু তোমার দৃষ্টি থেকেই বলছি।'

'অরি, বারবার একই ভুল করছ কেন ? তাছাড়া একটা ধারণা তোমার একদম ভ্রান্ত। তুমি মনে করছ নীলম শুধুই ঘরণী গৃহিণী, তার মধ্যে তুমি যাকে প্রেষণা বলছ তার কিছুই নেই, এটা ঠিক নয়। নীলমকে আসলে তুমি পুরোপুরি পাওনি। সেই না পাওয়ার কথাটা তুমি জানোই না।'

'তুমি বলছ মহানামকেও এখনও মনে মনে...'

'না, না'—এষা হেসে ফেলল, 'আমি ওসব বলছি না সত্যি অরি, তুমি কমার্শিয়াল ফার্মে কাজ করে করে খুবই স্থূল হয়ে গেছো। তোমার মধ্যে ত্রিলোকেশ গৌরবকে সত্যিই আর একটুও খুঁজে পাচ্ছি না।'

নীলম বলল—'মহানামদা, তুমি এবার জানলার ধারে বসো। তুমি দেখতে এসেছো।'

'কেন? তুমি দেখতে আসোনি?'

'এসেছি, তবে নিসর্গ নয়।'

'শিল্পকলা দেখবে বলে নিসর্গ দেখবে না এমন প্রতিজ্ঞা করেছো কেন?'

'নিসর্গের থেকেও কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কিছু আছে এ যাত্রায়।' নীলম উজ্জ্বল মুখে বলল।

'যেমন?'

'তুমি আছো, এষা আছে, অরিও আছে।'

'স্টাডি করছ আমাদের? সীমা বা বিক্রম নেই? ওরাও কিন্তু দেখবার, শোনবার মতো।'

'ওদের আমি দেখে শুনে ফুরিয়ে ফেলেছি। তুমি দেখো।'

—'ফুরিয়ে ফেলোনি। আর সবার মতো ওরাও প্রতি ঘণ্টায় হয়ে উঠছে নীলম। মানুষের বৈচিত্র্যে যদি তোমার আগ্রহ থাকে তাহলে ওদের বাদ দেওয়া চলে না।'

'আচ্ছা মহানামদা, আমার কাছে তো কোনও কৈফিয়ত দাবী করলে না?' নীলম কি রকম ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল।

মহানাম কি করে বলবেন—'আমি তো তোমার পরে করিনি নির্মাণ
অভ্রভেদী স্বর্গের সোপান
ভুলিনি তো তুমি মুগ্ধ নিমেষের দান।'

তিনি বললেন—'বেশ তো, কৈফিয়ত দাও। আমি তোমাকে কাঠগড়ায় তুলছি।'

নীলম বেশ আহত হয়েছে। বলল—'তোমার চোখে হাসি চকচক করছে এ ভাবে কি কেউ কৈফিয়ত চায়?'

মহানাম বললেন—'তবে চাইব না। "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?"'

'হৃদয়ও নেই। বেদনাও নেই। কিছুরই বালাই নেই। কোনদিনও ছিল না।'

'সেটাই বলো না। অত কাব্য করতে আর হবে না।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন মহানাম।

পাঁচসারি পেছন থেকে অরিত্র বলল—'নীলম, কি চুটকি গল্প-টল্প বলছে না কি?'

'দারুণ হিউমার'—মহানাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

অরিত্র বলল—'ওর স্টকে প্রচুর আছে মহানামদা। সবগুলোই আপনার কানের উপযুক্ত কি না জানি না অবশ্য।'

মহানাম বসতে নীলম ডুকরে ডুকরে হাসতে লাগল। মহানাম খুশি হয়ে বললেন—'অরি তোমাকে সুখী করতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। সেইজন্যই তোমাকে আমি একদম বকাঝকা করলাম না। সেটা বুঝতে পেরেছ আশা করি। সুখী হওয়াটাই বড় কথা।'

'কি করে মনে হল? মোটা হয়েছি দেখে?'

মহানাম আবার সশব্দে হেসে উঠলেন।

এষা বলল—'নীলম কি সুন্দর মজা করতে করতে চলেছে। মহানামদা দারুণ এনজয় করছেন। আর তুমি যত রাজ্যের মর্বিড কথাগুলো আমার কানের কাছে তখন থেকে বলে যাচ্ছো। সহজ হও না অরি! সত্যেরে লও সহজে।'

'সত্য সহজ হলে তো! আমার কাছে সত্য খুব জটিল রূপে দেখা দিয়েছে যে!'

নীলম বলল—'হাসবে না মহানামদা। স্থূলত্ব সুখ না হয়ে অসুখের চিহ্নও তো হতে পারে! সেটা হাসির কথা নয়!'

'অসুখী? তুমি অসুখী?'

'অসুখের কথা হচ্ছে, "ডিজিজ', 'আনহ্যাপিনেস' নয়।'

'কি হয়েছে তোমার?'

'ড্রপসি হতে পারে।'

'কি যে বলো! ড্রপসি হলে কেউ কাজকর্ম বেড়ানো এসব করতে পারে?'

'গ্ল্যান্ডের গণ্ডগোল হতে পারে।'

'তা পারে। তুমিও ডাক্তারের মেয়ে, আমিও ডাক্তারের বোনপো, দেখি ডায়াগনোজ করতে পারি কি না। থাইরয়েড-টয়েড না কি? চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে না? বাজে কথা বলো না। বসে বসে খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছো। পার্টি-টার্টিতে মৈরেয়-মাধ্বীও হয় নাকি এক আধ চুমুক?'

'এক আধ চুমুকে এমন হয়?'— নীলম হাসতে লাগল। তার হাসির আড়ালে কান্নাটা মহানাম দেখতে পেলেন না।

স্টপে থেমেছে বাস। যাত্রীরা হাত পা ছাড়িয়ে নিতে নেমে দাঁড়াচ্ছে বাস থেকে। বিক্রম দুহাতে দু গ্লাস আখের রস নিয়ে এগিয়ে এলো। নীলম আর এষার হাতে সে দুটো ধরিয়ে দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে আর দু গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো।

মহানামেরটা এগিয়ে দিয়ে অরিত্রর দিকে—এয়ার ইন্ডিয়ার মহারাজার ভঙ্গিতে গ্লাস বাড়িয়ে ধরে বলল—'আসুন দাদা।'

'তোমার মাথায় ঢালো ওটা'—অরিত্র রাগত গলায় বলল।

বিক্রম বলল—'আরে মাথায় তো ঘোল ঢালতে হয়! ব্যাকরণে ভুল করে দাদা? রাগের ওই দোষ। রাগ চণ্ডাল। জানেন তো?'

সীমা গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে এলো—'অরিদা, নিন প্লীজ

'সিগারেট আছে মুখে সীমাচল'—হাসিমুখে অরিত্র বলল।

'সিগারেট সব সময় থাকবে। ইক্ষুনির্যাস তো সব সময়ে থাকবে না।

'দাও', অরিত্র হাত বাড়িয়ে বলল।

'কি মোহিনী জানো বন্ধু, কি মোহিনী জানো

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন'—বিক্রম উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করল, অঙ্গভঙ্গিসহ। নীলম, এষা এবং মহানাম সুদ্ধু না হেসে পারলেন না।

॥ ১৪ ॥

পাহাড়ের গায়ে থাক কাটা সিঁড়ি। ঠিক উল্টো দিকে রেস্ট হাউস। শান্ত পরিবেশ। গাইড বললেন—'কয়েক মিনিট আপনারা ছুটি নিয়ে নিজের নিজের ইচ্ছে মতো ঘুরুন, ঠিক দশ মিনিট পরে এইখানে এসে জমায়েত হবেন।' ইলোরা ছিল কেমন লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন, দূর, ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়, অথচ পরিত্যক্ত। যেন তার মহিমাও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতো গভীর যে সে একটু দূরে থাকতেই পছন্দ করে। অজন্তা যেন মানব সংসারের আর একটু কাছে এগিয়ে এসেছে। মানুষও তাই সাহস পেয়ে কাছাকাছি রচনা করেছে তার বিশ্রামকুঞ্জ।

গাইড বললেন—'১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ সৈনিক অজন্তা পাহাড়ের ওপর শিকার করতে এসে নদীর ওপরে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ দেখতে পায়। ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালার ওপারে তাপ্তি বেসিন, এধারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। ছোট্ট বাগোরা নদী পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সাতকুণ্ড জলপ্রপাতের কাছ বরাবর এই নদী একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক নিয়েছে। এখানেই অজন্তা গুহামালার অবস্থান। সবসুদ্ধ ত্রিশটি গুহা আছে। মাত্র পাঁচটি তার মধ্যে চৈত্য বা উপাসনাগৃহ। বাকি পঁচিশটিই সঙ্ঘারাম বা বিহার। দশম গুহা চৈত্যটি প্রধান। খ্রীষ্টপূর্ব দু'শ বছর থেকে খ্রীষ্ট পরবর্তী দু'শ এই চারশ বছরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে

অজন্তা। মাঝখানে কিছু কিছু বছর বাদ দিয়ে আবার সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চলেছে কাজ। অর্থাৎ ছ সাতশ বছরের পুরাকীর্তি।'

ধাপ গুনে গুনে এগোচ্ছে সীমা, বলল—'এষাদি, ঠিক একশটা।' যতই ওপরে যাচ্ছে অরিত্রর কাছ থেকে থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে জে পি জে, প্রিয়লকরনগর পুনে, নীলম, কাছে চলে আসছে কলেজ স্ট্রীটের মোড়, হাজরা, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, আশুতোষ বিল্ডিং, এষা।

প্রথম গুহামন্দিরের মধ্যে ঢুকে এষা বলল—'এটাই বোধহয় সর্বশেষ গুহা সময়ের দিক থেকে, না মহানামদা? চালুক্য রাজাদের সময়ে তৈরি বলে শুনেছি।'

আরেকটু ভেতরে ঢুকে ও স্তব্ধ হয়ে গেল। আয়তাকার এই সম্পূর্ণ মসৃণ, হলঘরের মতো গুহা পাহাড়ের ভেতর থেকে কেটে বার করা যায়? কী অদ্ভুত স্থাপত্য? কৈলাস মন্দির বিশাল, রাজকীয়। কিন্তু অজন্তার এই গুহা হল যেন কি অজ্ঞাত কারণে তার থেকেও বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। শীতল, যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

গাইড আলো ফেলে গর্ভমন্দিরে বুদ্ধমূর্তি দেখাচ্ছেন। সারনাথ মৃগদাবে পদ্মাসনে বুদ্ধ। এক এক দিকে আলো ফেললে মুখ ভাব এক এক রকম। একদিকে হাসিমুখ, অন্যদিকে বিষণ্ণতা, সামনে থেকে 'এশিয়ার আলো' ধ্যানমগ্ন।

মহানাম বললেন—'শিল্পী মুখভাবের এই বৈচিত্র্য ইচ্ছে করে এনেছিলেন কি না জানি না। এনে থাকলে খুবই আশ্চর্য শিল্পী বলতে হবে। কিন্তু কোণার্কের তিন সূর্যমূর্তির মুখের এক্সপ্রেসন অবধারিতভাবে মনে পড়ে যায়। বালার্ক, মধ্যদিনের সূর্য, আর শেষবেলার শ্রান্ত বিষণ্ণ সূর্য—তোমার কি মনে আছে অরিত্র?'

অরিত্র অন্যমনস্কভাবে বলল—'না। কোণার্কের সূর্যমূর্তি তো দিল্লিতে।'

এষা বলল—'সে তো গর্ভগৃহের সূর্যদেব। মন্দিরের বাইরে নীল পাথরের মূর্তি আছে, মনে নেই!'

মহানাম বললেন—'যে রাজকুমার মানুষের ব্যথা বেদনা দেখেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, সারা-জীবনই তিনি তাঁর সেই প্রথম ব্যথার অনুভব ভুলতে পারবেন না, এমনই বোধহয় ধারণা ছিল ভাস্করের। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ উদাসীন সন্ন্যাসীকে শিল্পী মেনে নিতে পারেননি হয়ত। আধ্যাত্মিক শান্তির পাশাপাশি তাই এমনি হাসি-কান্না সিদ্ধশিল্পীর হাত দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে গেছে।'

মহানামের অনুরোধে গাইড এবার অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির আলেখ্যর সামনে আলো ধরলেন। ডান হাতে ফোটা পদ্ম, মাথায় মণিমাণিক্যময় রত্নমুকুট, কানে হীরের কুণ্ডল, কণ্ঠ বেষ্টন করে আছে মুক্তার শতনরী। মুক্তা আঁকতে অজন্তা শিল্পীরা খুব পটু। ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন অবলোকিতেশ্বর। ভাবাবেশে লীন। অপর দিকে অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি। জরা-মৃত্যু-ব্যাধি অধ্যুষিত মরজগৎ। কি করে স্বার্থপর একক সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন? সমস্ত অলঙ্কার বসনের ঔজ্জ্বল্য, বিলাস-বাহুল্য মিথ্যে, অসার করে দিয়ে জেগে আছে অবলোকিতেশ্বরের ভাব-ব্যঞ্জনার গভীর ধ্যানমগ্ন কারুণ্য।

য়ুনেস্কো অ্যালবামের রঙগুলো বড্ড চড়া। আসলের রঙ আরও অনেক পাকা, অনেক নম্র।

'প্রিন্টের থেকে অনেক ভালো, তাই না এষাদি?' সীমা বলল।

'ঠিক বলেছ, আমিও এক্ষুণি তাই ভাবছিলাম।'

অন্তরালের ছোট্ট ঘরটুকুতে বিরাট প্যানেলে তপস্যারত বুদ্ধ এবং মারের আক্রমণ। সসৈন্য তো বটেই। মারের তিন কন্যাও রয়েছে সঙ্গে।

মহানাম বললেন—'তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে এরাই তো মনে হচ্ছে তপস্যায় বসে যাবে।'

এষা বলল—'তুলনামূলকভাবে সিদ্ধার্থের তেজ এত বেশি যে মার কন্যারাও তার কুহকে পড়ে গেছে। অভিভূত হয়ে যাচ্ছে এই অর্থেই পরাজিত হচ্ছে বোধহয়।'

বিক্রম বলল—'এ ছবিগুলো তো একেবারেই লাইফ-লাইক নয়। এমনভাবে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়েছে যে নাচেও অতটা সম্ভব নয়। এরা সবাই কি ওড়িশি শিখত না কি বলুন তো?'

অরিত্র বলল—'আর্ট কখনো লাইফ-লাইক হয় না ব্রাদার। এই দ্যাখোনা পুরো ফিগার যেখানে এঁকেছে কোমরের তলা থেকে ভালো করে দৃষ্টিই দেয়নি।'

এগোতে এগোতে বিক্রম বলল—'আরে। এ যে দেখছি স্বর্গ। অমরাবতীতে খোদ ইন্দ্রের সভা! পুণ্যবানরা স্বর্গে গেলে তাদের এইভাবে সিংহাসনে বসিয়ে অপ্সরারা এনটারটেন করে। বাঃ! মানুষ যাতে এই স্বর্গের লোভেও পুণ্যকর্ম করে তাই শ্রমণরা কত কষ্ট করে গুহা-টুহা কেটে কুটে সব এঁকে-জুকে রেখেছেন,' চোখ টিপে অরিত্রর দিকে তাকিয়ে বিক্রম বলল. —'কি বলেন চৌধুরীদা, এবার আপনাতে আমাতে পুণ্যকর্ম করতে আরম্ভ করব, অ্যাঁ?'

গাইড বললেন—'এটা একটা জাতক কাহিনী। মহাজনক জাতক। বোধিসত্ত্ব

রাজা মহাজনক হয়ে জন্মেছিলেন। এখানে প্রব্রজ্যা-গ্রহণের সংকল্প জানাচ্ছেন রানী সীবালির মুখ তাই এতো বিষণ্ণ। এই দেখুন থেমে গেছে নৃত্য-গীত। পুরাঙ্গনারা জল্পনা-কল্পনা করছেন।'

বিক্রম বলল—'যাব্‌বাবা।'

কৃষ্ণা রাজকুমারীর চিত্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এষা। এই সে-ই। যাকে সে স্বপ্ন দেখেছিল। বার বার তিনবার। য়ুনেসকোর অ্যালবাম দেখে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নমিত চোখ। কোথা থেকে এই অতলান্ত বিষাদের ঠিকানা পেলেন শ্রমণ শিল্পী! অবলোকিতেশ্বরের বিষাদ আর এ ব্যথা তো এক জাতের নয়! —'দেখো অরি, কি অলৌকিক বিষাদ! সমস্ত গুহাটাই যেন ছেয়ে গেছে এই বিষাদে'—এষা কেমন ব্যাকুল হয়ে বলল, 'ওই সীবালি, এখানে মারকন্যা, নাগরানী সুমনা, এই রাজকুমারী সবাইকার মুখের আদল ভিন্ন ভিন্ন হলে কি হবে। একটা জায়গায় এসে এঁরা সবাই এক। দোসরহীন। জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সমস্ত জগতের দুঃখ একটি নারীর ওপর চাপিয়ে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন।'

সীমা বলল—'আমি তোমাকে বললুম এষাদি, একজনের দুঃখ না হলে আরেকজন আনন্দে পৌঁছতে পারে না। তুমি কি বলছ এই কৃষ্ণা রাজকুমারীও যশোধরাই।'

এষা বলল—'খুব ভালো আইডিয়া সীমা। হতে পারে। ওদিকে যখন মার আক্রান্ত, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করছেন মহাসমারোহে তখন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে কোনও একজন শিল্পীর হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল—কপিলাবস্তুর নিরানন্দ প্রাসাদে দুঃখিনী রাজবধূকে। এ-ও হতে পারে সীমা এই সমস্ত জাতক কাহিনী ও বুদ্ধ চরিতের মধ্যে যে বঞ্চিত দুঃখিনী নারীর চরিত্রটি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁকেই সাধারণভাবে রূপক হিসেবে এখানে এঁকেছেন শিল্পী। এটা একটা প্রতীকী নারীমূর্তি, ওপন সিমবল। তোমার যেমন খুশি ব্যাখ্যা দিতে পারো এর।'

মহানাম পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। বললেন—'নীলা, তুমি কিছু বলবে না?

নীলমের চোখ ছলছল করছে, বলল—'কি বলব, আমার খালি মনে হচ্ছে, এ এক হতভাগিনী নারী যে অনেক পেয়েও কিছুই পায়নি, অনেক পাওয়া যার মিথ্যা, ব্যর্থ হয়ে গেছে এক বিশাল না-পাওয়ায়।'

অরিত্র হেসে বলল—'আমার ধারণা ছিল এককালে কবিতা-টবিতা

লিখতুম, কাজেই দলের মধ্যে আমিই একমাত্র কবি। অজন্তার শিল্পীদের আমিই বোধহয় ঠিকঠাক বুঝতে পারছি। এখন দেখছি আমার এ ধারণা সর্বৈব ভুল। আমি নয়, এই তিনটে মেয়েতে মিলে এখানে আসল কবি।'

মহানাম ভাবুক গলায় বললেন—'সপ্তম শতাব্দীর আলেখ্যের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর তিন রমণী জীবনসত্য দেখতে পাচ্ছে। শিল্পীর সাফল্য কী বিরাট তার পরিমাপ করতে পারছো? আজ তিনি থাকলে কী করতেন বলো তো!'

"'কেয়াবাত্ কেয়াবাত্' বলে উঠতেন নিশ্চয়ই"—বিক্রম বলল।

॥ ১৫ ॥

অজন্তা দর্শনের প্রতিক্রিয়া এক-এক জনের ওপর এক-একরকম হল। বিক্রমকে সারাটা সময় কেউ কোনরকম মনোযোগ দেয়নি। এমন কি সীমাও না। সীমা হঠাৎ কোথা থেকে যেন নতুন শক্তি সঞ্চয় করে বিক্রমের পথের সামনে একটা চ্যালেঞ্জের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। বিক্রম এটা এভাবে ভেবে-চিন্তে বোঝেনি। কিন্তু ইলোরা-ভ্রমণের সময় থেকেই একটা সীমা-সংক্রান্ত অস্বস্তি তার সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সীমা যেন একটা কেউ, একটা রীতিমতো ইতিবাচক চরিত্রসম্পন্ন মানুষ। যে কাজলপরা, ছিঁচকাঁদুনে সীমাকে চুঁচড়োর বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে সে পালিয়ে এসেছিল পনের বছর আগে, এই পনের বছর ধরে যার ঠোঁট ফোলানো ছিঁচকাঁদুনেগিরি সিধে করতে তার অনেক শক্তিই অপচয়িত হয়েছে, এবং যাকে এখন সে তার থানের বাড়ির সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ একটা ব্রোঞ্জের পুতুলের বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, সেই সীমা তাকে খুব দক্ষ ভাষা ও ভঙ্গিতে ধমকাচ্ছে, ধমকের মতো শোনাচ্ছে না সেগুলো, সীমা কথা বলছে, এষা সীমার দিকে ফিরে, চোখে বিস্ময়, মহানাম, ডক্টর মহানাম রায় সীমার সঙ্গে কথা বলছেন যেন সমানে সমানে, যেন সীমা কোনও মঞ্চে তাঁর সহবক্তা। অরিত্র চৌধুরী সীমার কাঁধে হাত রেখেছে যেন খুব ভঙ্গুর, খুব মূল্যবান সেই কাঁধ। অজন্তার প্যানেলের মতো এইরকম একটা চিত্রপরম্পরা বিক্রমের চোখের সামনে জীবন্ত ফ্রেসকো হয়ে ভাসছে। সে এই ছবির চিত্রকর নয়, এমন কি দর্শক হিসেবেও তাকে কোনও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। ছবিগুলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল। বিক্রমের দৃষ্টির পাঁচশ পাওয়ারের বাতিটা তাদের ওপর কোনও কাজ করছে না। অন্য কোনও আলোয় ছবিগুলো পরিচিতি পাচ্ছে। বিক্রম এই ফ্রেসকোর মানে বুঝতে পারছে না। অজন্তার ফ্রেসকোগুলো যেমন নগ্ন, এই জীবন্ত ফ্রেসকোর ফিগারগুলো আবার বস্ত্রের

ওপর আরও কোনও সূক্ষ্ম স্বচ্ছ মসলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত। যার মধ্যে দিয়ে চেনাকে আধো-চেনা, আধো-চেনাকে একেবারে অচেনা বলে মনে হচ্ছে। সীমাকে তেমন ভালো করে চিনতে পারছে না সে। অরিত্র চৌধুরীকে তো একেবারে অচেনা লাগছে।

একমাত্র একটি গুহায় বিক্রম অন্যের স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে নিজেকে খুঁজে পাবার চূড়ান্ত সুযোগ পেয়েছিল। গাইড বলল—'এই গুহাটা সম্ভবত লেকচার হল হিসেবে ব্যবহার হত। মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেউ একজন কিছু বলুন, বা গান করুন, দেখুন কিভাবে মাইক্রোফোন-বোর্ন গানের মতো শোনা যায়, একোসমেত।

এষা বলল—'বিক্রমবাবু, আপনি যান।'

বিক্রম আজকাল গান-টান ভুলে যাচ্ছে। কতকগুলো বহুবার সাধা গান ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মনে থাকে না। ইচ্ছে করে গায়ের জ্বালা মেটাতে সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত প্যারডি ধরল—

হায় জনানা তুমি গুরুর আড়ালে থাকো জরু হয়ে
লঙ্গুরের হাতে ঝোলো আঙ্গুর হয়ে
এই সুখারুটির সাথে খট্টি মিট্ঠি চাটনি কেন বনো না।
হায় জনানা।

গুহার কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল সেই গান। কি দারুণ জমাটি বৌদ্ধদের তৈরি সেই অডিটোরিয়াম। যেখানে একদিন সন্ন্যাসীগুলো নিশ্চয়ই হ্যান করো না ত্যান করো না বলে কাঁচা বয়সের শিক্ষানবিশ শ্রমণগুলোর কান ঝালাপালা করে দিত সেইখানে তার গলা এতদিনে রসসঞ্চার করতে পেরেছে ভেবে বিক্রম খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। এমন সময় সীমা বলল—'আমিও একটা গাই, গাইব?' গাইড বলল—'নিশ্চয়ই! যান।' সীমা গিয়ে দাঁড়ালো যেন সবাইকার মনোযোগের বৃত্তে, তারপর গাইল—

"সকল কলুষ তামসহর জয় হোক তব জয়
অমৃতবারি সিঞ্চন করো নিখিলভুবনময়
মহাশান্তি মহাক্ষেম, মহাপুণ্য মহাপ্রেম।'

গেয়ে হঠাৎ হাতজোড় করে নতজানু হয়ে বসে পড়ল সীমা, ভিন্ন স্কেলে উঁচু গলায় গাইল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি।"

একটি লম্বা দশাসই চেহারার, নিষ্পাপ মুখের মেমসাহেব বুকের ওপর ক্রস আঁকল, নীল চোখ ঊর্ধ্বে তুলে। জাপানী ছেলে দুটি নতজানু হয়ে বসল, হাতজোড় করে, নিচুগলায় নিজেদের ভাষার কি মন্ত্র উচ্চারণ করল ওরাই

জানে। গাইড জিজ্ঞেস করল—'আর কেউ গাইবেন ?' বিক্রমের প্রথম গানটা গেয়ে মুড এসে গিয়েছিল সে একটা গজল গাইতে পারত, কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাতে গঙ্গার জল ছিটিয়ে যেন স্যাঁতসেঁতে করে দিয়ে গেছে সীমা, তাই সে তার গান আর জমবে না বুঝে বিরস মুখে বাইরে চলে আসে।

এই বৌদ্ধ শ্রমণগুলো গুহার পর গুহা ভর্তি করে নুড এঁকে রেখেছে খালি। কোনও সন্দেহ নেই, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার পর নির্জন গুহায় দিনের পর দিন নারীসঙ্গহীন কাটাতে কাটাতে লিবিডোর তাড়নায় এই সব চিত্রশিল্পের জন্ম। যেমন খাজুরাহো, যেমন কোনারক, যেমন জগন্নাথ-মন্দির। ওদের গুরুগুলো, অর্হৎ না ফর্হৎ তারাও এইসব ব্লু-ফিল্ম দেখে দিব্যি আহ্লাদে থাকতো। তাতে বিক্রমের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু ব্লু ফিল্মকে ব্লু-ফিল্মই বল না বাছা ! কে আপত্তি করছে ! ধর্মের পোশাক পরিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলে যে গায়ে জ্বালা ধরে ! বামাচারী তান্ত্রিকদের কারণবারি আর ভৈরবীচক্রের মতো আর কি !—তবে ছবিগুলোকে যথেষ্ট কামোদ্দীপক করতে পারেনি। খাজুরাহো চৌষট্টি যোগিনী দেখে যেমন ঘেমে নেয়ে যেতে হয়। এগুলো সেরকম নয়। কেমন ম্যাটমেটে, নিরামিষ নিরামিষ, কখক কি মোহিনীঅট্টম এর কাছে যেমন রবীন্দ্র-নৃত্য 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে !' বেশ গরগরে মাটন দো পিঁয়াজা, মুর্গ মুসল্লম, নিদেনপক্ষে বীফ কাবাব না হলে বিক্রমের ঠিক জমে না। তার ওপর আর্ধেক রঙ উঠে গেছে, পলেস্তারা খসে গেছে, দিমাগ্ খারাপ না হলে কেউ এর জন্য গোটা একটা দিন নষ্ট করে ?

বুদ্ধদেবের বিশালকায় মহাপরিনির্বাণের ভাস্কর্যটি নীলমকে অভিভূত করে ফেলেছে। দু পাশে দুই শালবৃক্ষ, পায়ের কাছে নতজানু শিষ্যদল, আনন্দর হাতে পরিত্যক্ত ভিক্ষাপাত্র। কুশীনগর। ছবির চেয়ে স্থাপত্য, স্থাপত্যের চেয়েও ভাস্কর্য যেন মুগ্ধ করেছে তাকে। যে নীলম একশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে অজন্তা পাহাড়ে উঠেছিল, আর যে আবার একশ ধাপ ভেঙে নেমে এলো তারা যেন এক নয়। গুহাচৈত্যের অন্তরাল থেকে কে যেন গম্ভীর মধুর স্বরে নীলমকে লক্ষ্য করে বলছে 'সম্মা-দিট্‌ঠি, সম্মা-সঙ্কপ্পো, সম্মা-বাচা, সম্মা-কম্মন্তো, সম্মা-আজীবো, সম্মা-বায়ামো, সম্মা-সতি, সম্মা-সমাধি···।' একবার নয় বারবার।

সারনাথ। ধর্মচক্র মুদ্রায় আসীন সিদ্ধার্থ, সদ্য বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, বলছেন —হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন দুঃখের মূল কারণ অবধান করো। কামনা-বাসনাই এ দুঃখের মূল। ইন্দ্রিয়জ সুখের কামনা, আত্মতৃপ্তির বাসনা। এ দুঃখের মূল উৎপাটনের উপায় কি ? কামনা বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করাই এর

মূলোচ্ছেদের প্রকৃত উপায়।

সত্যিই তো, সারাটা জীবন একটা কামনা থেকে আরেকটা বাসনায় ভ্রমণ ছাড়া আর কি করেছো তুমি ? কী অশান্ত যৌবন কেটেছে, কী উত্তাল ! কত শত মৃগয়ায় সমৃদ্ধ ! না ক্লিন্ন ! সেইসব নিবেদিত, কামাকীর্ণ মুখগুলো স্মরণে আনতেও এখন ভয় হয় ! আড়াল থেকে কেউ লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে নীলমের যৌবন বিলাস তাকে সর্বনাশের পথে আর বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে না যায়, তাই তিনি যা করবার করলেন। নীলম পুজো করে তার পর থেকেই। কিন্তু সে-ও এক কামনার পুজো ছাড়া আর কি ? ভেতর থেকে একটা ক্ষতিপূরণের দাবী, কিংবা যা হারিয়েছে তা ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা তার ফুল, ফল, এলাচদানা নিবেদনের মধ্যে কি অনুস্যূত হয়ে থাকে না ! ওই পুজো সত্যি সত্যি পুজো নয়। একরকমের আত্মপ্রবঞ্চনা, লোক ঠকানোও। দেখো আমি কেমন পূজারিণী, দেবতাকে না দিয়ে জল খাই না। সত্যিকারের পূজা কাকে বলে অজন্তার দশটি গুহা পরিভ্রমণ করে নীলম বুঝতে পারছে। ছ'শ সাতশ বছর ধরে কত ভক্তের পূজা, আরতি, মন্ত্রপাঠ, সঙ্কল্প, ধ্যান, আত্মনিবেদন শিল্পসৃষ্টির ভাঁজে ভাঁজে রেখায় রেখায় প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। তার তীব্র গভীরতা তেরশ বছর ধরে জীবন্ত হয়ে আছে—সম্মা-দিট্‌ঠি, সম্মা-সঙ্কপ্পো, সম্মা-বাচা। ওঁ নমো, বুদ্ধ দিবাকরায়, গোতম চন্দিমায়, শাক্যনন্দনায়, নমো নমঃ।

বুদ্ধদেব গৃহীদেরও বৌদ্ধ হবার অধিকার দিয়েছিলেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলবে তারা। বৌদ্ধ হওয়া না-হওয়াটা বড় কথা নয়। কোনও বিশেষ ধর্মে বাইরে থেকে নাড়া বেঁধে বসলে বা না বসলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সামনে ওই বিশাল মহাপরিনির্বাণ নিয়ে সেই একই সংসারে নীলম আর কি করে ফিরতে পারে ? কি সঙ্কীর্ণ তার ঘর, কি অশুদ্ধ তার সজ্জা। কি ভীষণ বাসনাগন্ধ তার কোণে কোণে, সিগারেটের প্যাকেট, বিয়ারের বোতল, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, অতিথি পরচর্চা, সন্দেহ, ক্রোধ, ব্যভিচার। সেইখানে ওই বিরাট কিভাবে ঢুকবেন ? দেহ না হয় তিনি সঙ্কুচিত করলেন, কিন্তু আত্মাকে সঙ্কুচিত করবেন কি ভাবে ? নীলম মনে মনে বলল—এষা, তুমি আমার বাড়ি বেড়াতে এসে খুবই ভালো করলে। আমার চোখের ওপর একটা চকচকে পর্দা ছিল সেটা খসে পড়ে গেল। একেই বোধহয় বলে হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। প্রত্যেকের নয়ন-সূর্যের সামনে এইরকম একটা মিথ্যা চাকচিক্যের আবরণ থাকে। চোখ চাইলেই সেটাকে দেখা যায়, মনে হয় আহা কি সুখে আছি। নির্বোধের স্বর্গে বাস করি আমরা। সত্য সেই পর্দা না খসলে তো দেখা যাবে

না ! এষা, অরিত্রকে আমি তোমায় দিলাম। একদিন তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম, খুব গর্ব, খুব আত্মপ্রসাদ, বিজয়বোধের সঙ্গে যে কলেজ স্ট্রীট চত্বরের সবচেয়ে উজ্জ্বল নারীলোভন মানুষটি তোমাকে ফেলে আমার কাছে চলে এসেছে, সে গর্ব কত স্বার্থপর। কি পাপ, কি ছেলেমানুষি তা এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি, অরিত্রকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। মহানামকেও আমি তোমায় দিলাম। মহানামকে একদিন আমি প্রবঞ্চনা, হ্যাঁ প্রবঞ্চনাই করেছিলাম। তিনি কোনও শাস্তি দেননি, কোনও ক্ষতিপূরণ দাবী করেননি। কিন্তু তিনি যদি চান ; সত্যি সত্যি চান তো পুপুকেও আমি দিয়ে দেবো। পুপুকে আমি এবার ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে সব সত্যি কথাগুলো বলব। সে যে কি মহান ব্যক্তির সন্তান তা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার অপরাধ আমি আর বাড়াব না। পুপু যথেষ্ট ধীর-স্থির, বুঝে সুঝে বললে সে নিশ্চয়ই ভালোভাবেই নেবে। আর যদি ভালোভাবে না নেয়, নীলমকে যদি ত্যাগ করে ঘৃণায়, অভিমানে তা-ও সে সহ্য করবে। বুক ভেঙে যাবে তবু সহ্য করবে। জীবনে কত কিছু পাওয়া হয়েছে যার কোনও মূল্য দেওয়া হয়নি। মূল্য দাও নীলম যোশী, মূল্য দাও নিজ হাতে, তারপর যা মহামূল্য, যা অমূল্য তার দিকে হাত বাড়িও। বস্তুত মার-কন্যা রতির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে, গুলিয়ে ফেলছিল নীলম। তার খালি মনে হচ্ছিল মহানামের সেই উক্তি : 'দ্যাখো তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে নিজেই না তপস্যায় বসে যায় মেয়েটা।' স্বয়ং মার-কন্যার পক্ষে যদি তপস্যায় বসে যাওয়া সম্ভব হয়, তা হলে তার আনুপূর্বিক জীবনের শুদ্ধায়ন কি নীলম যোশী চৌধুরীর পক্ষে একান্তই অসম্ভব ?

অরিত্র তার নিজের ভাবে এমন নিঃশেষে ডুবে ছিল যে নীলমের ভাবান্তর সে তিলমাত্রও বুঝতে পারেনি। সমস্ত অজন্তা তার কাছে এষাময়। প্রত্যেকটি নায়িকা, প্রত্যেকটি রাজকুমারী, প্রত্যেকটি নারী তার কাছে এষা প্রেষা। গুহাময় সুন্দরীদের এমনি কৃষ্ণবর্ণা করে করে আঁকলেন কেন শিল্পীরা ! তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল, দূরদৃষ্টি ছিল। মহানাম বলেছিলেন —'শক হুণদল পাঠান মোগল বহু জাতি বহু দস্যু এসেছে ভারতবর্ষে কিন্তু আমাদের নান্দনিক বোধকে তেমনভাবে প্রভাবিত বা বিকৃত করতে পারেনি, যেমন পেরেছে ইংরেজ। প্রকৃতপক্ষে এই ইংরেজরা আসার পর থেকেই আমরা গৌরবর্ণকে, একমাত্র গৌরবর্ণকে সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে মনে করতে শুরু করি। 'সর্ব দোষ হরে গোরা।' এর চেয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি আগে আমাদের ছিল। এই তো অজন্তা গুহাময় কত নারী, তার মধ্যে গৌরবর্ণাগুলি পরিচারিকা, সখী, অপ্রধান। পারসিক রানী সিরিন অবশ্য সত্যের

খাতিরেই শ্বেতকায়া, কিন্তু সুন্দরী বলে খ্যাত মেয়েগুলি, নায়িকাগুলি সবই শ্যামলী, কেউ-কেউ তো রীতিমতো কৃষ্ণকায়া। শ্রমণরা তাঁদের চারপাশে যেসব রূপসীদের দেখতেন তাঁরা কেউই ইউরোপীয় অর্থে গৌরবর্ণা ছিলেন না, সেই বাস্তবকে তাঁরা মোটেই উপেক্ষা করেননি।'

অরিত্রর কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে। সৃষ্টি হবার তেরশ বছর পর শিল্প তো আর কখনোই শিল্পীর থাকে না। দ্রষ্টা-দর্শকদের কাছে তার বাণী যা, তাতেই তার মূল্য। শিল্পীরা তাঁদের চারপাশে কি বাস্তব দেখেছিলেন না দেখেছিলেন তার ঐতিহাসিকতা নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই। তার মনে হচ্ছে তার চিরন্তনী এমন ছায়াময়ী হয়ে এসেছে তাকে পায়নি বলে। তাই সে বিষাদরূপিণী। অজন্তা গুহাচিত্রের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম উপায়ে সে তাকে তার ব্যথা জানাতে এসেছে। প্রত্যেকটি দুঃখিনী কৃষ্ণার সামনে সে গিয়ে দাঁড়ায়, আর তার মনটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। মনে মনে সে বলে —'হায় ছায়াবৃতা।'

যেদিন এষা প্রথম তাকে নীলমের সঙ্গে দেখেছিল, যেদিন বুঝতে পেরেছিল নীলমের সঙ্গে সে কতটা ঘনিষ্ঠ, সেদিন তার কি মনে হয়েছিল ? কি সে তীব্র যন্ত্রণা, মনে করতেও অরিত্রর বুকে ছুঁচ ফুটছে, শেল বিঁধছে। উঃ, কি করে সে অমন নিষ্ঠুর হতে পারল ? তারও পর এষা তাকে নিজ মুখে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, মেয়ে হয়ে, আর অরি কি করেছে ? সাজানো ভাষায় তাকে প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কি বলা যায় ? তারপর ? তারপর উনিশ বছরের সেই কাঁচা মেয়েটা, যে-অবশ্য নিজেকে খুব বড়, খুব বোদ্ধা ভাবত, সেই এষা-প্রেষা হারিয়ে গেল। বুদবুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু এক খাতা কবিতা। একটা বই কি একটা মানুষের সঙ্গে সমান হতে পারে ? এই সময়ে সে সপ্তদশ গুহায় মরণাহত রাজকন্যা জনপদকল্যাণীর ফিকে হয়ে আসা ছবিটি দেখছিল। তার প্রাণ তখন ব্যথায় মুচড়ে উঠছে। সে দেখল এষা ছবিটার সামনে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিতে অনেক চরিত্র, মুকুট হাতে আছে ভগ্নদূত, কল্যাণীকে ধরে আছে তার সখীরা, এষা প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি দেখতে ব্যস্ত ছিল। অরিত্র দেখল নীলম একটু দূরে দাঁড়িয়ে এষার দিকে তাকিয়ে আছে। অরিত্র মনে মনে ভাবল—এষা যদি চায়, নীলমের কাছে সে ডিভোর্স চাইবে এবার। নীলমের নামে সে যথেষ্ট সম্পত্তি করেছে। নীলমের কোনই অসুবিধে হবার কথা নয়। তার জীবনটা নীলম এবং এষার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ারই কথা। ভালো সময়টাই নীলম পেয়েছে। এবারের অংশ এষার। কিন্তু পুপু ? সে-ও পর হয়ে যাবে ? না, না, পর কেউ হবে না। নীলমও না। তারা সকলেই এখন এমন

একটা বয়সে পৌঁছেছে যখন সঙ্গিনী বদলটা জীবনের ছকের একটা মস্ত ওলটপালট বলে আর গণ্য হওয়া উচিত নয়। পুপু বড় হয়েছে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। নীলম যেমন পুপুকে নিয়ে আছে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে নীলমের সঙ্গে তার সম্পর্ক তো এখন বন্ধুর মতো, ভাই-বোনের মতই। তবে আর বাধা কি ? তবে পুনেয় থেকে ব্যাপারটা সম্ভব নয়। লোকাপবাদ এই বয়সে সহ্য হবে না। বম্বেতে সে ট্রানসফার নিয়ে নেবে। এমন কিছু অসুবিধে হবে না। জীবনের সমস্যা এবং নিজের ইচ্ছার এইরকম একটা বিলিব্যবস্থা করতে করতে অরিত্র মনে মনে খুব সুস্থ হয়ে উঠছিল। একদিন যে অস্থিরতা তাকে তাড়া করে ফিরছিল, সেটা একটু একটু করে অদৃশ্য হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সে চুপিচুপি এষার দিকে তাকাচ্ছিল। তরুণী শালতরুর মতো শ্যাম, স্নিগ্ধ, শুধু চিবুকের ডৌলটুকুই তাকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। দেখতে দেখতে সে একেবারে নিশ্চিত বুঝতে পারছিল এষাও তাই-ই চায়। খালি পুপু আর নীলম দুঃখ পেতে পারে বলে প্রকাশ করে না। অনেক সময় দুটো ট্রেন ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনের দিকে সমান তালে ছুটতে ছুটতে পাশাপাশি হলে দুটোরই মনে হয় অপরটা থেমে আছে। অরিত্র একেবারেই বুঝতে পারছিল না এষার গতি ভিন্ন স্টেশনমুখী, সে ভাবছিল এষা বুঝি থেমে আছে। তার পাশাপাশি। হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যাবে।

সীমা চলছিল একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে। অনেক সময়ে নিজের পরিচিত প্রতিবেশ ছেড়ে বেরোলে এরকম একটা মুক্তির বোধ হয়। বিশেষত সীমা এসেছিল এমন কয়েকজন মানুষের সঙ্গে যাদের কাছাকাছি হওয়া বা ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি। বিক্রমের পরিচিতের গণ্ডি ব্যবসাদার, এবং নানারকম ধান্দাবাজ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গান-বাজনার জগতের থেকেও বিক্রম এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এষা, মহানাম ঐদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা সহজ মুক্তির স্বাদ অনুভব করছিল। যেন তার প্রকৃতিকে একটুও ব্যাহত না করেও আবৃত না করেও শুধু এই সঙ্গ তাকে তার রাক্ষসী ভাগ্যের হাত থেকে ক'দিন রক্ষা করে চলেছিল। সীমা নিজেকে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করছিল, এবং সে আবিষ্কারকে কাজে লাগাচ্ছিল। সে জানত না, কিশোরী বয়সে বিক্রমের শেখানো 'চণ্ডালিকার' গান তার এখনও মনে আছে। সতের নম্বর গুহায় বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুলের সেই বিখ্যাত চিত্র দেখে তার সমস্ত মন প্রাণ গাইছিল—'জল দাও আমায় জল দাও।' সে বুক ফাটিয়ে বলতে চাইছিল—'আমি তাপিত পিপাসিত, আমায় জল দাও।' বস্তুত এই গান বহুদিন

আগে তাদের বাড়ির কাছে রবীন্দ্রভবনে বিক্রম গেয়েছিল তার নিজের পরিচালিত নৃত্যনাট্যে, আনন্দের গলায়, এবং প্রকৃতির কণ্ঠে সীমা প্রাণ ভরে গেয়েছিল—'আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র।' এখন সেই গান যেন সীমার কণ্ঠ থেকে ফোয়ারার মতো উঠতে চাইছিল। গুনগুন করে মাঝে মাঝে গেয়েও ফেলছিল সে। তার এই জল পাবার আকুতি নিয়ে কিন্তু সে আদৌ পীতাভ বুদ্ধমূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল না। তার উদ্দিষ্ট ছিল বিক্রম, বিক্রম এবং বিক্রম। এই মানুষটির জন্য সে মায়াবিনী, ডাকিনী, যোগিনী, ভোগিনী, রোগিণী এমন কি সন্ন্যাসিনী হতেও রাজি ছিল। বিক্রমকে বুদ্ধদেবের জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে এক গুপ্ত আবেগে আপাদমস্তক আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল। একবারও মনে হয়নি বিক্রমকে বুদ্ধদেবের ওপর বা বুদ্ধদেবকে বিক্রমের ওপর আরোপ করে সে কোনও অসামান্য ভুল করছে। তার আবেগের ভূমিতে যুক্তির একটি স্তম্ভও ছিল না। কাণ্ডজ্ঞানেরও কোনও নিয়ম সেখানে খাটছিল না। একটার পর একটা চিত্রে সে নিজেকে খণ্ডিতা নায়িকা এবং বিক্রমকে উদাসীন নায়ক সাজিয়ে দুঃখরূপ আনন্দ পাচ্ছিল, মনে মনে গাইছিল—'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।' চলতে চলতে আরও একটা জিনিস ঘটছিল। সে যেন এষার কাছ থেকে তার কিছু ইন্দ্রজাল, নীলমের কাছ থেকে তার কিছু রূপ পরিগ্রহ করে পূর্ণতর নারী হয়ে উঠছিল। এবং মহানাম ও অরিত্রর কাছে যাচিয়ে নিতে চাইছিল তার পরিগ্রহ সম্পূর্ণ হল কি না। সম্পূর্ণ হলে তবেই বুঝি সে তার পূর্ণ মহিমায় দর্পী গ্রীবা উন্নত করে বিক্রমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। বলতে পারবে—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না!'

এষার কাছে সমগ্র অজন্তা-অভিজ্ঞতা একটা অলৌকিক বেদনা। যে কোনও শিল্পীই যদি মহৎ শিল্পী হন তাঁর সৃষ্টি বহুমাত্রিক হবেই। সেই বহুমাত্রিকতা তাঁদের জ্ঞান এবং সময়ে সময়ে ধ্যানেরও অগোচরে ঘটে। যে বৌদ্ধ শিল্পীরা পরম ভক্তিভরে তথাগত শাক্যমুনির জননান্তর-সৌহৃদ-স্মৃতিকাহিনী চিত্রার্পিত করেছিলেন তাঁরা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন মহামানবের মহিমা ছাপিয়ে উঠবে তাঁর বঞ্চনার বিষাদ আজি হতে দ্বিসহস্র বর্ষ পরে কোনও দর্শকের কাছে ?

সিদ্ধার্থ জননী মায়া স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লোকে বলে মহামানবের জন্ম দেবেন এই সংবাদে মায়াদেবী ভাবমগ্ন। এষা দেখল এই তরুণী জননী গর্ভভারে পীড়িত, অনাগত ভবিষ্যতের অমোঘ দায়ে ভারাতুর। মহামানব আসছেন, কিন্তু তাঁকে বিদীর্ণ করে। এই শুদ্ধোদন মাধুর্যে পূর্ণ, রাজঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ অপরূপ জীবন, এমন কি আসন্ন মাতৃত্বের আনন্দ ছেড়েও তাঁকে চলে যেতে

হবে। না জানি কি কঠিন যন্ত্রণায়!

কপিলাবস্তুতে ফিরে এসে সিদ্ধার্থ তাঁর ভাই গৌতমীপুত্র নন্দকে প্রব্রজ্যা দিচ্ছেন। নন্দর বাগ্‌দত্তা জনপদকল্যাণী সংবাদ শুনে মৃত্যুমূর্ছায় এলিয়ে পড়ে আছে। অদূরে প্রত্যাখ্যাত রাজমুকুট হাতে ভগ্নদূত, রাজকন্যার মুখশ্রীকে করুণ মৃত্যু যেন উপহাস করছে। চোখে তার, যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার, স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার। গুহার পর গুহায় কড়ির মতন শাদা মুখ, হিম হাত, বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা নারীরা বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত দু চোখ নিয়ে যেন এষার পেছন পেছন আসে, আকাশে হাত বাড়িয়ে বলে—চাই। তোমায় চাই। প্রতিধ্বনি বাজে এষার শূন্যগর্ভে, বুকের ফাঁকা প্রকোষ্ঠে। মহাজনক জায়া সীবালি, রাহুলকে কোলের কাছে ধরে করুণ নয়না যশোধরা। নিমীলনয়না কৃষ্ণা রাজকুমারী, এমন কি আকাশে উড্ডীন কৃষ্ণা অপ্সরা পর্যন্ত যেন একটিই করুণ গীতিকবিতা। সীতার কান্না, রতিবিলাপ, রাধার হাহাকার। কে যেন বিপুল প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, কথা রাখেনি, চরাচর শূন্য করে চলে গেছে।

বেদনার যে তীব্র বোধ আচ্ছন্ন করছে, বিদ্ধ করছে চেতনা তাকে এষা কী নাম দেবে ভেবেই পায় না। অথচ এই বোধ তাকে পিষ্ট করছে না একদম। মাটির নিচ থেকে যেন শক্তিশালী ধূম্রজালের মতো উচ্ছ্রিত হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে শূন্যে, এখনই হয়ত সে অতিক্রম করে যাবে সেই আয়নোস্ফিয়ার যার পরে প্রকৃত মহাশূন্য এবং অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ-তারার প্রতিবেশ। অ্যাস্টারয়েড-পিণ্ড সেখানে তীব্র বেগে ছুটে চলতে চলতে হঠাৎ জ্বলন্ত উল্কা হয়ে শূন্যের খাতায় জ্যোতির্লেখা এঁকে দেয়, গ্রহ নিচয়সহ সূর্য সেখানে অনন্ত অলাতচক্রে ঘুরে চলে, ঘুরে চলে আর রুদ্ধ কণ্ঠে বলে আমায় পৌঁছতে দাও, কোথাও পৌঁছতে দাও। হে নিয়তি, হে বিধাতা, এই **চক্রাবর্তনের** পৌনঃপুনিকতা আমায় ক্লান্ত করে, ক্লান্ত ক্লান্ত করে। এমন এক পথ সৃষ্টি করেছ, হায় যেখানে পিছিয়ে পড়ারও উপায় নেই। সচল পথ তার নিজের নিয়মে চলে, চালিত করে।

এই অনুভূতি এষাকে সকলের থেকে আলাদা করে দিচ্ছিল যেন এ তার কবিকথিত এক মুদ্রাদোষ। বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল সবার থেকে, তাই একরকম বিপন্নও করছিল। কারণ বিশ্বের সঙ্গে যোগে বিহার করতে না পারলেই নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। এষার মনে হচ্ছিল বহু যুগ আগে থেকে শুরু হয়েছে তার এই একাকিত্বের বেদনা। এ কখনও এক জন্মের নয়।

অথচ সেই একই সময়ে মহানাম আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন এক তুলনাহীন আনন্দে। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন এক মহাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা শতদল পদ্মের মতো ফুটে উঠছিল। অগগোহহম অস্মি লোকস্‌স। পৃথিবীতে আমিই অগ্র, আমিই সর্বপ্রথম যে তা পাবে। কি যে পাবেন, তা তাঁর স্পষ্ট করে জানা নেই। জানতে কৌতূহলও নেই। শুধুমাত্র প্রাপ্তির সংবাদই তাঁকে এমনভাবে অভিভূত করেছে, আপ্লুত করেছে যে তিনি তাঁর আনন্দকে মনের পশ্চাৎপটে নিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানমার্গে লঘুপদে বিচরণ করছিলেন। প্রত্যেকটি চিত্রে বিধৃত জাতক-কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন সঙ্গীদের। কপ্পিয়া-জাতক, বিশ্বান্তর-জাতক, পূর্ণ-ভাবিলার কাহিনী। কখনও গাইড স্বয়ং এবং দলের অন্যান্য শ্রোতারাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। থামের ওপর হাত রেখে তিনি তার নির্মাণ সৌকর্যের প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করছিলেন। অজন্তা ফ্রেসকো, মিকালেঞ্জেলোর বিখ্যাত লাস্ট জাজমেন্ট সিসটিন চ্যাপেলে, চীনের টুন-হুয়াং গুহাচিত্র। প্রাগৈতিহাসিক মানবও এই গুহাকেই কেন তার শিল্পসাধনার পীঠস্থান বলে মনে করেছিল। স্থান নির্বাচনে শিল্পীতে শিল্পীতে এই যোগসূত্র। আরও বলছিলেন কালিদাস সাহিত্যের চিত্ররূপ হিসেবে অজন্তাচিত্রকে দেখবার আলাদা আনন্দের কথা। কারণ অজন্তা চিত্র আর কালিদাসের কাল, অর্থাৎ কালিদাস প্রভাবিত ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের কাল মোটের ওপর সমসাময়িক। 'কুমারসম্ভব', বিশেষ করে 'মেঘদূতে'র চরিত্রগুলিই যেন শিল্পীর তুলিতে গুহায় গুহায় ফুটে উঠেছে।

'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়া পাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম॥'
"হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসরের পরাগে হয়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,
এবং তুমি যাকে ফোটাও, সেই নীপে সিঁথির প্রসাধন বধূদের।"

মন্দ্র-কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছিল গুহা থেকে গুহান্তরে। তাঁর আনন্দ তাঁর চারপাশে এমন একটা আলোর বলয় সৃষ্টি করেছিল যে তিনি সঙ্গীদের অবস্থান্তর, ভাবান্তর, লক্ষ্য করতে পারছিলেন না আদৌ। বিক্রমের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, সীমার করুণ চঞ্চলতা, নীলমের অনুতাপ এবং **সম্মিতি**, অরিত্রর সিদ্ধান্ত, এষার

বিষাদ কোনও কিছুই লক্ষ্য না করে তিনি অজন্তার জগতে সিংহশাবকের মতো বিচরণ করছিলেন। কানে বাজছিল কখনও ইন্দ্রবজ্রা, কখনও উপেন্দ্রবজ্রা, মন্দাক্রান্তা, কখনও বা শার্দুল বিক্রীড়িত।

॥ ১৬ ॥

পাহাড় থেকে নেমে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মহানাম বললেন—'আমি একটা দিন থেকে যাই। প্যানেলগুলো দেখতেই ব্যস্ত ছিলুম, সীলিং-এর কাজগুলো ভালো করে দেখা হয়নি। কয়েকটা ছবি, গুহার ফাসাদ্—এগুলোও দেখা দরকার।'

এষা বলল—'আমার তো ফিরতেই ইচ্ছে হচ্ছে না আর। সম্ভব হলে কোনও বিহারে পাথরের বালিশে মাথা রেখে, পাথরের শয্যায় কাটিয়ে দিতুম'। রোজ সকাল সন্ধে একবার করে ওই হর্ষ-বিষাদ আর ধ্যানমগ্ন অমিতাভকে দেখা যেত।'

বিক্রম বলল—'নিবৃত্তি মার্গ বলে একটা ব্যাপার আছে না? আহা, আপনি যদি ওই মার্গে যান আরও কত গেরস্থ যে সন্নিসি হয়ে যেতে চাইবে এষাজী। সব গুহা-বিহার-সঙ্ঘারাম একেবারে জ্যাম-প্যাকড হয়ে যাবে। অমন কাজটিও করবেন না।'

নীলম আবিষ্ট স্বরে বলল—'আমি মূর্খ মানুষ। যা দেখেছি তাই আমার যথেষ্ট। অরিত্র, আমি ফিরব।'

বিক্রম মহা উৎসাহে বলল—'কোই বাত নেই। আমি তো ফিরছিই। নীলম ভাবী আমার সঙ্গে চলুক। বাস-টাস ধরবার দরকার নেই। চৌধুরীদাও নিশ্চয়ই থেকে যাবেন।'

নীলম ফেরবার কথা বলতে অরিত্র মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিল। সে তো ঠিক অজন্তা দেখতে আসেনি। এষা দেখতে এসেছিল। এষা নিঃশেষ হয়নি। এষাকে এখানে মহানামের তত্ত্বাবধানে রেখে সে কেমন করে ফিরবে? অথচ নীলমের ফেরার সঙ্কল্পটা যে একটা চ্যালেঞ্জের মতো সেটা সে বেশ বুঝতে পারছে।

বিক্রমের কথায় তার সুবিধে হয়ে গেল। সে বলল—'ন্যাচার‍্যালি। অজন্তা তো একদিনে দেখবার জিনিস নয়। আমাদের মতো আনাড়িদের জন্যও অন্তত দু'দিন। বিশেষত মহানামদা যেখানে গাইড সেখানে সুযোগ ছেড়ে দেওয়া বোকামি। নীলম, একটা রাত থেকে যেতে তোমার কি অসুবিধে?'

নীলম উদাস সুরে বলল—'আমার যা দেখার, যা বোঝার দেখা, বোঝা হয়ে গেছে অরি, তুমি থাকো না। তোমাকে তো বারণ করছি না! আমি যাই।'

বিক্রম বলল—'আমি খুব সাবধানে গাড়ি চালাব। নীলম ভাবী পুরো পেছনের সীটটা জুড়ে শুয়ে-বসে যেতে পারবে। কোনও ভাবনা নেই। তা ছাড়া সীমাও তো সঙ্গে রইল। সো স্মার্ট, সো রিসোর্সফুল, ভয় কি!'

বিক্রম প্রায় চোখ ছোট করে পিঠ চাপড়াচ্ছে অরিত্রর। গা ঝাড়া দিয়ে অরিত্র বলল—'কী নীলম, তোমারও কি তাই-ই ইচ্ছে?'

নীলম বলল—'এতোটা রাস্তা একা একা বাস বদল করে করে যাওয়ার চেয়ে সীমাদের সঙ্গে যাওয়াই তো ভালো। মহানামদা,আমি আসছি, এষা ভালো করে দেখো, তোমার জন্যেই আমার অজন্তা দর্শন হল। এতো কাছে থেকেও তো এতদিন দেখিনি!'

নীলম নীরবে দরজা খুলে গাড়ির পেছনে উঠে পড়ল। সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। অরিত্র জানলায় কনুই রেখে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'নীলম, শরীর খারাপ করছে না কি?'

'নাঃ, ক্লান্ত, খুব থকে গেছি।'

'তোমার ওপর দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বড্ড খাটুনি যাচ্ছে। সেই আমার অ্যাকসিডেন্ট থেকে আরম্ভ হয়েছে। তোমার বাহনটি তো আসে আর যায়। তুমি গিয়ে সব কিছু ওই বাইকে দিয়ে করাবে বলে দিলুম। আর আমরা তো কালই ফিরে যাচ্ছি।'

নীলম মনে মনে বলল—আর কোনদিনও ফিরবে না অরিত্র। সে আমি বুঝতে পেরেছি। অমন ফেরা ফিরেও তোমার কাজ নেই।

অরিত্র বলল—'বাড়ি গিয়েই পুপকে ফোন করো। ওকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আসতে বলবে। আমরা ওকে ভীষণ মিস্ করেছি বলবে।'

নীলম মনে মনে বলল—পুপুকে তুমি আর পাচ্ছো না অরি। তোমাকেও কিছু মূল্য দিতে হবে। এ ক'টা দিন পুরো সময় পাবো। কাল বিকেলে পুপুর পরীক্ষা শেষ। তারপরে আমি আর পুপু শূন্য ঘর অনেক কথা দিয়ে ভরবো।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ছাড়বার পরও অরিত্রর শেষ কথার রেশ নীলমের কানে লেগে রইল। পুপু, পুপে, পরীক্ষাটা ওর কেমন হল কে জানে! মাত্র দুদিন বাড়ি ছাড়া। অথচ মনে হচ্ছে যেন কত দিন! কত যুগ! পুপু যেন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে নদী ওই বহে চলে যায়। কিসের নদী? কি এমন নদী যা পার হওয়া যায় না? একি বিস্মরণের নদী!

সূর্য অস্ত গেল সাতটারও পরে। এখনও হালকা অন্ধকারে ভেসে আছে চারদিক। নিচের দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করার আশায় গিয়েছিল এষা। হতাশ হয়ে ফিরল। মহানাম বললেন—'একটা জিনিস ভুল করছ এষা। কোণার্ক বা জগন্নাথ মন্দিরের শিল্পীদের উত্তরসাধক এখনও পর্যন্ত আশেপাশে শিল্পী পাড়ায় বাস করেন, তাঁদের হাতে স্মৃতি এখনও জাগ্রত। সেখানে তুমি কোণার্ক যক্ষীর ডুপ্লিকেট পেতে পারো। এখানে তেরশ বছরের ব্যবধান। তারা কে, কোথায় গেল, কেন গেল, সবটাই তো রহস্য!'

এষা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'তাঁরা হয়ত মোক্ষ পেলেন, তাঁদের শিল্পও এবার নির্বাণ পাচ্ছে। মহাপরিনির্বাণ। আমাদের দেশে এই যে নিবৃত্তির সাধনার বাড়াবাড়ি, তারই জন্য কি আমাদের এতো অধঃপতন? বুদ্ধদেব নিজে তো প্রব্রজ্যা নিলেনই, সমকালীন ভারতবর্ষে যেখানে যত সম্ভাবনাময় পুরুষ ছিল তাদের সবাইকে নেওয়ালেন। তাঁর ভাই নন্দ যদি জনপদকল্যাণীকে বিবাহ করে শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী হয়ে রাজ্য চালাতেন কি এমন ক্ষতি হত? রাহুলকেও যে পিতৃধন বলে বালক বয়সেই সন্ন্যাস দিলেন, আর কি তার সময় ছিল না? আনন্দও তো ওঁর খুড়তুত ভাই ছিলেন বলে শুনেছি। ক্ষত্রিয়দের এই তপস্বী বৃত্তি অবলম্বনকে আমি কিছুতেই কল্যাণকর বলে দেখতে পারি না মহানামদা। চৈতন্যও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কি দারুণ শক্তিমান, ধীমান, সংস্কারমুক্ত বীরপুরুষ ছিলেন, বীর্য আর জ্ঞানের সংমিশ্রণে কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব! সংকীর্তন আর ভাবসমাধি ছাড়া আর কিছু করে কি দেশের কাছে, জাতির কাছে, মানুষের কাছে তাঁর কর্তব্য করতে পারতেন না? একালে এলেন বিবেকানন্দ, দরিদ্র মানুষের সেবা করলেন, বীর্যের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু আবারও দেশময় সেই সন্ন্যাসী-সৃষ্টির মহোৎসব পড়ে গেল। তাহলে পরবর্তী প্রজন্মগুলো সৃষ্টি করার জন্য যুগে যুগে পড়ে থাকছে কারা বলুন তো? ওই কুটিল বুদ্ধশত্রুরা, দুশ্চরিত্র জগাই মাধাই, আর বাবু-কালচারের 'সধবার একাদশী'র বাবুরা। এইভাবে দিনের পর দিন আমরা পেছু হটছি। আশ্চর্য কি, এই ভারতবর্ষ দুর্বল, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, ধান্দাবাজ আর হিংসুকদের জন্ম দেবে! ফিরে আসবে না আর কুরু পিতামহ ভীষ্ম, কি রামচন্দ্র, লক্ষণ, ভরত, পঞ্চপাণ্ডব যাঁরা প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশ-দশ-সমাজের জন্য দান করে গেছেন! আপনি চিন্তা করে দেখুন রামচন্দ্রের সীতাত্যাগ বা পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের ভীষণতার পরেও রাজত্ব সে কি দশের মুখ চেয়েই নয়?'

অরিত্র বলল—'ওরে বাপ রে! কি লেকচার! তুমি তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের

এইসবই বলো না কি উইথ সাচ প্যাশন? জাতির জীবনীশক্তি কি কয়েকটা মানুষের কাছে গচ্ছিত থাকে? তাহলে তো মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপেও আর মানুষ জন্মাবার কথা নয়।'

'মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপ যে পড়ো জমি, আর তার মানুষরা যে সব ফাঁপা মানুষ সে কথা তো ওদের কবিই আমাদের বলে গেছেন অরিত্র। মহাযুদ্ধের পরের ইতিহাস আর য়ুরোপের নয়, আমেরিকার ইতিহাস। তবে জার্মানি যে কি মন্ত্রে এই বিপুল ক্ষতি হজম করে, দেশবিভাগ সহ্য করেও আবার এমন সুন্দর করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার জানা নেই।'

মহানাম বললেন—'ভারতের অধঃপতনের কারণ তো কখনই একটা নয় এষা। বাইরের শত্রুর কাছে ভারত বরাবর হার মেনেছে অন্তর্কলহের জন্য—কৌরব-পাণ্ডব, অম্ভি-পুরু, জয়চাঁদ-পৃথ্বিরাজ, নেহরু-জিনাহ্, তারপর ইদানীং ভিন্দ্রানওয়ালে, ঘিসিং,....চলছে তো চলছেই। আর একটা বড় কারণ আমাদের বৃত্তিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার আদি অভ্যাসগুলো। যে ব্রাহ্মণ সে খালি যজন-যাজন-অধ্যাপনাই করবে, আত্মরক্ষা করতে জানবে না, যে বৈশ্য সে খালি চাষ-বাস-ব্যবসা-বাণিজ্যই করবে অস্ত্রশিক্ষা করবে না, আর শূদ্রর তো কথাই নেই। অর্থাৎ শত্রু উপস্থিত হলে রক্ষা করতে মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কেউ নেই।'

এষা বলল—'সেই ক্ষত্রিয়দেরও তরোয়াল ফেলে দিতে শেখানো হল। ওই যে বিশ্বান্তর জাতকে রাজপুত্র বিশ্বান্তর তরোয়াল দান করে দিলেন। প্রজারা যে ক্ষেপে উঠেছিল, সে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল বলেই।'

'গোড়ায় কিন্তু এরকম ছিল না। দ্রোণাচার্য, পরশুরাম, অশ্বত্থামা এঁরা ব্রাহ্মণ হয়েও যুদ্ধ ব্যবসায়ী।' —মহানাম বললেন।

অরিত্র বলল—'এঁরা যে ব্যতিক্রম, সেটা বোঝাতে মহাভারত কিন্তু যথেষ্ট গল্প ফেঁদেছে।'

মহানাম বললেন—'আদিতে যে শ্রেণীবিভাগহীন সমাজ ছিল, এঁরা সেই সমাজের শেষ চিহ্ন এ-ও হতে পারে। আসলে এই শ্রেণীবিভাগ ওরা মহেঞ্জোদড়োর দ্রাবিড় সভ্যতা থেকে পেয়েছিল। ভারতে প্রবেশ করবার আগে আর্যদের নারী, বালক সকলেই অস্ত্র ধারণ করতে জানত। সেইজন্যই ওইরকম সুসংগঠিত দ্রাবিড় সভ্যতা ধ্বংস করা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাদের চেয়ে বহু বিষয়ে অজ্ঞ এবং দীন হয়েও। তারপর সভ্যতার এই রোগ তাদেরও আক্রমণ করল। মেয়েরা ধনুর্বাণ ফেলে যাঁতা, বঁটি, খুন্তি তুলে নিল। বালকরা লাঠি আর

কন্দুক। ফলে দ্যাখো আজ এমন বিশেষীকরণের দিন এসে গেল যে দাঁতের ডাক্তার আর কানে হাত দিতে পারে না।'

বলতে বলতে মহানাম উঠে পড়লেন—'তোমরা বসো। আমি একটু ব্যায়াম করে আসি।' মহানাম নিজের ঘরে চলে গেলেন। মহানাম আর অরিত্রর একটা ঘর। এযার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। খাটটা একপাশে, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। চেয়ার দুটোয় ওরা বসেছিল, এযা বসেছিল খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে।

অরিত্র বলল—'একটু চা কিংবা কফি বলি, কি বলো?'

এযা বলল—'বলো।'

চায়ের কথা বলে অরিত্র ফিরে এলে এযা বলল—'অরি, তোমার মনে পড়ে তুমি কিরকম আমাকে হেদুয়ার মোড় থেকে কালেক্ট করে মহানামদার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে ডাফ লেনে, দারুণ একটা চমক দেবে বলে? মহানামদা সেইমাত্র অক্সফোর্ড থেকে ফিরে কৃত সিনিয়রকে টপকে নেহাত অল্প বয়সে প্রফেসর হয়েছেন বলে কী গণ্ডগোল, দুর্নাম! এদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা সব হাঁ করে ওঁর লেকচার গিলছে! মনে আছে অরিত্র, আমি নিতান্ত অবাচীন আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট হয়ে ওঁর সঙ্গে কিরকম সমান তালে তর্ক করতুম!'

অরিত্র বলল—'সবচেয়ে মজা হল মহানামদা যেদিন রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে নস্যাৎ করলেন, সুধীন দত্তর প্রোজ স্টিলটেউ বললেন, আর তুমি ভালো গদ্যের উদাহরণ চাইতে 'মানুষের ধর্ম' থেকে উদ্ধৃত করলেন। তুমি ঠকতে ঠকতে বেঁচে গেলে, তীরের মতো উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছো 'রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ!' এ দৃশ্যটা আমি এখনও দেখতে পাই।'

এযা বলল—'তুমি কি রকম রেগে গিয়েছিলে? মহানামদা হাসতে হাসতে বলে দিলেন কোনও বড় লেখককে পুরোপুরি খারিজ করা যায় না, অমুকের গদ্য, তমুকের পদ্য বলে আলাদা একটা ব্যাপার তৈরি করা আমার খুব কৃত্রিম অভ্যাস বলে মনে হয়। তোমরা এইরকম করে ভাবো, 'বসুন্ধরা' অতিকথনদোষে দুষ্ট, 'অসম্ভব' একটি অনবদ্য গীতিকবিতা, 'গোরা'-তে লেকচার প্রাণ পায়নি, 'নৌকাডুবি'-তে অনুপম ন্যারেটিভের গুণে রোম্যান্স, উপন্যাস হয়ে উঠেছে, যা নিছক 'রাধারানী' হতে পারত তা 'চন্দ্রশেখর'-এর কাছাকাছি এসে গেছে।'

'তোমার মনে আছে তো ঠিক? আশ্চর্য!' অরিত্র বলল

'মনে থাকবে না কেন অরি, মহানামদার কাছ থেকেই তো সমালোচনার মূল নীতিগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি শিখি, ওসব তো কখনো ক্লাসে

শেখানো হয় না। ধোঁয়াটে কতকগুলো কথা ব্যবহার ছাড়া আর কি শেখায় ওরা বলো? ওঁর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হতে না পারি। কিন্তু পথটা ওঁরই দেখানো। মহানামদাকে জিজ্ঞেস করলে হত 'বসুন্ধরা' কবিতা আর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে'র গদ্য সম্পর্কে ওঁর মতামত উনি পুনর্বিবেচনা করেছেন কি না।'

অরিত্র বলল—'যেরকম 'মেঘদূত' আওড়াচ্ছিলেন, মনে হচ্ছে এখন অনেক ভাবালুতা, অনেক অতিকথনই ওঁর বেশ পছন্দসই হয়ে গেছে। যাই হোক এযা, আমরা কি সারাক্ষণ মহানাম-কথাই আলোচনা করব? আমাদের নিজেদের কিছু কথা নেই?'

এযা হেসে বলল—

'কথা যে ছড়িয়ে আছে জীবনের সবখানে, সব গানে
তারও পরে আছে বাঙ্ময় নীরবতা।'

এযা গা ধুয়ে এসে বসেছে। তার দিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে একটা মৃদু সুগন্ধ হাওয়া আসছে যেন শ্রীবিশাল কালিদাসের কাল থেকেই। ঘন চুল খোলা, ফুলে রয়েছে। ও-ও কি ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকিয়েছে? চুল তার কবেকার···।

'না এযা না, এতযুগ পরে তুমি যদি এলেই, তবে শুধু 'বাঙ্ময় নীরবতা' ছাড়া আর কিছু আমাকে তোমার দেওয়ার নেই, এ কথা আমি ভাবতে পারি না।'

এযা বলল—

'হয়ত বা দিয়ে যাই কবিতা না গান না
ডানা-ভাঙা পাখিটার কান্না
বিশাখা তারার মতো কোনও কোনও মুখোমুখি সন্ধ্যা
অজন্তাগন্ধা
আর কিছু নাই পারি, দেখা যায় যদ্দূর
মাওলি মৃত্তিকায় ধানী রং রোদ্দুর।'

অরিত্র, আমি তো তোমায় অনেকই দিয়েছি। পুরনো স্মৃতির উজ্জীবন, পুরনো অপরাধের ক্ষমা, অবিনাশী বন্ধুত্ব, আর কত দেব?'

অরিত্র প্রায় নতজানু হয়ে বসে পড়েছে। অস্ফুট গলায় বলল—'এযা প্লীজ।'

'আরও চাও?' এযার মুখে আর হাসি নেই। চোখের তারায় কেমন একটা দুঃখ। কেমন একটা আত্মমগ্ন সুদূরতার সঙ্গে সে বলল—'তোমাকে দিলুম ওই অজস্র পত্রপুষ্পহীন রুপোলি শিমূল যারা দীপ্র সূর্যালোকের মধ্যেও লাইটহাউসের মতো জ্বলে, দিলুম এই তীর্থপথের ধূসর করা ধূলি, অমিতাভ মুখের ওই অদ্ভুত হাসি আর বিষাদ যার কোনটারই অর্থ আমি এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি,

বুঝতে চাইও না, আর কি চাও ?'

অরিত্র এষার নবশাল্মলীপত্রের মতো পা দুটো নিজের বুকের ওপর চেপে ধরেছে —কি নরম, মসৃণ, উদার পদপল্লব। পায়ের ওপর গাল, অরি চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে পা।

এষা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার চোখে বিস্ময়, ভুরুতে ভ্রূ দুটি। এবার সে জোরে পা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, চাপা রাগের সঙ্গে ক্ষুব্ধ গলায় বলল —'অরি, তুমি চলে যাও। তুমিও কি সীমার মতন মনে করো আমি একা বলেই আমায় নিয়ে যে যা খুশি করতে পারে ?'

'কেন বুঝছ না ?' অরিত্র আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি, সমর্পণ করছি আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা। তুমি যতটুকু দেবে আমি ততটুকুই নেবো। এষা, আমার কাছে তোমার জীবনের কতটা গচ্ছিত আছে তুমি জানো না। আমাকে না পেলে তুমিই বা পূর্ণ হবে কি করে ?'

এষা বলল—'অরি, তোমার কাছে আমার একটা অতীত অভিজ্ঞতার ঝুলি বই আর কিছু গচ্ছিত নেই। সে ঝুলিও একান্তই আমার। তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে পূর্ণ হবার আমার প্রশ্ন নেই। তোমাতে আমার যে জীবনসত্য ছিল, তা আমি বহুকাল পেরিয়ে এসেছি। তুমি বোঝবার চেষ্টা করো অরি, আমার কাছে আমার বান্ধবী পিকুও যা, তুমিও ঠিক তাই। আমাদের সম্পর্কে আর কোনও লিঙ্গভেদ নেই।'

অরিত্র বলল—'আমার শোণিত তার উল্টো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে। পারস্পরিকতা ছাড়া এরকম হওয়া সম্ভব নয়। এষা, তুমি মিথ্যে বলছ। আসলে তুমি সংস্কার ত্যাগ করতে পারছো না।'

'না, না।' এষা তীব্র গলায় বলল, 'সংস্কার ত্যাগ করতে না পারলে আমি তোমায় সে কথা জানাতুম। আসলে তোমার অহঙ্কারই স্বীকার করতে চাইছে না অরি, আই হ্যাভ টোট্যালি আউটগ্রোন ইউ। নীলমের মতো এমন অসাধারণ রূপসী গুণবতী স্ত্রী পেয়েও কিসের অভাবে তুমি আমার কাছে এমন কাঙালপনা করছ ? ছি, অরি, ছি !'

'হায় এষা, তার সমস্ত রূপ এবং গুণ যোগ করে এবং গুণ করেও নীলম যে তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়। আমি কেমন করে তোমাকে ভুলব !'

এষা বলল—'ঘর থেকে যাও অরিত্র। আমি এবার শুয়ে পড়ব। ভালো লাগছে না আর। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। এখানে এসে আমি ক্ষমার অযোগ্য

ভুল করেছি।'

দরজা বন্ধ করে দিল এষা। সারারাত আর খুলল না। নির্বাক দরজার পেছনে সে যেন নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। রাত্তিরের খাওয়ার সময় মহানাম বললেন—'সে কি ? ও খাবে না ?' অরিত্র দরজার কাছ থেকে ডাকাডাকি করে ফিরে এলো, বলল—'ও খাবে না।'

মহানাম বললেন—'তাহলে আর কি ? এতো বড় ডাইনিং হলে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী টিমটিম করছি। যা-ই বলো আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে, এদের ডালভাজিটা খাসা করে। চলো খেয়ে নেওয়া যাক।'

রাত্রিবেলায় নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে অজন্তার দিক থেকে যেন একটা ভীষণ হাওয়া আসছে টের পেল অরিত্র চৌধুরী। ভীষণ, প্রতিহিংসামূলক হাওয়া। তার বুকের ভেতরটা বেলুনের মতো ফুলে উঠতে উঠতে একসময়ে মনে হল বোধহয় ফেটে বেরিয়ে যাবে। এষা তাহলে এতদিনে, এইভাবে প্রতিশোধ নিল ? এইভাবে তাকে শরীরে, মনে, স্মৃতিতে আপাদমস্তক জাগিয়ে দিয়ে এইভাবে পা ধরিয়ে, তারপর নিপুণ উদাসীনতায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ! এই জন্যেই, এরই জন্যে সে আজ আঠার বছর পরে এসেছিল ! চমৎকার ! শুয়ে শুয়ে অরিত্র যেন আয়নায় নিজের অপমানিত মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল। জটাজুটধারী ভিখারি শিব, অপমানের ভস্মে লিপ্ত। তাকে দু'পায়ে দলিত পিষ্ট করে ডজনে ডজনে মৃত অরিত্রর মুণ্ড গলায় ঝুলিয়েছে মহাকালী, এষা তার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে।

মহানামকে যতটা উদাসীন ভোলানাথ ঠাউরে ছিল অরিত্র, ততটা তিনি মোটেই ছিলেন না। রাতে যখন এষা খেতে নামল না, এবং করিডর দিয়ে তার ঘর পার হবার সময়ে দরজা কি রকম অমোঘভাবে বন্ধ দেখলেন তখনই মহানাম বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। এবং খুব সম্ভব অরিত্রই গণ্ডগোলটা পাকিয়েছে। খুব ভোরবেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন এষা সুটকেস হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। স্নান-টান সারা। চুলগুলো গোছা করে বাঁধা। ছাই-ছাই রঙের কেয়াফুল-ছাপ শিফন শাড়ি পরে একেবারে তৈরি। মহানামকে দেখে চমকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল—'মহানামদা, আমি আর অজন্তায় উঠছি না। রাতটা থাকাই সার হল। এদের কাউন্টারে সুটকেসটা জমা রেখে একটু ঘুরে আসছি,' একটু ইতস্তত করে বলল—'আমি আর আপনাদের সঙ্গে পুনেও ফিরব না। ঔরঙ্গাবাদ থেকে সোজা বম্বে চলে যাবো। তারপর দেখি কি হয় !'

মহানাম বললেন—'হঠাৎ প্ল্যান-পরিবর্তন ? কি ব্যাপার এষা ?'

'আমি যেখানেই থাকি, সব বড্ড জট পাকিয়ে যায় মহানামদা, আমার ভাগ্য !'

মহানাম হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন—'সেবারও পালালে, এবারও পালাচ্ছ ? অরিত্র চৌধুরী তাহলে বরাবরই তোমার ওপর জিতে যাবে ?'

এষা বিষণ্ণ গলায় বলল—'ও যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে আমি না চলে গেলে নীলম সমূহ দুঃখ পাবে। দেখলেন না কাল ও কেমন করে চলে গেল ? যেন আমাকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিয়ে, পরম ধিক্কারে ! অথচ দেখুন, আমি মোটে খেলতেই নামিনি। নীলমই যদি একথা না বোঝে তো অরি কি করে বুঝবে বলুন ! অরির ব্যবহারে নীলম গভীর দুঃখ পেয়েছে। উপলক্ষ্য তো আমিই !'

মহানাম বললেন—'দুঃখটা কখন যে কার কাজে লেগে যায় কেউ বলতে পারে না এষা। আর তোমায় উপলক্ষ্য করে নীলম একটু দুঃখ পেলে শোধবোধ হয়ে যায়। বরাবর বেচারাকে ঋণী রেখে কি লাভ ?'

হঠাৎ এষার বুকের মধ্যে ব্যাকুল কান্না ফেনিয়ে উঠল। গলার কাছে তাকে প্রাণপণে থামিয়ে রাখবার জন্য সে জোর করে মুখ নিচু করে রইল। মহানাম বললেন—'সেবার আমার কাছে আসতে ভরসা পাওনি এষা, বাজারে খুব দুর্নাম রটেছিল। এবার যদি ভরসা করতে পারো তো আমি তোমার পাশে থাকব। অরিত্রকে সম্মুখ সমর দাও। এভাবে রণে ভঙ্গ দিও না। ওকে চুরমার করে না দিলে তোমরা কেউ কারো কাছ থেকে মুক্তি পাবে না।'

এষা পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। মহানাম বুঝতে পারছেন ও নিঃশব্দে কাঁদছে। ভালোবাসা মরে গেছে। কিন্তু তার দেওয়া আঘাত এখনও কোথাও কোথাও টাটকা আছে। সেই কাঁচা ঘায়ে ভীষণ লাগিয়ে দিয়েছেন মহানাম। এষা এখন উনিশ বছরের তরুণী। যাকে ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সমিদ্ধা। সেই মুক্তা রঙের নিটোল গ্রীবার বাঁক, কানের কাছে কুচো চুল। অ্যান ইনফিনিটলি জেন্টল ইনফিনিটলি সাফারিং থিং। মহানাম অনুভব করছেন সান্ত্বনায় তাঁর হাত কাঁপছে। কিন্তু ও যে স্বাধীন, তেজী মেয়েও। সান্ত্বনা দিয়ে তো ওকে ছোট করা যায় না ! সাহস দিতে হয় ! আরও সাহস ! তাঁর নিজেরও হাত যখন এমন দ্বিধায় কাঁপবে না, সম্পূর্ণ নিথর অথচ ভাবময় থাকবে, তখন, একমাত্র তখনই তিনি ওকে সাহসরূপ সান্ত্বনা দেবার অধিকারী হবেন।

মহানাম বললেন—'তোমার অরিজিন্যাল প্ল্যান কি ছিল ?'

'এখান থেকে পুনে ফিরে, দু-একদিন কাটিয়ে বম্বে যাওয়ার কথা, বম্বে থেকে জাহাজে গোয়া, গোয়া থেকে বম্বে ফিরে গীতাঞ্জলি ধরব। মানে ধরার কথা

ছিল। সেই মতই রিটার্ন টিকিট কাটা আছে।'

মহানাম বললেন—'ঠিক আছে। তোমার পুরো ভ্রমণপঞ্জীটা আমি নিয়ে রাখছি। বরাবর তোমার সঙ্গী থাকছি, কলকাতা পর্যন্ত। আমি আছি। কিন্তু লড়াইটা তোমাকেই লড়ে জিততে হবে এষা।'

অরিত্র সারারাত ঘুমোয়নি। ভোরের দিকে তাই ঘুম চেপে ধরেছিল। উঠতে দেরি হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে নিচে প্রাতরাশ খেতে নেমে দেখল মহানাম দরজার কাছে পুরো দৈর্ঘ্য মেলে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা সিগারেট খাচ্ছেন। সাদা পুরোহাতা শার্টের আস্তিন গুটোনো, সাদা কালো ছিট ছিট ট্রাউজার্স। স্নাত, পরিচ্ছন্ন, দাড়ি চুল সব সুবিন্যস্ত। তুলনায় অরিত্র তার ঘুম-না-হওয়া লাল চোখে, সামান্য দাড়ির সবুজ গালে ফুটে-ওঠায় কেমন অপরিচ্ছন্ন। আসলে নীলমই তাকে টিপটপ রাখে, নয়ত অরিত্রর আদি অভ্যাস জামা-কাপড় সব কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা। অফিস যাবার তাড়া না থাকলেও এখনও তাকে স্নান, দাড়ি-কামানো ইত্যাদির জন্য তাড়া দিতে দিতে নীলমের গলা ধরে যায়।

মহানাম অরিত্রকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসলেন। কাগজটা মেলে ধরতে ধরতে খুব অবহেলার সঙ্গে বললেন—'হ্যাঁ অরি, এষা বলছিল ও প্রিয়লকর নগরে ফিরবে না। তোমাদের নাকি অসুবিধে হচ্ছে ও বুঝতে পারছে। স্পেস কম। আমি বরং ওকে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিই।'

অরিত্র চমকে উঠল, ব্যগ্র হয়ে বলল—'সে কি ? আমাদের পুরো প্রোগ্রাম তো ছকা আছে। তা ছাড়া আমার বাড়ি না ফিরলে নীলম সাঙ্ঘাতিক ক্ষুণ্ণ হবে। এটা আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন মহানামদা। চন্দ্রশেখরের তো ব্যাচেলরের বাড়ি, থাকবে কি করে ওখানে ?'

'তাতে কি হয়েছে ? এষা ওসব গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না। আর আমিই তো রয়েছি। কোনও অসুবিধে হবে না। চন্দ্রশেখর হ্যাজ এনাফ স্পেস।'

'না, না, তা হয় না। এষা, এষা,' অরিত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এষার ঘরের দিকে চলে গেল। দরজায় টোকা দিচ্ছে। —ওর চঞ্চলতা দেখে মহানাম মৃদু মৃদু হাসছেন।

এষা দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। অরিত্র মাথা নিচু করে বলল—'এষা,এবারের মতো আমায় মাপ করো। তুমি অন্য কোথাও চলে গেলে আমি নীলমকে কি কৈফিয়ৎ দেবো বলো তো ?'

ঔরঙ্গাবাদ হয়ে পুনে ফিরতে রাত প্রায় নটা বাজল। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মহানাম বিদায় নিলেন। কিছুতেই ভেতরে ঢুকলেন না।

॥ ১৭ ॥

যত সহজে ত্যাগ করব বলা যায়, তত সহজে করা যায় না। তাছাড়া, প্রাত্যহিকতা থেকে দূরে গিয়ে পড়লেই বিভ্রম ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সময়কার অনুভূতিই চূড়ান্ত নয়। দুশ তেত্রিশ নং, **প্রিয়লকরনগর,** ব্লক বিতে ফিরে তালা খুলে যখন ঢুকল নীলম, বদ্ধ জানলাগুলো খুলে দেবার একটু পরেই হাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল, ওপরের মারাঠি ভদ্রমহিলাকে চাবি দেওয়া ছিল, তিনি প্রতিদিন ঘর পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন। রুম ফ্রেশনার স্প্রে করে দিল নীলম ঘরে ঘরে, আলো জ্বালিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে দিল। ঝকঝক করে উঠল টেবিলের ওপর, চেয়ারের মাথা, দেয়ালে গোয়ার ছবি। নীলমের মনে হল তার সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম হয়েছিল, নয়ত, এই তিল তিল যত্ন আর ভালোবাসায় গড়া ঘরকে সে অপবিত্র ভাবল কি করে! স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশ হবারও যোগাড় হয়েছিল, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতিটা সময়মত মনে পড়ে যায় তাই রক্ষা। আঠার বছরের **পুপু নির্মল,** শুচি, শুদ্ধ, কি করে তার মধ্যে জীবনের জটিলতার বিষ ঢুকিয়ে দেবার কথা সে ভেবেছিল? পুপুকে ফোন করতে তার প্রথম কথা—'বাবা ঠিক আছে তো? খোঁড়াচ্ছে না?' '—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই চলে আয়, আমি এসে গেছি।' —'তুমি একা চলে এলে কেন মা? বাবা কিন্তু পুরোপুরি ফিট নয় এখনও, তাছাড়া জানোই তো হী ইজ আ বিট ক্র্যাঙ্কি!' নীলমের মনে হল একবার জিজ্ঞেস করে—'পুপু, মা কি তোর কেউ না?' কিন্তু প্রশ্নটা ঠোঁটের আগায় এসে থমকে যায়। পুপু এমনিতেই বলে—'তোমরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল।'

একবার গুপ্ত কথাটা বলে ফেলবার সংকল্প করায় কথাটাও বারবারই মুখে এসে যাচ্ছে। —'জানিস পুপু, তোর বাবা কিন্তু তোর আসল বাবা নয়। আগে আমার একবার বিয়ে হয়েছিল, সেই বাবার মেয়ে তুই।' এইভাবে বলা হলে অশুচিতাটা চলে যায়, কিন্তু আঘাত? আঘাতটা বোধহয় থেকেই যাবে। পুপুর যে কী প্রতিক্রিয়া হবে তাও গণে গেঁথে কিছুতেই থই পাচ্ছে না নীলম। অথচ পুপুর পিতৃধন এতো মূল্যবান যে ওকে সেটা অবহিত করানো দরকার। আসলে পুপুর যতটা দরকার, নীলমের দরকার তার চেয়েও বেশি। সত্যের ভার এতো বেশি যে নীলম কিছুতেই আর তাকে সহজে বইতে পারছে না।

এষারা বাড়ি ফিরতে তাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নীলম। বাড়ি ঢুকেই অরিত্রর প্রথম কথা—'পুপ্ কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গে পুপু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

'বাবা, তুমি মাত্র দুদিনেই কি রোগা হয়ে গেছো। কি কালো!' অরি হেসে বলল—'ওকে বলে দুধে-রং। তাই সামান্য রোদেই জ্বলে যায়। তোর বাবা কবে গোরা-সাহেব ছিল পুপু? তোর পরীক্ষা কেমন হল?' এষা তখন নীলমকে বলছিল—ডাঃ রায়, বাড়ির চৌকাঠ থেকে ফিরে গেলেন। কত করে বললুম, এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান। শুনলেন না।'

পুপু বলল— 'মা, ফিরে যাবার আগে ওঁকে আরেকবার ডাকবে না? অল্প আইটেম করো। না হলে কথা বলবার সময় পাওয়া যায় না।'

নীলমকে ভীষণ ক্লিষ্ট দেখল এষা। এষাকেও ভীষণ ক্লান্ত, বিরস দেখল নীলম। মহানাম তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ ছিলেন, বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত, এই কথাটা নীলমকে জানানো ভীষণ জরুরি ছিল, সেই কর্তব্যটা করে এষা আর একটুও দাঁড়াল না। স্নান করতে ঢুকে গেল। ধারা স্নান। ভীষণ ক্লান্তি, ভীষণ ক্লেদ, খেদ, সব নবধারাজলে ধুয়ে যাক, ধুয়ে যাক।

মাথাসুদ্ধু ভিজিয়ে বেরোল এষা। পুপু তাড়াতাড়ি ওর হেয়ার-ড্রায়ার বার করে বলল—'তুমি প্রায়ই এরকম মাথা ভিজিয়ে চান করো নাকি এষা মাসি? চুল শুকিয়ে নাও।' নিজের পড়ার চেয়ারে এষাকে উল্টো মুখে বসিয়ে নিজেই চুলটা শুকিয়ে দিল ওর।

এষা বলল—'তুই কি খুব বেশি ব্যবহার করিস নাকি ড্রায়ারটা? চুল কিন্তু ভেতরে ভেতরে পেকে যাবে তাড়াতাড়ি। ওইজন্যেই আজকাল ফ্যাশনেবল মেয়েদের তাড়াতাড়ি চুল পাকে।'

পুপু বলল—'ওহ্, হাউ আই উড লাভ ইট।'

এষা হেসে বলল—'তোর সবই উল্টোপাল্টা না কি রে?'

পুপু বলল—'ডোন্ট য়ু সি মাসি? ইট উড মেক মি লুক লাইক ডক্টর মহানাম রয়।'

নীলম এমন ভীষণ ভাবে চমকে উঠল যে এষা আর পুপু দুজনেরই নজর পড়ল তার দিকে। এষা মুখ ফিরিয়ে পুপুর দিকে তাকাল, তারপর বলল—'সত্যিই তো! মহানামদার সঙ্গে তোর তো ভীষণ মিল?'

পুপু বলল—'আই মাস্ট হ্যাভ বীন হিজ ডটার ইন সাম আদার লাইফ। অলদো আই ডোন্ট বিলিভ ইন রি-ইনকারনেশন।'

এষা বলল—'তোর বিশ্বাস অবিশ্বাসগুলোকে এই বয়স থেকেই খুব রিজিড

করে ফেলিস নি পুপু। জন্মান্তর থাকলে জীবনের কত দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তুই এখনও জানিস না।'

নীলম মৃতের মতো বসেছিল, সেদিকে একপলক তাকিয়ে এষা বলল— 'বয়স আমার অন্তত পঁয়ত্রিশ,

পনের বছরে পা দিয়েছ তুমি সবে
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ ;
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে।'

নীলম চোখ মেলে তাকাল। চোখের কোলে কোলে জল। পুপু মন দিয়ে কবিতাটা শুনছিল। বলল—'ছন্দটা সুন্দর। কিন্তু বাংলা কবিতা আমাকে ট্রানস্লেট করে বুঝতে হয়। "গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ"—এই জায়গাটা বুঝতে পারলুম না। "গূঢ়" মীন্‌স ?'

'সিক্রেট'

"ক্ষত', উন্ড আর 'চোয়ায়'?"

"উজেস' বলতে পারিস।

'ইয়েট দা পয়জন অফ মেমরি উজেস ফ্রম দা সিক্রেট উন্ড !বাঃ। এষা মাসি, য়ু মেক বিউটিফুল পোয়েট্রি।'

'কি আশ্চর্য ! আমি যা বলি সবই অন্যের রে। এটা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের করা হাইনরিখ্ হাইনের অনুবাদ।'

নীলম বুঝতে পারল এষা বুঝেছে। উপরন্তু মহানাম তাঁর দাবী কোনদিনই পেশ করবার কথা মনেও আনেননি। এবং পুপু কোন না কোনদিন সত্য জানবেই। সেটা ওকে নিজেকে জানতে দেওয়াই ভালো।

এষা টেবিলে বসল না। এক গ্লাস দুধ ওকে দিয়ে এলো পুপু শোবার ঘরে। অনেকদিন পর যেন তিনজনের পারিবারিক নৈশভোজ। অরিত্র খেয়েই শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। শুতে যাবার আগে নীলম পুপুদের ঘরে গিয়ে দেখল এষা নেই। খুঁজতে খুঁজতে পাঁচতলার ওপর ছাদে ওকে আবিষ্কার করল নীলম। মোজেইক করা ছাদটা ওদের। আকাশটাকে খুব কাছে মনে হয়। মৃদু হাওয়ায় এষার আঁচল উড়ছে দেখতে পেল নীলম।

'কি হল এষা, ঘুমোও নি ?'

'ঘুম আসছে না। সত্যি তোমাদের খুব জ্বালাতন করে গেলাম নীলম। ক্ষমা করে দিও।'

'সে কি ? তোমাকে তো আমার ধন্যবাদ দেবার কথা ? তুমি যে কত দিয়ে

গেলে ? সুন্দর অভিজ্ঞতা, সুন্দর সঙ্গ, ক্ষমা, ভালোবাসা, কতো সত্য যে বোঝাই হত না তুমি না এলে ! পারলে তুমি-ই আমাকে মাপ করো। আমি শুধু নিয়েই গেছি। এখন দেবার চেষ্টা করলেও তেমন মূল্যবান কিছু খুঁজে পাই না।' নীলমের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

এষার মনে হল যা অরিত্রর মুখ থেকে শোনবার কথা ছিল, নীলমের মুখ দিয়ে তা কেউ তাকে শোনালো। তার এসব কথা শোনার জরুরি দরকার ছিল বলে। বলল—'পুরনো কথা মনে করে কষ্ট পাবার আর কিছু নেই নীলম। এখন অন্য দিন।'

নীলম বলল—'পুপুর ব্যাপারটায় তুমি আবার নতুন করে কষ্ট পেলে তাই না ?' বলতে বলতে নীলম অনুভব করল তার লজ্জা এবং দুঃখের মধ্যেও একটা গর্ববোধ কাজ করে যাচ্ছে। সে যখন যা চেয়েছে, পেয়েছে। পাওয়ায় তার অঞ্জলি ভরে আছে। এষার হাতে শুধুই শূন্য।

এষা বলল—'এটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা, আমাদের গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা সব্বাই জেনে গিয়েছিলাম তুমি মহানামদার। যখন ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটল তখনই সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।'

নীলম মুখ ফিরিয়ে বলল—'আমি কি সাঙ্ঘাতিক খারাপ এবার তাহলে পুরোপুরি জানলে তো এষা, নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করছো ?'

এষা বলল—'কিছু যদি মনে না করো ব্যাপারটা আমার কাছে একটু পরিষ্কার করবে নীলম ? চয়েসটা কি তোমার ? মহানামদার জায়গায় অরিত্র ? না মহানামদাই তোমাকে, তাঁর সন্তানকে গ্রহণ করতে চাননি !'

'মহানাম তাঁর সন্তানের কথা আজ আঠার বছর পরে জানলেন এষা। পাছে তিনি আমায় আটকান, তাই তাঁকে আমি জানাই-ই নি। চয়েসটা আমারই। দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার। অরি সে সময়ে মহানামের সম্পর্কে নানা রটনার কথা বলে আমাকে একেবারে বিমুখ করে দিয়েছিল, তাছাড়া তুমি তো জানোই তার প্রেম করবার তুমুল ধরন-ধারণ। যে কোনও মেয়েকে যে কোনও বয়সে সে যাদু করতে পারে। যদি চায়।'

এষা অনেকক্ষণ পরে বলল—'আমাকে আর পারবে না নীলম, এটুকু বিশ্বাস রেখো আমার ওপর।'

'পারবে না জানি। কিন্তু চায় যে সেখানেই আমার অপমান, বোঝো না ?'

এষা বলল—'না অপমান নয়। বড্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছ ওকে। একটু অবহেলা করো, একটু বঞ্চিত করো। লড়াই করো। ওকে জিততে দিও না সব

সময়ে। কারণ তাহলেই ও সবচেয়ে বেশি করে হারবে।'

নীলম বলল—'বঞ্চিত যিনি করবার তিনি তো করেইছেন। আমি তো এখন জরায়ুহীন, ডিম্বকোষহীন, নারীত্বহীন নারী।'

এষা বলল—'শুনেছি। তুমি এই মেডিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল তথ্যটা নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেন বলো তো ? আমি বলছি তুমি নারীই আছো। এবং তারও ওপরে মানুষ। মানুষের কাছে মানুষের যা না পেলে চলে না, সেইখানে তুমি ওকে বঞ্চিত করো নীলম। তোমার দাক্ষিণ্য, এতো অবারিত করো না।'

'করছি না। মোটেই আর করছি না। অনেক ভুলই এখন বুঝতে পারি, যা কদিন আগেও বুঝিনি। তাই-ই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম। কিন্তু এষা তোমাকে আমি কি দেবো ? তোমার জন্যে আমার বুক যে খাঁ খাঁ করছে !'

আর্দ্র গলায় এষা বলল—'এটাই তো আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হল তোমার কাছ থেকে। এবার যত দূরেই যাই তোমার লক্ষ্মীর পা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে।' **জ্যোতিষ্কভরা আকাশের তলায় এ যেন এক নতুন অঙ্গীকার।**

অরিত্র জানছে না। কিন্তু লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কামানের মুখগুলো সব তার দিকে ফেরানো। গাছপালার আড়ালে সেগুলো লুকিয়ে আছে। গুপ্ত চোখ পাহারা দিয়ে ফিরছে তাকে। অশ্বারোহী সৈন্যদল দূর থেকে টহল দিয়ে গেল। অরিত্র চৌধুরী তুমি জানো না, বড় ফ্যাসাদেই পড়েছ।

নীলম বলল—'বিক্রম আর সীমা অনেক করে বলে গেছে। ওদের বাড়িতেই আমরা গিয়ে উঠছি বম্বেতে।'

উত্তেজিত অরিত্র বলছে—'এখুনি ফোন করে ক্যানসেল করে দাও। কোম্পানির গেস্ট-হাউসে আমি ব্যবস্থা করেছি।'

নীলম বলল—'ওরা অনেক আশা করে আছে। আমি ওদের কষ্ট দিতে পারব না। এক কাজ করো, তুমি গেস্ট হাউসে থাকো। আমি এদের সবাইকে নিয়ে ওদের বাড়ি থাকি।'

'অর্থাৎ তুমি মন ঠিক করে ফেলেছো ?'

'মন ঠিক করে ফেলাফেলির কি আছে ? বলে গেছে। আয়োজন করে রাখবে। ফেরাব কেন ?'

'ফেরাবে এইজন্যে যে বিক্রমের বর্বরতা মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।'

'আমি নিজেও তো বর্বর শ্রেণীর, ওটা আমি সামলাতে পারবো।'

'কিছুই সামলাতে পারবে না। আসলে বর্বরতা তোমার ভালো লাগে।

বিক্রমকে প্রশ্রয় দিচ্ছ অনেকদিন থেকে।'

'বর্বরতা ভালো লাগে কি না জানি না, তবে সমাদর ভালোই লাগে। স্বীকার করছি। সীমা ওর বাড়ি গেলে যা যত্ন করে, বিক্রম যে ভাবে সব সময়ে এক পায়ে খাড়া থাকে সেটা একেবারেই ফ্যালনা নয়। আর, আমি না হয় বিক্রমকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, তোমাকে কে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলো তো ?'

'আমার আচরণে বিক্রমের মতো বর্বরতা প্রকাশ পাচ্ছে না কি ?'

'তুমি বোধহয় ওকেও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছ।'

অরিত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ উত্তেজিত। চড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। এষা কি কিছু বলেছে নীলমকে ? অরিত্রর মুখ নীল হয়ে গেছে।

পুপু বলল—'কদিন আগেই তো আমি গোয়া ঘুরে এসেছি। আর যাবো না। আমি বিক্রমকাকুর বাড়ি থেকে যাবো।' নীলম মনে মনে ভাবল সেও থেকে যাবে কিন্তু সে কথা এখনই অরিত্রকে বলার দরকার নেই। অনেক সুতো ছাড়তে হবে ওকে এখন।

॥ ১৮ ॥

ছাদে পদ্মফুলের পুকুর করিয়েছে সীমা। পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলায় তার বাপের বাড়িতে ছিল পদ্ম, শালুক। বম্বেতে মাটি বড় দামী। তাই গাড়ি বারান্দায় বাগান। অতিথিদের জন্য ওয়ার্ডরোব ভর্তি নতুন রাত-পোশাক, ড্রেসিং গাউন। নতুন চটি। বিক্রম তার দুটো গাড়ি সবসময়ে হাজির রেখেছে। কে কখন কোথায় যেতে চায় !

'এইভাবে অতিথি-সৎকার, সীমা করেছ কি ?'

সীমা বলল—'যিনি তিথিতে আসেন না, অসময়ে, অপ্রস্তুত হয়ে আসেন তিনিই তো অতিথি। এর পরে আমার বাড়ি হালকা হয়ে আসতে পারবে এষাদি।'

সীমার বাড়ির লাইব্রেরি, ছবি আর ভাস্কর্যের সংগ্রহ দেখে মহানাম অবাক। যে অ্যালবামই চান সীমা বার করে দেয়। অজন্তার তো বটেই। তাঁর নিজেরও এতো নেই। মনের আনন্দে পুপুকে নিয়ে স্কেচ করছেন মহানাম। এই সব স্কেচ তাঁর বইতে ব্যবহৃত হবে, বলছেন ঋণ স্বীকারে সীমা শীল আর সমিদ্ধা চৌধুরী অবশ্যই থাকবে।

দেখতে দেখতে মহানাম জিজ্ঞেস করছেন—'এসব কার নেশা সীমা !'

সীমা হেসে বলল—'কারুর নেশা নয় মহানামদা। কালো টাকা খরচ করবার

বহুবিধ উপায়ের একটা। আপনি কোনদিন পায়ের ধুলো দেবেন বলে আমাদের হাত দিয়ে এসব কেনা হয়ে আছে। দেখছেন না সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা।'

পুপু বলল—'কাকীমা, তোমার এতো হিউমিলিটি কেন? আর ইউ ডেলিবারেটলি কালটিভেটিং ইট? ডক্টর রয়, জানেন সীমা কাকীমার অনেক নেশা, অনেক গুণ, শী ইজ ভেরি ভেরি মাচ অ্যাকমপ্লিশ্‌ড্। স্বীকার করতে চায় না কিছুই। শার্লক হোম্‌স্ বলেছিলেন মডেস্টি মোটেই গুণ নয়, মডেস্টি ইজ অ্যানাদার নেম ফর হিপোক্রিসি। এটা সীমাকে বলুন তো!'

সীমা কি করে বলবে, ঠিক ঠিক জায়গা থেকে স্বীকৃতি এবং সাধুবাদ না পেলে সব গুণই ফুটো পয়সা হয়ে যায়। বললেও পুপু বুঝবে না। সে আপন মনে নিজের যা ভালো লাগে করে যায়, কারও স্বীকৃতি, কারো সাধুবাদের তোয়াক্কা করে না। এটা কি পুপুরই চারিত্র্য না নতুন যুগের মেয়েদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—এটা লক্ষ্য করে দেখা দরকার। যদি শেষেরটা হয় তাহলে সীমা খুব খুশি হবে। বৃদ্ধ বয়সে কোনও করপোরেশনের চেয়ারম্যানের স্ত্রী হিসেবে কোনও সভায়-টভায় গিয়ে গলায় প্রধান অতিথির মালা নিয়ে সে নতুন প্রজন্মের এই গুণের কথা উল্লেখ করবে, এটা যে নিশ্চিত একটা অগ্রগতির ছাপ, সে কথা শতমুখে বলবে।

চৌপাটির ফুচকাঅলা আর ভেলপুরি ধরে ফেলেছে সীমাকে। আইসক্রিম হাতে মহানামের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে পুপু। এষা কিছুতেই পেছনে পড়ে থাকবে না। নীলম একদম সাদা শাড়ি ব্লাউস পরে অরিত্রর পাশে পাশে হাঁটছে, অরিত্র আজকে একটু পা টেনে হাঁটছে। বিক্রম বলছে—'কি ড্রেস দিয়েছো ভাবী! তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু চৌধুরীদা যে বিধবা হয়ে গেল!'

হাসি চাপতে পারছে না নীলম, বলল—'তোমারও একটু বিধবা হওয়া দরকার। কাল সীমা এই ড্রেস করবে।'

এষা কথা বলছে না। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ফিরে অবধি একটা কথাও বলেনি। প্রশ্ন করলে হুঁ হাঁ জবাব দিয়ে গেছে খালি।

'শরীর খারাপ নাকি এষা?'

'না।'

'মন ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'জাহাজে গোয়া যাবো, দেখবে কি ভালো লাগে। গোয়া তো আগে দেখোনি!

'না।'

'ভালো লাগছে না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ওপর রাগ করেছ?'

'না।'

'রাগ পড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

পুপু বলল—'বাবা, তোমরা ভীষণ আস্তে হাঁটছ। ডক্টর রয় বলছেন গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়া দিয়ে ভাইসরয়দের ঢুকতে দেখবেন। এষামাসি বলেছে এলিফ্যান্টা আগে দেখেছে আর দেখবে না, মুড নেই।'

বিক্রম বলল—'এষাজীকে একবার সমুদ্দুরে চুবিয়ে আনতে হবে জুহু বীচে। বাস মুড ঠিক হয়ে যাবে।'

এষা বলল—'সমুদ্রে নামলে আর উঠব না, যেখানকার জিনিস সেখানেই ফিরে যাব।'

সীমা বলল—'সমুদ্রের তলা থেকে এসেছিলে? তুমি লক্ষ্মী না উর্বশী? এষাদি!'

এষা বিষণ্ণ গলায় বলল—লক্ষ্মীও নই, উর্বশীও নই। আমি বিষের পাত্র সীমা।

'মাতা নও, বধূ নও, যতদূর শুনেছি তুমি কন্যাও নয়, তাহলে তুমি উর্বশী ছাড়া কি?'—বলল বিক্রম মনে মনে।

অরিত্র মনে মনে বলল—'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা। নাচে রক্তধারা। হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।'

মহানাম বললেন—'ইটস আ ম্যাটার অফ চয়েস এষা। তুমি উর্বশী হবে না লক্ষ্মী হবে?

এষা বলল—'আমি যে কোনটাই হতে চাই না মহানামদা। আপনাদের কল্পনায় আর কোনও বিকল্প নেই?'

'আছে', মহানাম বললেন, 'বিষের পাত্র না হয়ে তুমি তো অমৃতের পাত্রও হতে পারো। সমিদ্ধা, তুমি কি হতে চাও মা?'

পুপু বলল—'আমি অমৃতও হতে চাই না। ইট উড বোর মি স্টিফ টু বি

ইম্মর্ট্যাল, ইট ইজ মাচ বেটার টু বি বাব্‌ল্‌স্‌, ফুল অফ কালার অ্যান্ড ডেথ।'

মহানাম বললেন—

'হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

দ্যাখো এষা, দ্যাখো নীলম, ঈশ্বরের কোনও দোষ নেই। মানুষ নিজেই মৃত্যু চেয়েছে। অভিমানে নয়, ভালোবেসেই চেয়েছে। ফ্রয়েড-এর থ্যানাটস, যে **মৃত্যু-ইচ্ছা** ঘৃণার নামান্তর—তেমন নয়, পুপুর মতো রোমান্টিক আবেগে সে শেষকে চেয়েছে। তাই মৃত্যু এল। তারপর একদিন অস্মার রোগে সে ভুলে গেল সে এই-ই চেয়েছিল। ভীষণ রেগে গেল। নানা রকম গল্প বানালো। সেইদিন থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে তার ঝগড়া!'

অরিত্র বলল—'আপনি তাহলে অ্যানথ্রপোমর্ফিক গড মানছেন মহানামদা! হাত-পা-অলা মানুষের আদলের ভগবান। গড মেড ম্যান ইন হিজ ওন ইমেজ, অ্যান্ড ম্যান রিটার্ন্‌ড্‌ দা কমপ্লিমেন্ট!'

মহানাম হেসে বললেন—'তুমি আজকাল অলঙ্কার ধরতে পারো না অরি, তুমি কি তবে পুরোপুরিই বাণিজ্যিক সংস্থার আধিকারিক হয়ে গেলে, কবি আর একদম নেই?'

নীলম বলল—'মহানামদা, অরি কোনদিনই কবি ছিল না। গিফ্‌ট্‌ অফ দা গ্যাব ছিল খানিকটা। আর যৌবনে তো কুক্কুরীও অপ্সরী!'

সীমা বলল—'অরিদা কবি ছিলেন না কি? হতে পারে। বিক্রমও তো এককালে গায়ক ছিল। এখন ও নিজের ব্যবসা দেখে, অরিদা পরের ব্যবসা দেখেন।'

বিক্রম প্রবল প্রতিবাদ করে বলল—'বাঃ, আমি তো এখনও গাই।'

সীমা বলল—'গাও। কিন্তু তুমি আর গায়ক নেই।'

বিক্রম বলল—' যা ব্বাবা।'

এষা একটাও কথা বলেনি ঔরঙ্গাবাদ থেকে ফিরে। কথার জবাবে শুধু হুঁ হাঁ করে গেছে। যখন সামান্য কথা বলছে, বলছে পুপুর সঙ্গে, নীলমের সঙ্গে, সীমার সঙ্গে, মহানামের সঙ্গে, এমন কি বিক্রমের সঙ্গে, শুধু অরি বাদ। অরি বাদ।

অথচ কি করেছে সে? কিছুই না। কিচ্ছু না। এক সময়ে সে-ই তো এষার সব ছিল। এষার ওপর তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তার বুকের মধ্যে মাখনের

মতো গলে যেত এষা-প্রেষা। যেত না? এষার হাত, পা, ঠোঁট, বুক সব নরম মোমের তৈরি ছিল, অরিত্রর উত্তাপে টলটল করত সেই মোম। এষাকে তো এষা করেছে অরিত্রই। অতিশয় রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। এষা বলত—'জানো অরি, আমার দিদিরা সব কেউ গোলাপফুলের মতো, কেউ কনক চাঁপার মতো ফর্সা, দাদারা এক একজন গৌরাঙ্গ। আমিই একমাত্র কালো, কুৎসিত। ছোটবেলা থেকে পিসিমা আমায় রূপটান মাখাচ্ছেন। টানই হল, রূপ আর হল না।' আবার কখনও বলত—'জানো অরিত্র, আমার দাদা-দিদিরা মোটা মোটা বইয়ে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে দিনরাত। 'হিউম্যান ডেসটিনি', 'রিলিজন উইদাউট রেভিলেশন,' 'দা কসমিক ব্লু-প্রিন্ট'। ওই একটা বাড়ির বিভিন্ন শাখা থেকে যে কত পণ্ডিত বেরিয়েছে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। আমি সেখানে মূর্খ, একেবারে আকাট, অরিত্র।' বলতে বলতে হাসত এষা। হাসলেও সেই হাসির মধ্যে একটি নিন্দিত বালিকার কান্না শুনতে পেত অরিত্র।

দূর থেকে দেখেছে খানদের বাড়ি থেকে লম্বা গাড়ি বেরিয়ে গেল, ভেতরে হীরে জহরতে মোড়া কিছু অপ্সরী। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম, পদ্মপলাশ নয়ন, তিলফুলজিনি নাসা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠ, এষার যৌথ পরিবারের দিদিরা। আলাদা করে অবয়বগুলো দেখতে হয়, গর্বিত মুখভাব, রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন না। সুন্দর। মুখ চোখের বিচারে কিন্তু তাঁদের নিয়ে কবিতা লেখার কথা কেউ ভাববে না। এষা বেরিয়ে আসছে ওই দ্যাখো। দেওদার এক। খান বাড়ির বিরাট সিংদরজা যেন এই আবির্ভাবকে নমস্কার করে বন্ধ হয়ে গেল। চারপাশে জনতা। গাড়ি ঘোড়া ছুটছে। অথচ অরিত্র দেখছে নেই, আর কেউ নেই। যথাযথ পশ্চাৎপট না হলে ছবি ফোটে না, সরু গলির মধ্যে যেমন জগন্নাথ মন্দির। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। অথচ দিগন্তজোড়া ধুধু বালুময় শূন্যতার মাঝেখানে কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে কোণার্ক। তার পূর্ণ মহিমায়। রক্ষণশীল, অন্ধ বনেদিয়ানার পার্সপেকটিভ। অজস্র, মুখের, গাড়ির অর্থহীন মিছিল পৃষ্ঠপটে। এষা আসছে অর্থময়ী। সেই চিরায়মানা।

সে কি ঘুমাবে একা একা এ ঝড়ের রাত
বুকে হাঁটবে অন্ধগলি প্রত্যাশায়
সে কি থাকবে গর্ভজলে বন্দী মা'র
প্রলয় রাতে কোথায় শল্য চিকিৎসক?
শঙ্খমুখে দাঁড়িয়ে থেকো উঠোন-কোণ
শব্দে ধ্বনি প্রতিধ্বনি মেলাতে দাও

সাধ্য হলে এভাবে বাগ-বিস্ফোরণ

সে কি জাগবে ? সে কি আনবে মুক্তি পণ ?

অরিত্র কি এবার জন্ম দেয়নি ? উর্‌র্‌র্‌ নাগিন, লাচ্ নাগিন, লাচ্ নাগিন, লাচ্ ! য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের লোকসংস্কৃতির উৎসবে, সাপুড়ের বাঁশির তালে নাগিন নাচেনি ? তার চোখে জন্মান্তরের স্মৃতি উলসে ওঠেনি ! তবে ? সেই তুলনাহীনা গ্যালেশিয়া যাকে সে নিজের হাতে গড়েছে, সে কি এখন পিগম্যালিয়নের নয় ? সমস্ত বিশ্বের হয়ে গেছে ?

অরিত্র মনে মনে নিজেই নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত পা চিবোয়, কামড়ায় রূপকথার সেই কুমীরটার মতো। তারপর রক্তারক্তি কাণ্ড করে মরে যায়। আর সেই মৃত্যুর ওপর দিয়ে মিছিল করে হাসতে হাসতে গোয়াগামী 'কনডর' জাহাজটাতে মোটঘাট নিয়ে উঠে যায় পরাক্রান্ত বিক্রম, উজ্জ্বল হাসিমুখে মহানাম, উদাসীন, অন্যমনস্ক এষা-প্রেষা, এবং কমলারঙের স্ল্যাক্‌স্ পরে, কমলা লিপস্টিক ঠোঁটে, কাঁধে কমলা ব্যাগ, আঙুলে কমলারঙ, লজেন্সের মোড়কে চকচকে সীমা, সর্বশেষে, অবশেষে ঝেড়েঝুড়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অগত্যা অরিত্র চৌধুরী।

॥ ১৯ ॥

ভোঁ দিয়ে দিয়েছে স্টীমার। এবার 'কনডর' তার অতিকায় পাখা মেলে আরব সাগরের দীর্ঘ আকাশে উড়বে। ডেকের রেলিং ধরে সারি সারি পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে, যদিও পুতুল নয়— সীমা, অরিত্র, মহানাম, বিক্রম, এষা।

নীলম কেন এলো না ? অত অনুরোধ উপরোধ ? সবাই মিলে অত ডাকাডাকির পরও কেন অমন ফেলে আসা তীরে সুদূর, দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্টীমারের পেছনে কলকল্লোলে সাদা হয়ে যাচ্ছে নীল জল। প্রপাতের মতো ফেনিল। ঘূর্ণিপাকের মতো ভয়াল। জলের দুই হাতে যেন কালের মন্দিরা বাজছে। নীলম কেন এলো না ? এষা ভীষণ ভয় পাচ্ছে। শুধুই কি পুপুর জন্য ? বিক্রমের বাড়িতে পুপু সীমার ছেলে টিটোর চেয়েও স্বচ্ছন্দ। টিটো আসে বছরে একবার, পুপু যতবার ইচ্ছে, যতদিন খুশি। বাবা মা ছাড়াই। অনেক সময়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে। অথচ নীলম আসতে চাইল না। যেন পুপুকে বুকে নিয়ে ও অরিত্রকে জন্মের মতো টা টা করে দিল। নীলম কি অরিকে একেবারেই ত্যাগ করল ? লড়াই করার কথা ছিল, বঞ্চিত করে বাঁচাবার কথা ছিল, পরিত্যাগের কথা তো ওঠেনি ! অরি বুঝতে পারছে না। কী ভয়ানক ! এষা বুঝতে পারছে

অথচ অরি এমন উন্মাদ হয়ে আছে যে ওর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে ও টের পাচ্ছে না। অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। ও টের পাচ্ছে না। নীলম, নীলম, তুমি অনেকের প্রতি অনেক নিষ্ঠুরতা করেছ, প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে। আর করো না। তুমি অন্ধ বিচারদেবীর দাঁড়িপাল্লা হাতে নেবে না কিছুতেই। কিছুতেই তুমি চণ্ডিকা হতে পাবে না ! হয়ো না। এষা যেন শূন্য আকাশে দাঁড়ানো উদাসীন নীলমের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। এবং কনডর তার রাজকীয় ভঙ্গিতে উড়েই চলল, উড়েই চলল। তার পক্ষপুটে, চক্ষুপুটে কিছু মানুষ। তারা একটা ঘূর্ণ্যমান চক্রকে কিছুতেই থামাতে পারছে না। একটা প্রচণ্ড লাফ লাফিয়ে সেই চক্রের বাইরে আসতেও পারছে না। কর্মসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে ওই অমোঘ চক্রের গায়ে গায়ে। জন্মান্তরের কোনও কর্মের দায়ে নয়। এই জন্মেরই। মাত্র এই জন্মেরই। এবং প্রত্যেকে, প্রায় প্রত্যেকে, চলোর্মি চঞ্চল সেই সাগরের নীলে নিঃশব্দে মেশাচ্ছে নিজের নিজের ব্যথার নীল। কেউ দেখছে না কত গাঢ় হয়ে যাচ্ছে তাতে আরব সাগর। এক তটরেখা থেকে আর এক তটরেখা পর্যন্ত নীল রক্তের সেই স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে। তার ধারায় বৈদ্যুতিক টান। যে কেউ পড়লে তাকে চোরা টানে টেনে নেবে এমনি শক্তিশালী সেই ব্যথার বাসনার আগ্নেয় নীলধারা।

কমলা রঙের করুণ হাত বাড়িয়ে সীমা বলল—'ওই দ্যাখো এষাদি উড়ুক্কু মাছ। ওই যে আরেকটা, আরেকটা।'

অরি চোখের কোণ দিয়ে রক্তাভ দৃষ্টি মেলে দেখল— ছোঁ মেরে জল ছুঁয়ে মাছ মুখে তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল গাঙচিল। তার ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল ; কেমন শিউরে উঠল শরীর। দূর থেকে সে এষার দিকে তাকাল। এষা এদিকে তাকাচ্ছে না। অত মগ্ন হয়ে, নীল হয়ে এষা কি দেখছে, বলো তো ! এষা কি আগে কখনও সমুদ্র দেখে নি, জল দেখে নি ? এষা কি কখনও নীল রঙ, সবুজ রঙ, সাদা রঙ দেখেনি ! না তাকে আর দেখবে না বলেই ওই সব দেখছে। সমর্পিতচক্ষু হয়ে দেখছে !

গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ দিনের রং। সমুদ্রের দিকে তাকানো যায় না। ধারাল সাদা ছুরি চমকাচ্ছে তার ঢেউয়ে, বন্দরের কাছ থেকে অনেক দূরে এখানে ঢেউ কম, দোলা কম অপেক্ষাকৃত, তবু কী রকম এক তীব্র সমুদ্র।

ডাইনিং হলে টোম্যাটো সুপ আর ড্রাই টোস্ট নিয়ে বসেছে এষা। অরিত্রর গা গুলোচ্ছে, সীমা তার ঝাঁপি খুলে বার করেছে ভালো ভালো খাবার দাবার। বিক্রম খাচ্ছে, মহানাম খাচ্ছেন। সীমা দেখছে, খাচ্ছে, এষা মন দিয়ে খাচ্ছে।

অরিত্র সামনে বসে, নাড়ছে চাড়ছে। এত মন দিয়ে এষা কি খাচ্ছে ? এষা কি আগে কখনও টোম্যাটো সুপ দিয়ে ড্রাই টোস্ট খায়নি ? না তাকে দেখবে না, আর কোন দিন কিছুতেই দেখবে না বলেই এভাবে খাচ্ছে, এ রকম সমর্পিতপ্রাণ হয়ে খাচ্ছে !

আলাপ করছে এষা ও সীমা, দোতলার ডেকে এক পরিবারের সঙ্গে। জমে গেছে খুব। পাঞ্জাবী কি না বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দুটো গাল ফোলা বাচ্চা, মেয়েটি বোধহয় সীমারই বয়সী। ওই রকম চুড়িদার কুর্তা পরা, সীমা কথা বলছে, এষা হাসছে, উঠে চলে গেল, চলে যাচ্ছে জাহাজের পেছন দিকে, যদি অরি জাহাজের পেছন দিকে যায় তো এষা কি করবে ? নির্ঘাত সে সামনের দিকে চলে আসবে, অরি ওপরে এলে সে নিচে, অরি নিচে নামলে সে ওপরে, অনেক ওপরে, অনেক দূরে, মাঝখানের ব্যবধান ক্রমেই ঢওড়া হয়ে যাচ্ছে। পুনা স্টেশন থেকে সেই ঠাণ্ডা মিষ্টি রাতে এষাকে নিয়ে প্রিয়লকরনগর ফেরা কত দূরে পড়ে রইল, কল্যাণ স্টেশন থেকে সিদ্ধেশ্বর এক্সপ্রেসে পুনা, অরি দাঁড়িয়ে, এষা বসে, কোনমতে। মাঝখানে অনেক যাত্রী। তবু সে এমন ব্যবধান নয়। এষার গাল দেখা যাচ্ছিল, কখনও কপাল, মুখের আধখানা, তবু সে-ই সম্পূর্ণ এষা। অথচ এখন তার গোটা শরীর গোলাপী শাড়িতে মুড়ে এষা বিরামহীন ওঠানামা করছে, বসছে, দাঁড়াচ্ছে তার চোখের ওপর, কিন্তু এ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া শতধা এষা। এষার মুখে অরির জন্য কোনও হাসি নেই, এষার চোখে অরির জন্য কোনও দৃষ্টি নেই। অরির এক চোখ বলছে বিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে। আর এক চোখ বলছে— অসম্ভব, এ অসম্ভব।

ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে মহানাম পাইপ ধরিয়েছেন। মিঠে মিঠে গন্ধটা। সারা দুপুর 'অবদানশতক' নিয়ে পড়ে ছিলেন। সন্ধে লাগতে বই মুড়ে পাইপ ধরিয়েছেন। —অরিত্রকে আসতে দেখে বললেন, 'অরিত্র, বিক্রম আমার তামাকটা একটু টেস্ট করে দেখবে নাকি ? বাক্সে ডজন খানেক পাইপ আছে। বার করব ?'

বিক্রম বলল— 'গন্ধটা তো কড়া লাগছে না দাদা। আমার ব্র্যান্ড চারমিনার। মাঝে মাঝে ক্যাপস্টান। ওসব ডানহিল টিলও আমার চলে না। আচ্ছা দাদা। একটা কথা বলব ? একটু স্কচ হোক না কেন, ওয়াইন দিয়ে রাঁধা গোয়ানীজ সুরমাই, আর চিকেন লিভার ভাজার সঙ্গে। আমি ব্যবস্থা করি।'

মহানাম বললেন— 'হয়ে যাক। কি বলো অরিত্র ?'

অরিত্রর এখন ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বুক শুকনো মরুভূমি। একখানি মেঘ ধার

দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে ? সে বলল— 'হোক। তবে দেখো বেশি মাতলামি করো না।'

বিক্রম মহোৎসাহে নিজেদের কেবিনের দিকে চলে গেল। সীমার ঝাঁপি বার করে আনল। তারই ভেতর পোর্টেবল্ আইস-বক্সে তার পানীয়। হট বক্সে অনুপান, সহপান।

'চীয়ার্স, চীয়ার্স !' যথেষ্ট গ্লাস খালি হচ্ছে। সন্ধ্যে কাটছে। রাত হচ্ছে। চীয়ার্স, চীয়ার্স। উর্দিপরা জাহাজ কর্মী এদিক থেকে ওদিকে যায়। বিস্কুট, কফি, বাদাম-চাক্তি, কাজু, ঠাণ্ডা-অলা ওপর নিচ করে হেঁকে হেঁকে। চীয়ার্স, চীয়ার্স। বিক্রম বোতলটাকে চুমু খেয়ে বলল—'কি চৌধুরীদা মাতলামি করছি নাকি !' —কথা সামান্য এড়িয়ে গেছে। অরিত্রকে বড্ড খেতে হয়। খুব ধীরগতিতে খাওয়া অভ্যাস আছে। এখন সে উজ্জীবিত কিন্তু মত্ত নয়। বলল— 'টেন হাই বল্স্ হল কি ?' এখন সবে কথা এড়াচ্ছে। এর পর জড়াবে। হাত পা সুদ্ধু জড়িয়ে যাবে, তারপরে বক বক করবে, অসহ্য বকবক, তারপরে··· ?

বিক্রম বলল— 'তাপ্পর শালা মরে যাবো। ধপাস করে আছড়ে পড়ব আর পা ধরে টানতে টানতে যমের চ্যালারা আমায় নিয়ে যাবে। রায়দা অ রায়দা। আপনি আমায় বাঁচাতে পারেন না ? এ কি মেয়েরা কেউ খাচ্ছে না যে ! খায় না, না কি ! আমার বউ খায়, আপনাদের সামনে নজ্জা পাচ্ছে, খেলে সীমা যা জিনিস হয় না, চাবুক ! চাবুক ! একেবারে মুচমুচে কড়ানে চিংড়ি ভাজা। কুড়মুড়ে আচ্ছা রায়দা আপনি ব্যাচেলর হতে পারেন, সেলিবেট তো নন।'

মহানাম উচ্চহাস্যে বললেন, 'কি মনের প্রাণের কথা বলবে মনে হচ্ছে বলেই ফ্যালো !'

'আরে দাদা, তা নয় তা নয়। আপনাকে আমার বড্ড ভালো লেগে গেছে। এই চৌধুরীদার মতো ভান ভড়ং নেই। আচ্ছা দাদা, আপনি কখনও সাঁওতালনী টেস্ট করেছেন !'

হো হো করে হেসে উঠলেন মহানাম— 'এই জিজ্ঞাসাটা তোমার ভেতরে অনেকদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল, না ? আজ সুরার মুখে বলে ফেললে।'

—'সুরা নয় দাদা, মদিরা মদিরা। আহা হাসবেন না, হাসবেন না। হাসির কথা নয়। সাঁওতালনী টপ। সভ্য মেয়েরা কক্ষণো সাঁওতালনীদের মতো হয় না। নো, নো, নেভার, নেভার। চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি,লড়ে যান। প্রভু করুন, আমি, আমি বিক্রম শীল সব চিজ টেস্ট করেছি, আমি বলছি আদিবাসী সবসে বঢ়িয়া চিজ। এই তো সব ভাবীরা ভাবিনীরা রয়েছেন, ওঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করুন

না। এই সীমা হেই !'

অরিত্র ঠাণ্ডা হাতে একটা চড় কষাল বিক্রমের গালে। মহানাম বললেন— 'বোতলের বাকিটা ওর মাথায় ঢালো।'

অরিত্র বলল— 'ঢালি ? সত্যিই ঢালব ? আমার চেয়ে খুশিতে আর কেউ ঢালবে না।'

মহানাম ডাকলেন—'এই কফি, এই কফি, এই !'

বিক্রম হেঁচকি তুলছে ক্রমাগত। মহানাম গেলাস উল্টে স্কচ ফেলে দিয়ে তাতে কফি ঢাললেন ভর্তি করে, বললেন— 'বিক্রম শীল, খেয়ে ফ্যালো তো বাবা এটা লক্ষ্মী ছেলের মতো।'

সীমা, এষা নিচে ছিল সারাক্ষণ, এখন ওপরে উঠে আসছে দেখা গেল। বিক্রমের অবস্থা দেখে সীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল— 'ইস্‌স্‌স্‌, মাটি করলে। তুমি আবার এতো খেয়েছ ! অরিদা,ধরুন তো ওদিকটা, কেবিনে তুলে দিই, নইলে এমন যা-তা করবে !'

মহানাম বললেন— 'আমি আর অরি তুলে দিচ্ছি, তুমি যাও।'

এষা এদিকে তাকাচ্ছেই না। সে যেন স্বপ্নে হাঁটছে। যেন কেউ নেই, আর কেই নেই। দক্ষিণে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে কোথাও কেউ নেই আর এই জলযানে। যত রাত বাড়ছে, তত উথাল-পাতাল হাওয়া দিচ্ছে। বসে থাকা যাচ্ছে না আর হাওয়ায়। এ ডেক ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেবিন যাত্রীরা সব যে যার কেবিনে ঢুকে গেছে। হাওয়ায় দরজা খোলা যাচ্ছে না। অরিত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও যতটা খেয়েছে ঘুম এসে গেছে তার। ঢোলানো চামরের মতো নেতিয়ে পড়েছে বিছানায়। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে স্বপ্নের হাত দিয়ে সে কিছু পেতে চাইছে। স্বপ্ন ফরমাশী হয় না কখনও। বিবেকানন্দ কি শ্রীঅরবিন্দকে স্বপ্নে দেখতে চেয়ে তুমি অনায়াসেই ড্র্যাগন দেখতে পারো। তাই অরিত্র সুখস্বপ্ন না দেখে, ভয়ের স্বপ্ন দেখছে। অ্যাকসিডেন্ট ! স্থলে আর নয় জলে। তার ব্যক্তিগত জাহাজখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, দু পাশ থেকে খুলে পড়ছে কাঠামো। খসে খসে পড়ছে আগ-গলুই, পাছ-গলুই, পাটাতন।

দরজায় কি কেউ ঘা দিল ! হাওয়া ? অরিত্র ভীষণভাবে জেগে উঠল। এষা এষা, আমাকে এতো দুঃখ দিয়ে তুমি কি শেষ পর্যন্ত তাহলে এলে ? এলে ? অরিত্র নিমীলিত চোখে দরজা খুলে দিল— 'এ কি সীমাচল ?' সীমা ভেতরে ঢুকতেই হাওয়া ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। সীমার দু চোখে জ্বলন্ত অঙ্গার।

বলল—'বিক্রম কই ? আমার বিক্রম ? কোথায় ফেলে এসেছেন তাকে ?'

'বিক্রম ? কি বলছো সীমা ? আমি কি করে জানব ? আমি ফেলে দিয়ে এসেছি ?'

'না তো কি ? কত যত্ন করে শুইয়ে রেখে এলাম। এখন যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, অমনি দেখছি কোথায় চলে গেছে। অরিদা, যে খালি পতিত হবার জন্যেই তৈরি হয়ে আছে তাকে একদিক থেকে আপনার রূপসী স্ত্রী আর একদিক থেকে ওই সেক্সি বান্ধবী লেলিয়ে দিয়েই তো যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতাল করে দিয়েছিলেন। আবারও কি মদের দরকার ছিল ? একে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কি বলে ! এখন ও আর কাউকে খুঁজতে চলে গেছে। আর কাউকে। এখন ও আর আমাকে চায় না। চায় না। চায় না !'

সীমা অরিত্রর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমার তবে কি হবে বলুন ? কি হবে ?'

তখন অরিত্র স্তম্ভের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কেবিনের আলো নিভিয়ে দিয়ে হিংস্র হৃদয়ে ভাবল— ঠিকই তো। এই-ই বা নয় কেন ? অন্ধকারের শরীরে তো সমস্ত নারীই এক ! সেই একই গাছ। একই ফল, ফুল, সেই একই শিকড় এবং একই কোটর। আসল হচ্ছে বুভুক্ষা। চাওয়া, এই তীব্রভাবে সমস্ত জীবন দিয়ে চাওয়া। সুতরাং সেই ভয়ানক অন্ধকারে সীমার শরীরের সব কমলা রং স্খলিত স্তূপীকৃত হতে লাগল, সুতরাং সেই হিমেল অন্ধকারে সীমার হাত ছিঁড়ে গেল, পা ছিঁড়ে গেল, বুক ছিঁড়ে গেল। সমস্ত পট ভর্তি করে ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে পিকাসো গৃহযুদ্ধের গুয়ের্নিকা খানা কাঁদতে কাঁদতে জ্বলতে জ্বলতে আঁকলেন, আঁকলেন সেই মুমূর্ষু অশ্বীর অন্তিম হ্রেষা সমেত। সীমাকে আকণ্ঠ পান করতে করতে অরিত্র এষাকেই পান করতে লাগল। মরুভূমির তৃষ্ণায় পান করতে লাগল। এষার পাত্রে রাখে আর পান করে, এষার রঙে চোবায় আর আঁকে। সীমার শরীরে অরিত্র প্রাণপণে এষার আবহমান প্রতিরোধের সঙ্গে যুঝতে লাগল। তারপর হঠাৎ তার গভীরের গভীরে যেই সে সীমার স্বতন্ত্র মানব-অস্তিত্বের তিক্ত-কটু কষায় স্বাদ অনুভব করতে পারল অমনি তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল—এষা নয়, এষা নেই, এষা মায়া, এষা মরীচিকা ! তার শরীর হাহাকারে কাঁপতে লাগল। সে সীমাকে অসমাপ্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্ধের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। সীমা কান্নাভরা গলায় বলল—'কি হল ? অরিদা,কি হল ?' অরিত্রর মুখ দুমড়ে ভেঙে যাচ্ছে, অনন্ত প্রিয়জন হারানোর শোকে তার মুখ প্লাবিত। শোকে, পরাজয়ে, অন্তর্দাহে।

অরিত্র আর নিজের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। গোঙানির স্বরে বলল—

'আই ক্রায়েড ফর ম্যাডার মিউজিক অ্যান্ড ফর স্ট্রংগার ওয়াইন
বাট হোয়েন দা ফীস্ট ইজ ফিনিশ্‌ড্ অ্যান্ড দা ল্যাম্পস্ এক্‌স্‌পায়ার
দেন ফলস দাই শ্যাডো সায়নারা, দা নাইট ইজ দাইন
অ্যান্ড আই অ্যাম ডেসোলেট অ্যান্ড সিক অফ অ্যান ওল্ড প্যাশন
ইয়া, হাংরি ফর দা লিপ্‌স অফ মাই ডিজায়ার
আই হ্যাভ বীন ফেথফুল টু দী সায়নারা, ইন মাই ফ্যাশন ॥'

॥ ২০ ॥

এষা বলল—'আপনিও তো খেলেন দেখলাম। খেয়েছেন, মহানামদা, না?

'হ্যাঁ খেলাম তো! ভালোই খেলাম। একুশ বাইশ বছর বয়স থেকেই খাচ্ছি। কিচ্ছু হয় না। নেশা-টেশা ধরে না। কোনও নেশাই না। এই পাইপ দেখো, এক কথায় ছেড়ে দিতে পারি, তুমি বললে।'

'সত্যি?'

'সত্যিই। আসলে চিন্তা করতে একটু সুবিধে হয়। সেই বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া বলে একটা কথা আছে না? তবে অভ্যেসটা পাল্টে নেওয়াও যায়।'

'আসলে পুরুষ ভূমিকাবর্জিত জীবন তো আমার। আপনাদের এইসব পুরুষালি বিনোদনকে ভীষণ অবিশ্বাসের চোখে দেখি। আমি কি নিশ্চিন্তে বসতে পারি?'

'বাঃ ডেকে আনলাম, বসবে না? আচ্ছা এষা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?

'স্বচ্ছন্দে।'

'তোমার জীবন এমন পুরুষবর্জিতই বা হল কেন? কেন ছাড়লে সেই ভদ্রলোককে। লোক কি খুব খারাপ ছিলেন?

'না, মহানামদা, একেবারেই নয়।'

'তবে?'

'যেখানে যত অপরাধ সবই একা আমার। সকল লোকের মাঝে বসে, আমার নিজের মুদ্রাদোষে, আমি একা হতেছি আলাদা।'

—'বলো, বলো, আমাকে বলো কি তোমার সেই মুদ্রাদোষ!'

এষা চুপ করেই থাকে। চুপ করেই থাকে। অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট গলায় বলে——'বড় যান্ত্রিক মানুষ ছিলেন। তা-ও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু উনি পিতা হতে চাইলেন।'

—'অন্যায় কিছু, সেটা?'

—না অন্যায় নয়,' এষা মুখ তুলে তাকিয়েছে, মহানামকে ভেদ করে, পেছনের দেয়ালে তার দৃষ্টি—'অন্যায় নয়। কিন্তু আমি তো শুধু গর্ভ নই!'

মহানাম বললেন—'ঠিকই এষা। পৃথিবীর যখন প্রজাবৃদ্ধির দরকার হয়েছিল, তখন মেয়েদের রক্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাতৃত্বেই তার চরম সার্থকতা। এখন সমাজের সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন নারীত্বে আর মাতৃত্বে সমীকরণ করা উচিত নয়।'

'উচিত অনুচিত জানি না,' এষা বলল, 'শুধু জানি হৃদয় না ভরলে ক্লান্তিকর অভ্যাসের যান্ত্রিকতায় আমার গর্ভ ভরে না। ওভাবে আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারি না। পারিনি। কারখানা থেকে কি পুপুর মতো অমন অনবদ্য সৃষ্টি হয়, আপনিই বলুন না!'

মহানাম কটাক্ষে চাইলেন। পাইপটা রেখে দিলেন পাশে ছাইদানির ওপর। বললেন— 'পুপুর জন্মবৃত্তান্ত তুমি জানো?'

'জানি।'

'আগে থেকেই জানতে?'

'না। কদিন আগে জেনেছি।'

'কাঁদছ কেন এষা?'

এষা মুখ তুলে তাকাল—'কই, কাঁদছি না তো!'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি কাঁদছ, কাঁপছ।'

'কাঁদছি না। বিশ্বাস করুন কাঁপছিও না। নীলমকে আপনি ধরে রাখতে পারলেন না কেন?'

'হয়ত তেমন করে চাইনি। আসলে আমিও তো তখন অনেকটাই অপরিণত ছিলুম। নীলমই ছিল আমার কাছে একমাত্র নারী যাকে আমি বিনা পাপে স্পর্শ করতে পারতুম।'

'মানে?'

মহানাম হাসলেন, বললেন—'আমার জন্মবৃত্তান্তও তো পুপুর মতোই খানিকটা। পুপু বাবা-মা পেয়েছে। আমি নামগোত্রহীন। যাঁর স্নেহ ও সম্পত্তি পেয়েছি সেই ডকটর কস্তুরী মিত্র আমার আপন মাসিমা নন। হাসপাতালে পরিত্যক্ত শিশু মানুষ করেছিলেন। অল্প বয়সের চোখে যে কোনও মেয়েকে ভালো লাগলেই আমার মনে হত আমার সেই কুমারী মা-ই যদি একদিন বিবাহিত হয়ে এর জন্ম দিয়ে থাকেন, বা সেই বাবা; তাহলে এ তো আমার বোনই হবে

রক্তের সম্পর্কে !'

'নীলমকে দেখে সে কথা মনে হত না ?'

'উঁহু ! নীলম ছিল কস্তুরী মিত্রর বন্ধু সাবিত্রী যোশীর মেয়ে। সাবিত্রী গুজরাতি বিয়ে করেছিলেন। নীলমের পরিচয় পূর্বাপর আমার জানা। আর কস্তুরী মিত্র আমায় বলে যান আমার মা এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বাঙালি মহিলা।'

'কি রকম বয়স ছিল তাঁর, জানেন ?'

'নেহাত কাঁচা মেয়ে নয়।'

এষা বলল—'আমার মা মাত্র ষোল বছর বয়সে আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। সীজার-বেবি ছিলাম। মায়াদেবীর মতোই বিদীর্ণ হয়ে যেতে হয়েছিল আমার মাকে, আমার জন্ম দিতে। আমি কোনক্রমেই আপনার বোন হতে পারি না মহানামদা।'

'তোমার বাবা ?'

'আপনি যে কুলুজি নিতে শুরু করলেন ! আমার বাবা তিন চার মাস নিখুঁত বৈধব্য পালন করেন। মাছ-মাংস খেতেন না। সাদা থান কাপড় পরতেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন—"আমি মরে গেলে তো তোমরা তাকে দিয়ে এই সবই পালন করাতে। তাই করছি।"

'তারপর ?'

'তারপর তিনি আর সহ্য করতে না পেরে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। আর আমাকে মানুষ করল পরিবার।'

'তার মানে তুমিও একটি নিটোল ভালোবাসারই সৃষ্টি ? এবং তোমার মা ষোল বছর বয়সে, পুরোপুরি বিবাহযোগ্যা নারী হবার আগেই তোমার জন্ম ? দ্রৌপদীর মতো, সীতার মতো তুমিও একরকম সোঁদা মাটির থেকে উঠে এসেছ ?' মহানাম সোজা হয়ে বসলেন—'অথচ অরিত্র সেই ইম্যাকুলেটকে ফিরিয়ে দিল ?'

'অরিত্রর বোধহয় খুব দোষ নেই'—এষা আস্তে আস্তে বলল।

'বলো কি ?'

'আমি এখন বুঝতে পারি। অরিত্র এমন পুরুষ যে তার আকাশে দ্বিতীয় সূর্য সইতে পারে না। সে-ই এক এবং অদ্বিতীয়। আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ওর অন্তরাত্মা ঠিকই বুঝতে পারছিল ওর সম্মোহন, ওর কথার সম্মোহন আমি খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠছি। আপনার সঙ্গগুণে। আমি আস্তে আস্তে মিথ্যা কাটিয়ে সত্যের দিকে ঝুঁকছি। আপনার দিকে ঝুঁকছি। অসতো মা সদ্‌গময়।'

'সে কি কথা ?'

'হ্যাঁ তাই-ই বোধহয় নীলমকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ও একই সঙ্গে আপনাকে আর আমাকে চূর্ণ করতে চাইল।'

হাওয়ায় মহানামের গায়ের চাদর ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। এষা বলল, 'সে সময়ে অরি আমাকে ত্যাগ করতে আমি বোধহয় আসলে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম। আমার আত্মবিশ্বাস, পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস, আমার অহঙ্কার সব চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি যখন আমায় চিনতে পারলেন না, আমিই তো প্রথম আপনার কাছে আসি, আমার জীবন ভরা সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে এবং তার সঠিক জবাব আশা করে, অথচ আমাকে বাদ দিয়ে যখন নীলমকে আপনি অন্তরতম বলে বেছে নিলেন তখন আমার যা হয়েছিল তা সেই পদাবলীর হাহাকার—শূন্য মন্দির মোর। যদিও তখন তার চরিত্র আমি বুঝতে পারিনি। শুধু আমার কাজকর্ম, পড়াশোনা, বেঁচে-থাকা,, অরির স্তব-স্তুতি শোনা সবই কেমন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। কিছু ভালো লাগত না মহানামদা, কিচ্ছু না।'

মহানামকে ঘিরে এই উক্তি ক্রমশই জলে বৃত্তের মতো বড় আরও বড় হয়ে যেতে থাকল। শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।

মহানাম আবিষ্ট স্বরে বললেন—'তোমার মন্দির ভরব বলেই এতদিন নিজের মন্দির শূন্য রেখেছি। সেই চির-প্রথমাকে কে না চিনতে পারে, শুধু ইতিহাস আর পুরাণ মাঝখানে একটা ভয়ের নদী বওয়াতে থাকে বলেই তাকে চাওয়া হয় না। অমৃতের তৃষ্ণা তাই অন্য পানীয়ে মেটাতে হয়। এষা, তুমি আমার সেই সমুদ্র সম্ভব অমৃতকুম্ভ।'

সমুদ্রের উচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে যাচ্ছে মহানামের উচ্ছ্বাস। সমুদ্রের বিস্তারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে মহানামের বিস্তার। সমুদ্রের চেয়েও তিনি উত্তুঙ্গ। বুঝতে পারছেন কি প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁর দেহ স্পন্দিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি দেখলেন এ প্রাপ্তি তাঁর প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে রয়েছে অনেক গুণ। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন এ তো একেবারেই সেই প্রাক্সিতালিসের পীনাঙ্গী রম্ভোরু ভেনাস নয়। যার মুণ্ডুহীন দেহে জড় পাথরের সফীতি এবং ভাঁজগুলোই এমন প্রাণময়, বাস্তব কামনাময় যে সম্মোহিত দর্শক পাথর জেনেও তাকেই আলিঙ্গন করতে ছুটে যায় ! দেখলেন আহা ! এযে সান্দ্রো বত্তিচেল্লির ভেনাস, যার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ব্যঞ্জনাময় কবিতার আলোছায়া দিয়ে গড়া। সা এষা। সে-ই এই। এষা সা। এই সে-ই। ধরিত্রীর কামনা-সাগরে অশ্রু টলটল শুক্তির ওপর পা রেখে সে ঊর্ধ্বে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটিতে পা, আকাশে মুখ তাই

একে কেউ বুঝতে পারে না। মিশরী কল্পনার মৃণ্ময় দেহ আর অগ্নিময় প্রাণ। শুধু মৃত্তিকা, কিংবা শুধু আগুন, শুধু মর্ত্য কিংবা শুধু আকাশ দিয়ে যে ওর প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়। বিষাদের কি এক রহস্য তাই ক্ষৌম বস্ত্রের মতো আবৃত করে রেখেছে ওকে। কি অতলস্পর্শ ওর নিবেদন! কিছুতেই তিনি তার গভীরতা মাপতে পারেন না! কিছুতেই তিনি তার পারে পৌঁছতে পারেন না। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে তাঁর সমস্ত চেনা ভেলাগুলি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল, তিনি বুঝতে পারেন এ এক অপরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা, তিনি জানেনই না কি আছে এর শেষে। সমস্ত উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই এই যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত নন।

ঘুমিয়ে পড়েছেন মহানাম। ডানহাত লম্বা হয়ে পড়ে আছে। হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। মুখে নিবিড় মৃত্যু। মহা পরিনির্বাণ। আস্তে আস্তে তাঁর অন্য হাতটা সজল মমতায় নামিয়ে রেখে উঠে বসল এষা। বাইরে এসে বুঝতে পারল তার যাত্রার শেষ পর্বে 'কনডর' এখন প্রচণ্ড রকেট-গতি নিয়েছে। অযুত-নিযুত লহরীমালায় আকাশ তার মেঘ, নীহারিকা, নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আরব সাগরের জল টগবগ করে ফুটছে দুপাশে। আকাশী আলোয় ডেক ডোবা। যেন তার ওপর দিয়ে জলস্রোত চলেছে। ভেসে আছে শুধু সাগর ভাসা কাষ্ঠখণ্ডের মতো গুটিকয় চেয়ার। ভেসে চলে যাচ্ছে, আবার ভেসে চলে আসছে।

রেলিঙের ওপর দুই হাত রেখে সে সমুদ্র আর আকাশকে বলল, 'আমার এই ঐশ্বর্য তবে আমি কাকে দেবো? দশ হাতে দান করলেও এ যে শেষ হবার নয়। আমি কি তবে চিরকাল এমনই উদ্বৃত্ত থেকে যাবো? চিরটাকাল? এ কেমন নিষ্ঠুর নিয়তি?'

ঠিক সেই সময়ে, যখন অসম্পূর্ণতার তীব্র দুঃখে তার নামহীন অভীপ্সাকে সে অপাবৃত করছিল। তখন অন্ধকার 'কনডর' এর ডেকে পেছন থেকে কে যেন তাকে হাওয়ার হাতে ছুঁয়ে, মন্দ্র স্বরে ডাক দিয়ে উঠল।

এবার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তার ভেতরের যবনিকা কাঁপছে। সমস্ত অবরোধ খসে পড়তে চাইছে। পেছন ফিরে তাকে দেখতে চাইলেই দেখার দুঃসহ আনন্দে সে বুঝি জ্বলে যাবে। দু হাত মুঠো করে সে প্রাণপণে তার বাইরে-বেরিয়ে আসতে চাওয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবহা নালীগুলোকে সামলায়। তারপর ফিরে তাকায়। কেউ নেই। শূন্য। মধ্যরাতের ডেক একেবারে শূন্য। কিন্তু সে

নিশ্চিত যে কেউ এসেছিল। তার পরিচিত কেউ নয়। অথচ যেন বহুদিনের চেনা। একটা অস্পষ্ট আকার, পোশাকের অস্পষ্ট রঙ, গাঢ় একটা পুরুষালি সুগন্ধ। হাওয়ার চেয়েও দ্রুতবেগে সে কি চলে গেছে?

অস্থির হয়ে সে নেমে গেল। আপার ডেকের যাত্রীরা তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চাদর, কম্বল, যে যা পেয়েছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে জাহাজের বেগে দুলছে। চতুর্দিকে ঘুম, শুধু ঘুম। সারি সারি পুরুষ, নারী, শিশু ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। কয়েকজন যুবক চাদর টাঙিয়ে খানিকটা আড়াল করে নিয়ে তাস খেলবার চেষ্টা করছিল বোধহয়। তাসের প্যাকেট মাঝখানে রেখে তারাও তখন ঘুমিয়ে। জাহাজের কোনও কর্মী, পোশাক পরা। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, এইমাত্র ওপর থেকে কাউকে নেমে আসতে দেখেছেন!'

'একজনকে দেখলাম যেন, তিনি তো নিচে নেমে গেলেন।'

'নিচে?'—নিচে যাওয়া খুব সহজ নয়। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা মানুষ দিয়ে মোড়া। তার ওপর এই সাঙ্ঘাতিক হাওয়া। কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে। তার মুখোমুখি হতেই হবে। লোয়ার ডেকে ভিড় আরও বেশি। যদিও হাওয়ার দাপট কম। প্রায় জনে জনে খুঁজে খুঁজে দেখছে এষা। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর মৃত বীরদের বিধবারা যেমন তাঁদের স্বামীদের শবদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এষা জানে সে মৃত নয়, প্রচণ্ড রকম জীবন্ত, সে তাকে এমন এক রোমাঞ্চ দিয়ে গেছে যা এখনও তার প্রতি রোমকূপে স্পন্দমান। সে এ-ও জানে, খুঁজে দেখছে বটে। তবে এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবারও দরকার নেই, কারণ তার সমীপবর্তী হলেই তাকে তড়িৎপৃষ্ট হতে হবে। তাই সে আবার আপার ডেক, এবং তারপর আরও সিঁড়ি ভেঙে নিজেদের কেবিনের সম্মুখবর্তী ডেকে উঠে এলো।

তখন রাত পাতলা হয়ে এসেছে। আকাশে বিভিন্ন আকৃতির মেঘ চেনা যেতে আরম্ভ করেছে। রাতের হাওয়া যেন একটু একটু করে নিজেকে সংবরণ করে নিচ্ছে। আর একটু পরেই ডাঙায় ভোরের পাখিরা কলস্বনে জাগবে। কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে মহানাম দেখলেন বিস্রস্ত, বিনিদ্র এষা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে পেছন ফিরে। মহানাম কাছে গিয়ে দেখলেন তার সমস্ত মুখ চোখের জলে ভাসছে। ডাকলেন— 'এষা, এষা, একি তুমি ঘুমোওনি?'

এষা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, বলল—'কে যেন আমাকে হরষিত করে দিয়ে চলে গেছে।'

'সে কি ? কে ?' মহানাম অবাক হয়ে বললেন।

'জানি না। সারা রাত খুঁজেছি। নিচে, আরও নিচে। এই দ্যাখো এখনও আমার গায়ে কাঁটা ফুটে আছে।'

মহানাম খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। তখন রাত ভেঙে ভেঙে ভোর হচ্ছে। আকাশের রঙ কালোও নয়, পুরোপুরি নীলও নয়। বর্ণহীন, দ্যুতিময়। সেইদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'আর কেন খুঁজবে এষা ! বুঝতে পারছো না ? পেয়েছ তো ! পেয়েই গেছো ! সে এবার থেকে তোমার রক্তে রক্তেই বইবে, গাইবে। তোমার সমস্ত নিবেদন নিঃশেষে নিতে পারবে এবং আবার সহস্র গুণ রোমাঞ্চে ফিরিয়ে দেবে। এষা, তীর্থযাত্রা কখনও ব্যর্থ হয় ?'